নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৬

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা
পথ-পদ্ধতি ও ভ্রান্তি নিরসন

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

আপনার সংগ্রহে রাখার মত আরও কয়েকটি কিতাব
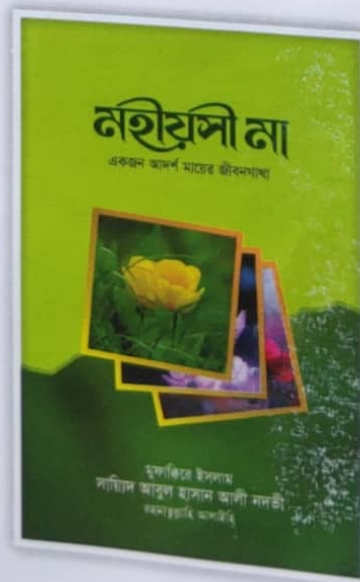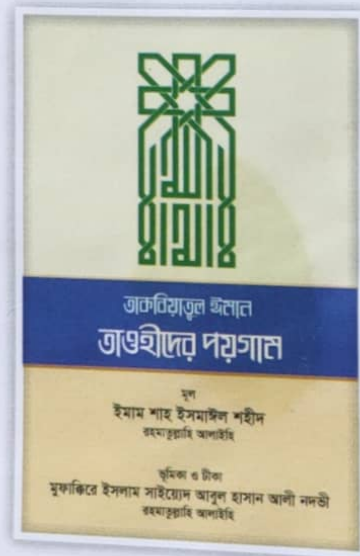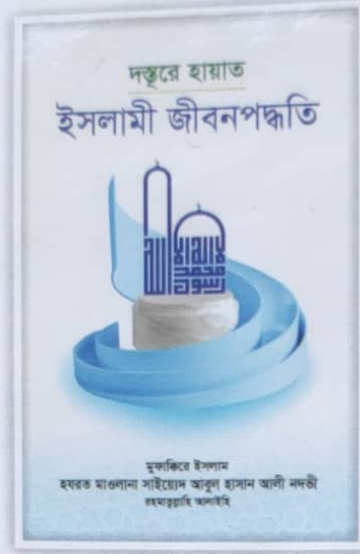
নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৬

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা
পথ-পদ্ধতি ও ভ্রান্তি নিরসন

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি জেদ্দা, সৌদিআরব

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ইমাম ও খতীবঃ আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

মুহাদ্দিসঃ টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা, টঙ্গি, গাজীপুর

মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২-২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৬

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

মূলঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২২ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-58-6

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, ✆16297 or 01519521971
www.wafilife.com, ✆ 01799925050
khidmashop.com ✆ 01939773354

আমাদের বই পেতে কল করুন : ০১৯৭৭-১৪১৭৬৪, ০১৭৪১-৯৭১৯৬৭
ভিজিট করুন: www.maktabatulashraf.com, facebook.com/maktabatulashraf

মূল্য : চারশত আশি টাকা মাত্র

TASAWUF O ATMASHUDDHI
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Maulana Muhammad Jalaluddin
Price: Tk. 480.00 US$ 25.00

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّابَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সউদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সংগ্রহটিকে তাঁর, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَاذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩ হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচন, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং আপাতত চৌদ্দ খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড : 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড : 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড : 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড : 'ইসলামী মু'আশরাত', পঞ্চম খণ্ড : 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড : 'তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি', সপ্তম খণ্ড : 'মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন', অষ্টম খণ্ড : 'উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত',

নবম খণ্ড : 'ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব', দশম খণ্ড : 'দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত ও আদাব', একাদশ খণ্ড : 'ইসলামী মাসসমূহের ফাযায়েল ও মাসায়েল', দ্বাদশ খণ্ড : 'সীরাতুন্নবী ও আমাদের জীবন', ত্রয়োদশ খণ্ড : 'উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য' এবং চতুর্দশ খণ্ড : 'ইসলাম ও বর্তমানকাল' সম্পর্কে।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রথম খণ্ড : 'ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস', দ্বিতীয় খণ্ড : 'ইবাদাত-বন্দেগী ঃ হাকীকত ফযীলত ও আদব' তৃতীয় খণ্ড : 'ইসলামী মু'আমালাত' চতুর্থ খণ্ড : 'ইসলামী মু'আশারাত' এবং পঞ্চম খণ্ড : 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন' নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের ভূয়সী প্রসংশা কুড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই ষষ্ঠ খণ্ড : **'তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি'** প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশিষ্ট খণ্ডসমূহও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন।

আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি (বিশেষত হরকতের ভুল) থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তি সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
রবিউছ ছানি ১৪৩৬ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম ও আমাদের জীবন- ৬

তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

তাসাওউফের স্বরূপ ও তার দাবি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

উল্লেখিত আয়াতসমূহের অর্থ-

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- ২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী। ৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। ৬. নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৭. তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[১]

---

* ইসলাহী খুতুবাত খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১১৮-১৩৪, আসরের নামাযের পর বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা মু'মিনুন ১-৭

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! কয়েক জুমা ধরে সূরা মু'মিনূনের প্রথম কয়েকটি আয়াতের বর্ণনা চলছে। যার মধ্যে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা সফলকাম ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চতুর্থ আয়াতে একটি গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, সফলকাম ঈমানদার তারা যারা যাকাতের উপর আমল করে। আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, এ আয়াতের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হলো যাকাত দেওয়া, আর দ্বিতীয় অর্থ হলো নিজের স্বভাব-চরিত্রকে পাক-পবিত্র করা। এই দ্বিতীয় অর্থের বর্ণনায় কয়েক জুমা অতিবাহিত হয়েছে। আজ এর পরিশিষ্ট আলোচনা করবো। এরপর বেঁচে থাকলে পরবর্তী আয়াতসমূহের প্রতি মনোযোগ দেবো।

আধ্যাত্মিক বিধানের আলোচনা

পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে নামায, রোযা ইত্যাদি বাহ্যিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধান আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন, তেমনিভাবে অভ্যন্তরের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধানও আমাদের উপর আরোপ করেছেন। যেমন মানুষের অন্তরে ইখলাস থাকতে হবে, রিয়া থাকা যাবে না। অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত থাকতে হবে। বিনয় থাকতে হবে, অহমিকা থাকা যাবে না। ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। শোকরের ক্ষেত্রে শোকর করতে হবে। এসব বিধানের সম্পর্ক মানুষের অভ্যন্তর ও কলবের সঙ্গে।

আত্মার সাথে সম্পৃক্ত হারাম কাজ

এমনিভাবে আত্মার সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো হারাম কাজ রয়েছে। যেমন হিংসা করা হারাম। অহংকার করা হারাম। কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা হারাম। যশ-খ্যাতি ও মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা হারাম। তাই নীতি-চরিত্রের সংশোধন এবং সেগুলোকে পাক-পবিত্র করাও একজন মুমিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, সামর্থ হলে হজ্ব করা এবং ওমরা করা যথেষ্ট নয়। বরং আত্মার এসব আমল ও আখলাককে সংশোধন করাও জরুরী। অন্তরে যেন অহংকার না থাকে, হিংসা না থাকে, প্রদর্শনপ্রবৃত্তি না থাকে, যশ-খ্যাতির উদ্দেশ্যে কাজ করা না হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে বদ্ধমূল না হয়। আল্লাহ ও রাসূলের ব্বত অন্তরে থাকে। অন্তরে এসব গুণ অর্জন করা জরুরী।

এসব জিনিস তারবিয়াতের মাধ্যমে লাভ হয়

এখন প্রশ্ন হলো, এসব জিনিস অন্তরে অর্জন হয় কীভাবে? ভালো করে বুঝুন যে, এসব জিনিস শুধু কিতাব পড়ার দ্বারা লাভ হয় না, শুধু বয়ান শোনার দ্বারা লাভ হয় না, বরং এর জন্য তারবিয়াতের প্রয়োজন পড়ে। পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের পিছনে যেসব উদ্দেশ্যের কথা কুরআনে কারীম আলোচনা করেছে তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যে এই যে, আপনি মানুষের নীতি-চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করবেন। তাদের আত্মা থেকে নীতিহীনতার নোংরামী দূর করবেন। এ কাজ তারবিয়াতের মাধ্যমে হয়। ইসলামী শাস্ত্রসমূহের মধ্যে তাওসাউফ যেই শাস্ত্রের নাম, তার আসল উদ্দেশ্যই হলো আখলাকের তারবিয়াত করা। আপনারা 'ফিকহ' শব্দ শুনেছেন। 'ফিকহ' ঐ শাস্ত্রকে বলে, যার মধ্যে যাহেরী আমলের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়। কোনটা জায়েয, কোনটা নাজায়েয? কোনটা হালাল, কোনটা হারাম? নামাযের সময় কোনটা? কীভাবে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হয়, কীভাবে পড়লে অশুদ্ধ হয়? রোযার বিধান কি? যাকাতের বিধান কি? হজ্বের বিধান কি? এসব বিষয় ফিকহশাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়। এসব বিধানের সম্পর্ক যাহেরী আমলের সঙ্গে।

তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি

আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত যেসব বিষয় আমি আলোচনা করছি, সেগুলোর বর্ণনা এবং সেগুলো অর্জন করার পদ্ধতি তাসাওউফশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে মানুষ তাসাওউফশাস্ত্র সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্যের শিকার। কতক মানুষ মনে করে যে, শরীয়তের সাথে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফের কোথাও তাসাওউফের কথা উল্লেখ নেই। তাসাওউফ গ্রহণ করা বিদ'আত। ভালো করে বুঝুন! কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফে নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের যেই নির্দেশ এসেছে তাই তাসাওউফের বিষয়বস্তু। এজন্য তাসাওউফ কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফের পরিপন্থী কিছু নয়। অপরদিকে কতিপয় লোক তাসাওউফকে ভুল ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছে। তাদের নিকট তাসাওউফের অর্থ মোরাকাবা করা, কাশফ অর্জন হওয়া, ইলহাম হওয়া, স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা জানতে পারা এবং কারামত অর্জন হওয়া ইত্যাদি। তাদের নিকট এগুলোরই নাম তাসাওউফ। এর ফলে তারা কতক সময় তাসাওউফের নামে শরীয়তপরিপন্থী কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এ ব্যাপ্যারে তারা দু'ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে।

তাসাওউফের বিষয়ে দুটি ভুল হস্তক্ষেপ

এক ধরনের হস্তক্ষেপ তো এই করেছে যে, যে সব লোক নিজেদেরকে 'সূফী' বলেও আখ্যা দেয়, আবার ভাং-ও সেবন করে আর বলে যে, ভাং মৌলভীদের জন্য হারাম হলেও সূফীদের জন্য হালাল। কারণ আমরা তো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ভাঙ্গ পান করে থাকি। নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ জানেন, আরো কতো ধরনের অসার কথাবার্তা, গলদ আকীদা ও শিরকী চিন্তা-ভাবনার নাম দিয়েছে তাসাওউফ।

দ্বিতীয় হস্তক্ষেপ এই করেছে যে, মুরীদরা হলো পীরের দাস। একবার কাউকে পীর বানালে সে পীর মদ পান করুক, জুয়া খেলুক, হারাম কাজ করুক, সুন্নাতকে পদদলিত করুক, কিন্তু পীর সাহেবের পীরগিরি ঠিকই থাকে। মুরীদকে তার পদচুম্বন করতে হবে। কয়েকদিন পর পর তার সামনে নজরানা পেশ করতে হবে। কারণ এভাবে পীর সাহেবকে খুশি না করা পর্যন্ত তার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। নাউযুবিল্লাহ! তাসাওউফের এই রূপরেখা না কুরআনে আছে, না হাদীসে আছে। শরীয়ত ও সুন্নাতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

তাসাওউফের সঠিক রূপরেখা

তাসাওউফের প্রকৃত রূপরেখা নীতি-চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ আমলের সংশোধন। এর জন্য সুন্নাতের অনুসারী সঠিক ইলমের ধারক এবং সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিজের অনুসরণীয় বানানো জরুরী। যিনি কোনো মুরুব্বীর মাধ্যমে নিজের তারবিয়াত করিয়েছেন। তার কাছে গিয়ে বলবে যে, আমি আপনার দিকনির্দেশনা চাই। তিনি তাকে দিকনির্দেশনা দান করবেন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের মুরুব্বী বানিয়েছিলেন। তাঁর তারবিয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে নিজেদের আমল-আখলাক সংশোধন করেছিলেন। তাঁর আনুগত্য করেছিলেন। এ রূপরেখা পরিপূর্ণ সঠিক। এ পীর-মুরীদী বিশুদ্ধ এবং কুরআন-হাদীস ভিত্তিক। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় উত্তম চরিত্র গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। একহাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

'আমাকে মানুষের আখলাককে পরিশুদ্ধ করা এবং সেগুলোকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।'[১]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন যে, আপনি যেভাবে বলবেন আমরা সেভাবে আমল করবো। আমাদের মন চাক বা না চাক, আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে ধরুক বা না ধরুক, আপনি যা কিছু বলবেন সে অনুপাতে আমরা আমল করবো। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর আখলাককে এমন পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল করেন যে, তাঁদের পরে পৃথিবীর বুকে এবং আসমানের নিচে এমন উত্তম চরিত্রের লোক আর সৃষ্টি হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কখনোই নিজেদের নফসের ব্যাপারে গাফেল হতেন না। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াত লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সোহবত তাঁদেরকে নিখাদ বানিয়েছিলো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সবসময় এই আশঙ্কা করতেন যে, আমরা সঠিক পথ থেকে আবার বিচ্যুত হয়ে না যাই।

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান

হযরত ওমর ফারুক রাযি.- যাঁর সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ

'আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে ওমর নবী হতো।'[২]

যিনি নিজ কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, ওমর জান্নাতে যাবে। যিনি সরাসরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, হে ওমর! আমি যখন মেরাজে যাই এবং জান্নাতে ভ্রমণ করি তখন জান্নাতে একটি জমকালো মহল দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করি এ মহলটি কার? আমাকে বলা হয় যে, এটা ওমর ইবনে খাত্তাবের মহল। আমার মন চাইলো মহলের ভিতরে প্রবেশ করে দেখি। কিন্তু

---

১. কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪, হাদীস নং ৫২১৭, জামউল জাওয়ামে' সুয়ূতী কৃত, খণ্ড-১, হাদীস নং ৩০০০, সুনানে বাইহাকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭২, হাদীস নং ২১৩০১, জামেউল আহাদীস, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৮৬, হাদীন নং ৮৮৯২, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদদ্বীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৪, আদদুরারুল মুনতাশিরাহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৭৬৪

তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ হওয়ায় তোমার অনুমতি ছাড়া আমি তোমার ঘরে প্রবেশ করিনি। হযরত ওমর রাযি. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,

أَوَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাবো?'[১]

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর আখেরাতের ভয়

এসব সত্ত্বেও হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর অবস্থা এই ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হলে তিনি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর নিকট গমন করলেন। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের তালিকা বলেছিলেন যে, মদীনায় অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। হযরত ওমর রাযি. তাঁর নিকট গেলেন এবং কসম দিয়ে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের যেই তালিকা আপনাকে বলেছেন তার মধ্যে আমার নাম নেই তো?[২]

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর এই ভয় এ কারণে হয়েছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় তো নিঃসন্দেহে আমার অবস্থা ঠিক ছিলো, যে কারণে তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো কি না। পরবর্তীতে আমার আখলাক নষ্ট হয়ে গেলো কি না, এজন্য আমার ভয়। এঁরা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম! সবসময় তাঁদের এ ভয় লেগেই ছিলো যে, আমাদের আমল-আখলাকের মধ্যে ত্রুটি চলে না আসে।

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর নালা ভাঙ্গার ঘটনা

একবার হযরত ওমর ফারুক রাযি. মসজিদে নববীর মধ্যে তাশরীফ আনলেন। বৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তির বাড়ির নালা (পানি

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীন নং ১০৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮১১৫

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯

নির্গমনী পাইপ) দিয়ে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় পানি পড়ছে। তিনি বললেন, বাড়ির নালা দিয়ে মসজিদের মধ্যে পানি পড়া উচিত নয়। মসজিদ এ জন্য নয় যে, মানুষ তার মধ্যে নিজের বাড়ির নালা (পানি নির্গমনী পাইপ) দিয়ে পানি ফেলবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কার ঘর? লোকেরা বললো, এটা হযরত আব্বাস রাযি.-এর ঘর। তিনি ছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। হযরত ওমর রাযি. বললেন, এটা ঠিক নয়। মসজিদ কারো জায়গীর হতে পারে না। তার মধ্যে ঘরের নালা (পানি নির্গমনী পাইপ) দিয়ে পানি ফেলা ঠিক নয়। একথা বলে তিনি নালাটি ভেঙ্গে ফেললেন।

আমার পিঠের উপর উঠে নালা ঠিক করুন

এরপর হযরত আব্বাস রাযি. তাশরীফ আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মুমিনীন! এই নালা আপনি কেন ভেঙ্গেছেন?

হযরত ওমর রাযি. বললেন, মসজিদে নববী ওয়াকফকৃত সম্পদ। আল্লাহ তা'আলার ঘর। আর এই নালা (পানি নির্গমনী পাইপ) আপনার ব্যক্তিগত ঘরের। মসজিদের মধ্যে এটা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই নালা লাগানো জায়েয ছিলো না, এজন্য আমি ভেঙ্গেছি।

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জানা নেই যে, এই নালা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে লাগিয়েছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে লাগানো নালা আপনি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

এ কথা শুনে হযরত ওমর ফারুক রাযি. হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আব্বাস! বাস্তবকই কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিয়েছিলেন?

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, হ্যাঁ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক রাযি. বললেন, আমি আপনার সামনে হাত জোড় করে বলছি, আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজটি করুন। আমি এখানে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি, আপনি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে এখনই এই নালা ঠিক করুন।

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, আপনি ক্ষান্ত হোন। আপনি অনুমতি দিয়েছেন ব্যাপার চুকে গেছে। আমি নালা লাগিয়ে নেবো।

হযরত ওমর রাযি. বললেন, কেউ আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে এই নালা না লাগানো পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না। খাত্তাবের ছেলের এই দুঃসাহস হলো কি করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি দেওয়া নালার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তা ভেঙ্গে ফেলেছে। সুতরাং হযরত ওমর রাযি. তাঁকে নিজের পিঠে আরোহণ করিয়ে ঐ নালা ঠিক করান।[১]

এমনটি কেন করেছেন? এজন্য করেছেন, যেন অন্তরে এই চিন্তা না জাগে যে, এখন আমি শাসক হয়েছি। আমার হুকুম কার্যকর হয়। আমি এখন ফেরাউন হয়েছি, তাই যা ইচ্ছা তাই করবো। এ কাজের মাধ্যমে এই চিন্তাকে ধ্বংস করেছেন। নিজের নফসের ইসলাহ করেছেন। তাঁরা সবসময় নিজেদের আখলাক সঠিক রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর আত্মশুদ্ধি

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। শিক্ষিত সাহাবী ছিলেন। সূফী মনের বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। একবার তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর বানানো হয়। দিনে তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, আর সন্ধ্যায় মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে লাকড়ি বিক্রি করতেন।

এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, এ কাজ কেন করছেন?

তিনি বললেন, আমার নফস খুবই দুষ্ট। আমার ভয় হয় শাসক হওয়ার ফলে আমার অন্তরে আবার অহংকার চলে না আসে। এজন্য আমি আমার নফসকে নিজের বাস্তব অবস্থা বারবার দেখাই যে, তোমার বাস্তবতা এই।

আমাদের সমাজের অবস্থা

সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের নফসের সংশোধন, আখলাকের পরিশুদ্ধি এবং আত্মা থেকে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও ঘৃণা বিলুপ্ত করার জন্য অনেক মেহনত মুজাহাদা করেছেন। সূফীয়ায়ে কেরামও এ কাজই করিয়ে থাকেন। যেসব লোক সূফীয়ায়ে কেরামের নিকট নিজেদের ইসলাহের জন্য আসে, তাঁরা তাদের আখলাকের নেগরানী করে থাকেন। কিন্তু আমাদের

---

১. তবাকাত ইবনে সা'আদ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৬, হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২৪

অবস্থা এই যে, আমাদের কখনো চিন্তাই জাগে না যে, আমাদের মধ্যে খারাবি আছে, দোষ আছে। আমাদের আখলাক খারাপ। আমাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হচ্ছে। আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রদর্শন-প্রবৃত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। যশ-খ্যাতির জন্য কাজ হচ্ছে। দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে বসে যাচ্ছে। এসব চিন্তা খুব কম মানুষেরই জাগে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনের সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু এসব খারাবি থাকা আর না থাকার বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এসব মন্দ চরিত্র এমন যে, মানুষ নিজে বুঝতে পারে না যে, আমার মধ্যে এসব খারাপ দিক আছে। অহংকারী ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারে না যে, আমি অহংকার করছি। কোনো অহংকারকারীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কি অহংকার করছো? সে বলবে, আমি তো অহংকার করি না। কোনো অহংকারকারীই বলবে না যে, আমি অহংকার করি। কোনো হিংসুক স্বীকার করবে না যে, আমি হিংসা করি। অথচ তার অন্তরে অহংকার ও হিংসা ভরা।

আমাদের চিকিৎসক প্রয়োজন

এসব মন্দ চরিত্র মানুষের আখলাককে ধ্বংস করে দেয়। এজন্য এমন একজন চিকিৎসক প্রয়োজন, যিনি বুঝতে পারবেন যে, এই রোগ তার মধ্যে আছে কি না? থাকলে তার চিকিৎসা করবেন। এরই নাম তাসাওউফ ও পীর-মুরীদী। তাসাওউফের আসল হাকীকত এটাই। সুতরাং কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তাকওয়া অবলম্বন করো। তাকওয়া অবলম্বনের সহজ পন্থা এই যে, মুত্তাকীদের সাহচর্য অবলম্বন করো।'[১]

তোমরা তাদের সাহচর্য অবলম্বন করলে তাদের স্বভাব-চরিত্র তোমাদের মধ্যে চলে আসবে। তাদের প্রকৃতি তোমাদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। তোমাদের মধ্যে কোনো রোগ থাকলে তারা তা চিনবেন এবং চিকিৎসা করবেন। তোমাদের ইসলাহ করবেন। আখলাককে পরিশুদ্ধ করার এবং নিজেকে সংশোধন করার এই পদ্ধতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

---

১. সূরা তওবা, আয়াত-১১৯

নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা

যাই হোক, কুরআনে কারীমের এই হুকুম মতে সঠিক ইলমের অধিকারী, বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী, বাহ্যিকভাবে সুন্নাতের অনুসারী এবং কোনো বুযুর্গের কাছে নিজেকে সংশোধনকারী আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া এবং তার দিকনির্দেশনা মোতাবেক আমল করা নৈতিক পরিশুদ্ধির সহজ পন্থা।

সরলমনা মানুষ যাবে কোথায়!

বর্তমানে মানুষ প্রশ্ন করে থাকে যে, আমরা নিজেদের সংশোধনের জন্য কার নিকট যাবো? কোনো সংশোধনকারীই চোখে পড়ে না। আগের যুগে বড়ো বড়ো বুযুর্গ ও বড়ো বড়ো শাইখ ছিলেন। যেমন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, হযরত আল্লামা শিবলী এবং হযরত মারুফ কারখী রহ.। এখন তো এ সকল হযরত বিদ্যমান নেই। তাই যখন কোনো মুসলীহ নেই, তাই আমরা দায়মুক্ত। যা ইচ্ছা তাই করবো, কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজনটা কি?

কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিহ থাকবেন

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন যে, এটা শয়তানের অনেক বড়ো ধোঁকা। প্রথম কথা এই যে, কুরআনে কারীম যখন বলেছে যে, আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বন করো, তাই এ নির্দেশ শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এ নির্দেশ। তাই এ আয়াতের মধ্যে এ সুসংবাদও রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহওয়ালাগণ থাকবেন। শুধু খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন।

সব জিনিসের মধ্যেই ভেজাল রয়েছে

আমার ওয়ালেদ ছাহেব বলতেন, এটা ভেজালের যুগ। সব জিনিসের মধ্যে ভেজাল। গমের মধ্যে ভেজাল, ঘি-এর মধ্যে ভেজাল, দুধের মধ্যে ভেজাল। কোনো জিনিস খাঁটি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ভেজালের কারণে কি আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, অমুক জিনিসের মধ্যে যেহেতু ভেজাল রয়েছে এজন্য তা খাবো না। যেমন ঘি ও তেলের মধ্যে ভেজাল রয়েছে,

এজন্য আগামীতে ঘি ও তেল ব্যবহার করবো না, গ্রীজ ব্যবহার করবো। এটা করি না। বরং এই ভেজালের যুগেও আমরা খোঁজ করি যে, কোথায় ভালো ঘি পাওয়া যায়, কোথায় ভালো তেল পাওয়া যায়। সেখান থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করি। তিনি বলতেন, সব জিনিসের মধ্যে যখন ভেজাল তাই আল্লাহ ওয়ালাদের মধ্যেও ভেজাল আছে। কিন্তু কেউ তালাশ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সঠিক জায়গায় পৌছিয়ে দিবেন। আজও সংশোধনকারীগণ বিলুপ্ত হয়ে যাননি।

যেমন আত্মা, তেমন ফেরেশতা

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ যুগে আপনি যদি মনে করেন যে, আমার ইসলাহের জন্যে জুনায়েদ বাগদাদী রহ. প্রয়োজন, শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. প্রয়োজন, তাহলে এটা নির্বুদ্ধিতা হবে। কারণ নিয়ম হলো, 'যেমন আত্মা তেমন ফেরেশতা'। আপনি যেই মাপের, আপনার সংশোধনকারীও হবে সেই মাপের। এজন্য এখন পূর্বের যুগের মাপকাঠির সংশোধনকারী পাওয়া যাবে না। কিন্তু এমন সংশোধনকারী অবশ্যই পাওয়া যাবে, যিনি আপনার ইসলাহের জন্য যথেষ্ট। এজন্য কোনো আল্লাহওয়ালাকে খুঁজে নিন। তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করুন। নিজের সংশোধনের ফিকির করুন। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করবেন।

সারকথা

সারকথা এই যে, কুরআনে কারীম এই আয়াতের মধ্যে আমাদের আখলাককে পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আখলাক দ্বারা অভ্যন্তরীণ আমল উদ্দেশ্য। আখলাককে পরিশুদ্ধ করার উত্তম ও সহজ পন্থা হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করা। এজন্য আল্লাহ ওয়ালাদেরকে তালাশ করুন। তাদের সোহবত অবলম্বন করুন। তাদের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও শাইখের প্রয়োজনীয়তা*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ!

কয়েক বছর ধরে পবিত্র রমাযান মাসে হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মালফূযাত শোনানোর ধারা চলে আসছে। উদ্দেশ্য, আমাদের মধ্যে যেন ইসলাহের ফিকির পয়দা হয়। রমাযানুল মোবারকের মাস বিশেষভাবে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক পরিশুদ্ধি লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত। মানুষ যদি এ মাসের কদর করে এবং এ মাসে নিজের ইসলাহের ফিকির ও ইহতিমাম করে তাহলে সে দ্রুত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবে। এজন্য কয়েক বছর ধরে রমাযানুল মোবারকে হযরত থানভী রহ.-এর নৈতিক পরিশুদ্ধি সংক্রান্ত বাণী শোনানোর ধারা চলে আসছে।

'আনফাসে ঈসা' কিতাবের সংকলকের পরিচয়

এখন যে কিতাবটি আমার সামনে রয়েছে, এর নাম 'আনফাসে ঈসা'। এ কিতাবটি হযরত থানভী রহ.-এর ইসলাহী মালফূযাত, তারবিয়াতী হিদায়াত এবং আধ্যাত্মিক রোগসমূহের উপকারী ও পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্রের সারনির্যাস। হযরতের বিশিষ্ট খলীফা ও মুজায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব এটি সংকলন করেছেন। হযরত থানভী রহ.-এর খলীফাদের সংখ্যা অনেক। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুপাতে হযরতের নিকট থেকে ফয়েয লাভ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকে আমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্য তুল্য। কিন্তু

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭-৩৯, যোহরের নামাযের পর, রমাযানুল মোবারক, জামে মসজিদ দারুল উলূম, করাচী

প্রত্যেক খলীফার মধ্যে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে অন্যদের থেকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছে। হযরত মাওলানা ঈসা ছাহেব রহ. হযরত থানভী রহ.-এর প্রথম যুগের খলীফাদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরতের সঙ্গে সাদৃশ্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বাহ্যিক চেহারা-সুরত, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা সব বিষয়ে হযরতের সঙ্গে তাঁর খুব সাদৃশ্য ছিলো। এমনকি কণ্ঠস্বরের মধ্যেও সাদৃশ্য ছিলো। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন বাহির থেকে শ্রোতার ধোঁকা হতো যে, তিনি তিলাওয়াত করছেন, নাকি হযরত থানভী রহ. তিলাওয়াত করছেন? এতো বেশি সাদৃশ্য ছিলো! বাহ্যিকভাবে যখন এতো বেশি সাদৃশ্য ছিলো, তখন অভ্যন্তরীণভাবে কতো ফয়েয যে তিনি লাভ করেছেন, তা আমরা অনুমানও করতে পারবো না।

কারো যখন নিজের শাইখের সঙ্গে তীব্র মহব্বত ও পরিপূর্ণ মুনাসাবাত সৃষ্টি হয়, উপরন্তু দীর্ঘ সোহবত লাভ হয় এবং মজবুতভাবে ফয়েয হাসেল করে, তখন অনেক সময় বাহ্যিক অভ্যাস ইত্যাদির মধ্যেও সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।

হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের জামানাতেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে যে,

كَانَ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ

ভাব-ভঙ্গি, উঠা-বসা, চাল-চলন ও লেবাস-পোযাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর যেই পরিমাণ সাদৃশ্য ছিলো, অন্য কারো তা ছিলো না।[১]

মানুষ তাঁকে দেখে নিজেদের চক্ষু জুড়াতো, যেমন কি না হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করে চক্ষু জুড়াতো।

হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপার তো অনন্য মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। তবে এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নমুনা উম্মতের মধ্যেও পাওয়া যায়। এরই একটি নমুনা হযরত মাওলানা ঈসা ছাহেব রহ. এবং তাঁর শাইখ। যার মধ্যে এমন বাহ্যিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় তার সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি নিজের শাইখের রুচি-প্রকৃতি এবং ইলম ও ফয়েয আহরণ করেছেন এবং তা পুরোপুরি আত্মস্থ করেছেন।

---

১. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৪১, হাদীস নং ২৪১১৯, ফাযায়েলুস সাহাবা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৪০, হাদীস নং ১৫৪১

'আনফাসে ঈসা' কিতাবের পরিচয়

যাই হোক, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. হযরত থানভী রহ.-এর সোহবত ও খেদমতে থাকা অবস্থায় হযরতের যেসব কথা শুনেছেন এবং যেসব শিক্ষা অর্জন করেছেন, সেগুলোর সারকথা তিনি আমাদের জন্য এই 'আনফাসে ঈসা' কিতাবে সংকলন করেছেন। এ কিতাব হযরতের অন্যান্য সাধারণ মালফূযাতের সংকলনের মতো নয়। সাধারণ মালফূযাত ও মাজালিসের কিতাবসমূহে দেখা যাবে যে, হযরত কোনো বিষয়ে একটি কথা বলেছেন, কিছু সময় পর অন্য বিষয়ে আরেকটি কথা বলেছেন, তারপর তৃতীয় বিষয়ে তৃতীয় কথা বলেছেন আর মানুষ সেগুলোকে একত্রিত করেছে। কিন্তু এ কিতাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. এমনটি করেননি। বরং তিনি হযরত থানভী রহ.-এর সোহবতে থাকাকালে তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে যা শুনেছেন এবং যেই তালীম অর্জন করেছেন, প্রথমে তা নিজে আত্মস্থ করেছেন, তারপর তার সারকথা বেশির ভাগ হযরত থানভী রহ.-এর ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

এভাবে সেসব শিক্ষার সারনির্যাস তিনি আমাদের জন্য এ কিতাবে সংকলন করেছেন। এজন্য 'আনফাসে ঈসা' কিতাবটি আমাদের জন্য বিরল-বিস্ময়কর একটি নেয়ামত।

তাসাওউফের আসল লক্ষ্য কী?

তাসাওউফ, তরীকত, সুলুক, ইহসান একই অর্থের বিভিন্ন শব্দ। তাসাওউফের উদ্দেশ্য কেবল যিকির করা নয়। অনেকে মনে করে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য কেবলই যিকির করা। আমরা যখন কোনো শাইখের কাছে বাইআত হবো, তখন তিনি আমাদেরকে ওযীফা বলে দিবেন। কেউ কেউ মনে করে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য তাবিয-কবজ ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। শাইখ আমাদেরকে কিছু আমল, তাবিজ ও রূহানী চিকিৎসা দিবেন। ভালো করে বুঝুন যে, এসবের সঙ্গে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি যিকিরও তাসাওউফের মূল লক্ষ্য নয়। বরং যিকির হলো মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। এমনিভাবে কতক মানুষ মনে করে যে, তাসাওউফের উদ্দেশ্য হলো, নির্জনে বসে মোরাকাবা করা, চিল্লা লাগানো এবং মুজাহাদা করা, অথচ এগুলো তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং এগুলো হলো মূল উদ্দেশ্য অর্জনের বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি।

তাহলে তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমের এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

'সে ব্যক্তি সফলতা লাভ করলো, যে 'তাযকিয়া' তথা আত্মশুদ্ধি করলো।'[১]

আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে তাযকিয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ

'হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের থেকেই হবেন, যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালীম দিবেন এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন।'[২]

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কিতাব ও হিকমতের তা'লীমকে নবীরূপে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে 'তাযকিয়া'কে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। 'তাযকিয়া'র শাব্দিক অর্থ পাক-পবিত্র করা। শরীয়তের পরিভাষায় 'তাযকিয়া'র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের যেমন কিছু বাহ্যিক আমল আছে এবং এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ আছে; যেমন নামায পড়ো, রোযা রাখো, যাকাত দাও, হজ্ব করো ইত্যাদি, এগুলো হলো আদেশ। মিথ্যা বলো না, গীবত করো না, মদ পান করো না, চুরি করো না, ডাকাতি করো না, ইত্যাদি এগুলো হলো নিষেধ এবং গোনাহের কাজ। এগুলো থেকে বাঁচার জন্য শরীয়ত হুকুম দিয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তর অর্থাৎ কলবেরও কিছু কাঙ্খিত গুণ আছে, যেগুলো অর্জন করা ওয়াজিব। এগুলো আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো অর্জন করা ছাড়া দায়িত্ব আদায় হবে না। আর কিছু গুণ আছে বর্জণীয়। এগুলো বর্জন করা ওয়াজিব। এগুলো নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শোকর করা ওয়াজিব। কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে সবর করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালার উপরে তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করা ওয়াজিব। তাওয়াযু অর্থাৎ, নিজেকে নিজে ছোট মনে করা এবং বিনয় অবলম্বন করা ওয়াজিব। ইখলাস অর্জন করা ওয়াজিব।

---

১. সূরা আশ শামস, আয়াত-৯

২. সূরা বাকারাহ, আয়াত-১২৯

অর্থাৎ, প্রত্যেকটি কাজ কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে। ইখলাস ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। শোকর, সবর, তাওয়াক্কুল, তাওয়াযু, ইখলাস ইত্যাদি গুণসমূহকে 'ফাযায়েল' ও 'আখলাকে ফাযেলা' বলা হয়। এগুলো অর্জন করা ওয়াজিব।

এমনিভাবে আত্মার কিছু খারাপ গুণ আছে, যেগুলো হারাম ও নাজায়েয। যেগুলো থেকে বাঁচা জরুরী। এগুলোকে 'রাযায়েল' ও 'আখলাকে রাযীলা' বলা হয়। এসব গুণ খারাপ ও দোষণীয়। এগুলোকে নিষ্পেষিত করতে হয়। যাতে এগুলো মানুষকে গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে। উদাহরণস্বরূপ, অহংকার করা, অর্থাৎ নিজেকে নিজে বড়ো মনে করা। হিংসা করা। রিয়া করা, অর্থাৎ, আল্লাহকে খুশি করার পরিবর্তে মানুষকে খুশি করার জন্যে এবং তাদেরকে দেখানোর জন্যে কোনো দ্বীনি কাজ করা। অহংকার হারাম, হিংসা হারাম, বিদ্বেষ হারাম, প্রদর্শনপ্রবৃত্তি হারাম। অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকা, বরং ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, এটা হারাম। এগুলো রাযায়েল, যা মানুষের অন্তরে অবস্থান করে। এমনিভাবে ক্রোধকে মানুষ যদি অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করে তাহলে এটাও রাযায়েলের অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা এই যে, আত্মার অনেক ভালো গুণ আছে, যেগুলো অর্জন করা জরুরী। আর অনেক মন্দ চরিত্র আছে, যেগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরী। সূফীয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ নিজেদের মুরীদ ও শাগরিদদের অন্তরে ভালো গুণ অর্জনের জন্য পানি সিঞ্চন করেন এবং মন্দচরিত্রসমূহকে নিষ্পেষিত করার তালীম দান করেন। যেন মন্দ চরিত্র নিষ্পেষিত করতে করতে তা না থাকার পর্যায়ে চলে যায়। যার জন্য হযরত থানভী রহ. এই পরিভাষা বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমালা বা দরজায়ে ইযালা'। অর্থাৎ, অন্তরে যেসব মন্দ চরিত্র রয়েছে, সেগুলোকে এ পরিমাণ দমন ও নিষ্পেষিত করা যে, ঐ মন্দ চরিত্র থাকবে ঠিকই, তবে তা না থাকার মতো হয়ে যাবে। যাই হোক, তাসাওউফের মধ্যে রাযায়েলকে দমন করতে হয়, আর ফাযায়েলকে অর্জন করতে হয়। এরই নাম 'তাযকিয়া'। এটাই তাসাওউফের মূল লক্ষ্য।

শাইখের প্রয়োজনীয়তা

এই 'তাযকিয়া' সাধারণত কোনো শাইখের সাহচর্য অবলম্বন এবং তার সামনে নিজেকে বিলীন করা ছাড়া লাভ হয় না। কেন লাভ হয় না? এ কারণে যে,

لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ

অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয় ও শাস্ত্র অর্জনের জন্য সে বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের কাছে যাওয়া জরুরী। ফিকহের কোনো মাসআলা জানতে হলে কোনো মুফতী ছাহেবের কাছে যেতে হবে। কারণ তিনি এই শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন কোন প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক আমল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা এবং এ কথা চেনা যে, এ ব্যক্তির মধ্যে এ রোগ আছে কি না, সবার সাধ্যভুক্ত নয়? কারণ, আধ্যাত্মিক ব্যাধি প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। একটি জিনিস খুব ভালো, আরেকটি জিনিস খুব খারাপ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা বড়ো কঠিন। যেমন অহংকার করা হারাম এবং তা থেকে বাঁচা ওয়াজিব। কারণ অহংকার সর্ব রোগের মূল। আরেকটি গুণ হলো আত্মসম্মানবোধ, যা অর্জন করা ওয়াজিব। নিজেকে নিজে লাঞ্ছিত করা জায়েয নেই। কিন্তু এটা দেখা যে, কোনটা অহংকার, আর কোনটা আত্মসম্মান? যে কাজ আমি করছি, তা অহংকারের কারণে করছি, নাকি আত্মসম্মানের কারণে? এতোদুভয়ের মাঝে কে ভেদ রেখা টেনে দিবে? কে চিনবে যে, এটা অহংকার, আর এটা আত্মসম্মান? এটা সবার সাধ্যভুক্ত বিষয় নয়। বিশেষ করে মানুষের জন্যে নিজের এসব ব্যাধি চেনা বড়ো কঠিন কাজ।

যেমন, একটি ব্যাধি হলো নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করা। আমি এমন, আমি তেমন। আমার মধ্যে এই গুণ রয়েছে, আমার মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে, এটা হারাম। একে 'তা'আল্লী' (تعلى) ও অহমিকা বলা হয়। আরেকটি জিনিস হলো তাহদীসে নেয়ামত (تحديث نعمت) তথা নেয়ামতের বর্ণনা দেওয়া। যার সম্পর্কে কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে যে,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

'এবং আপনার প্রভুর নেয়ামতের বর্ণনা দিন।'[১]

এখন কে এর মাঝে পার্থক্য করবে যে, আমি যে গুণ বর্ণনা করছি, এটা 'তা'আল্লী' নাকি 'তাহদীসে নেয়ামত'?

---

১. সূরা আয যুহা, আয়াত-১১

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

আমার শাইখ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. থেকে শোনা একটি ঘটনা স্মরণ হলো। তিনি বলেন, একবার হাকীমূল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ. দিল্লীর মসজিদের মিম্বরে বসে ওয়ায করছিলেন। অনেক বড়ো মজমা সামনে উপবিষ্ট ছিলো। ওয়াযের মধ্যে তিনি বললেন, আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি কথা বলছি, যা আমার নিকটেই শুনবেন, অন্য কারো নিকটে পাবেন না। এ কথা আমি 'তাহদীসে নেয়ামত' হিসেবে বলছি যে, এই ইলম আল্লাহ তা'আলা আমাকেই দান করেছেন। এ কথা বলার পর মুহূর্তের জন্য তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আমি বলেছি যে, এ কথা আমার নিকটেই শুনবেন, অন্য কারো কাছে শুনতে পাবেন না, এটা তো দাবি ও অহমিকা। আমি নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করে আবার একে নেয়ামতের বর্ণনা নাম দিয়েছি। এজন্য আমি ইস্তিগফার করছি। আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! একে তো আমি নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করেছি, উপরন্তু এই বড়ত্বকে নেয়ামতের বর্ণনার পর্দায় লুকানোর চেষ্টা করেছি। আর নিয়ম হলো, গোপন গোনাহের তাওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য গোনাহের তাওবা প্রকাশ্যে করা উচিত। যেহেতু এই গোনাহ আমি প্রকাশ্যে করেছি তাই প্রকাশ্যে তাওবা করছি যে, এভাবে বলা আমার ভুল হয়েছে। এই ভুলের জন্য ইস্তিগফার করছি। আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ! ঠিক ওয়াযের মাঝখানে তিনি এই কাজ করলেন। অন্য কেউ এমন করে দেখাক! এ কাজ সে-ই করতে পারে যে নিজেকে মিটিয়েছে, নিজেকে বিলীন করেছে এবং নফসের সূক্ষ্ম চাল সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। নিজের নফসের উপর নজরদারি করে থাকে। সবসময় তার হিসাব নিতে থাকে। আপনি নিজে যদি দেখতে যান যে, যে কথা আমি বলছি, তা বড়ত্ব হিসাবে বলছি, নাকি নেয়ামতের বর্ণনা হিসাবে, তাহলে মনে রাখবেন, এতোদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা বড়ো কঠিন কাজ। এটা চেনা সবার কাজ নয়।

বিনয় ও নিজেকে অবমাননা করার মধ্যে পার্থক্য

এমনিভাবে বিনয় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট একটি জিনিস। উঁচু স্তরের একটি গুণ। কাঙ্খিত বস্তু। আরেকটি বিষয় হলো অন্যের সামনে নিজেকে লাঞ্ছিত করা।

এটা হারাম। আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্মানকে ওয়াজিব করেছেন। নিজেকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়। কিন্তু কোনটা বিনয় আর কোনটা নিজেকে অপমান করা, এই দুই জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা সবার সাধ্যভুক্ত নয়।

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

এই পার্থক্য সম্পর্কে হযরত থানভী রহ. নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার রেল গাড়িতে সফর করছিলাম। গাড়িতে আমার কাছে কিছু গ্রাম্য লোকও বসা ছিলো। যাত্রা পথে খাবার খাওয়ার সময় হলে ঐ গ্রাম্য লোকগুলো তাদের সাথে আনা সালুন-রুটি বের করে আমাকে দাওয়াত দিয়ে বললো, হযরতজী কিছু গু-মুত আমাদের সাথেও খাও। তারা এই খাবারকে বিনয়বশত গু-মুত নাম দিয়েছে! বাহ্যিকভাবে তো এটা বিনয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহপ্রদত্ত রিযিকের অবমূল্যায়ন। আল্লাহপ্রদত্ত রিযিককে গু-মুত নাম দিয়ে অন্যকে খাবার খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া বিনয় নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অবমূল্যায়ন, অকৃতজ্ঞতা ও অবমাননা।

মোটকথা, কখনো বিনয়ের প্রান্ত আত্ম-অবমাননার সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়, আর কখনো যুক্ত হয় অকৃতজ্ঞতার সাথে। এখন কি পরিমাণ বিনয় অবলম্বন করবে আর কি পরিমাণ করবে না, কোথায় বিনয় হচ্ছে আর কোথায় অবমূল্যায়ন হচ্ছে, কোথায় বিনয় হচ্ছে আর কোথায় আত্ম-অবমাননা হচ্ছে, এগুলোর মাঝে পার্থক্য করা সবার কাজ নয়। কোনো শাইখের নিকট তারবিয়াত গ্রহণ করা ছাড়া এটা লাভ হয় না।

শুধু কিতাব পড়িয়ে দেওয়ার দ্বারা এটা লাভ হয় না। কিতাবের মধ্যে পড়ে কোনো জিনিসের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা জানবে তারপর নিজেই তার শর্ত শারায়েত বের করবে তা হয় না। মনে রাখবেন! এটা এ ধরনের কাজ নয়। বরং হাতে-কলমে দীক্ষার মাধ্যমে এটা লাভ হয়। যখন মানুষ কোনো শাইখকে একাধারে দেখতে থাকে, তার কর্মপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করতে থাকে, নিজের অবস্থা জানিয়ে তার থেকে দিকনির্দেশনা নিতে থাকে, তখন তার মধ্যে এই জ্ঞান ও অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমল ও আখলাকের এই স্তর অর্জনযোগ্য এবং এই স্তর বর্জনযোগ্য।

সুগন্ধির দৃষ্টান্ত

আমি এর দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি যে, বড়ো থেকে বড়ো কোনো দার্শনিক ও যুক্তিবাদীকে যদি বলা হয় যে, তুমি এই গোলাপ ফুলের ঘ্রাণের এমন পূর্ণাঙ্গ

সংজ্ঞা দাও, যার ফলে চামেলী ফুলের ঘ্রাণ থেকে তাকে পার্থক্য করা যাবে। গোলাপ ফুল থেকেও ঘ্রাণ আসছে এবং চামেলী ফুল থেকেও ঘ্রাণ আসছে। এবার বড়ো থেকে বড়ো কোনো ভাষাবিদ ও কবি সাহিত্যিককে ডেকে বলুন যে, গোলাপ ও চামেলীর ঘ্রাণের পার্থক্য বর্ণনা করুন। বলুন! কেউ পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে কি? কখনোই পারবে না। এই পার্থক্য জানার একমাত্র রাস্তা হলো, প্রশ্নকারীকে বলা হবে, তুমি এই গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ শোঁকো, আর এই চামেলী ফুলের ঘ্রাণ শোঁকো। তাহলেই বুঝতে পারবে গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ কেমন হয়, আর চামেলী ফুলের ঘ্রাণ কেমন হয়। এ ছাড়া এতোদুভয়ের পার্থক্য বোঝার আর কোনো পথ নেই।

আম ও গুড়ের মিষ্টতার পার্থক্য

আরেকটি দৃষ্টান্ত শুনুন। আমও মিষ্টি, আবার গুড়ও মিষ্টি। গুড়ের মিষ্টতা কেমন, আর আমের মিষ্টতা কেমন? উভয়ের মিষ্টতার মধ্যে যে পার্থক্য তা বড়ো থেকে বড়ো কোনো দার্শনিক ও যুক্তিবাদী কখনোই বর্ণনা করতে পারবে না। কারণ, উভয়ের মিষ্টতার মধ্যে যে পার্থক্য তা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই পার্থক্য বোঝার জন্য প্রশ্নকারীকে বলতে হবে যে, তুমি গুড়ও খাও এবং আমও খাও। তাহলেই বুঝতে পারবে, আমের মিষ্টতা কেমন আর গুড়ের মিষ্টতা কেমন?

ঠিক একইভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক যেসব গুণ রয়েছে, যেমন বিনয়। কেউ যদি ভাষার মাধ্যমে এর পরিপূর্ণ সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে চায় তাহলে তা খুব কঠিন, কিন্তু যদি কোনো বিনয়ী মানুষকে দেখেন, তার কর্মপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন এবং তার সাহচর্য অবলম্বন করেন তাহলে এর ফলে ঐ সব গুণ আপনার মধ্যেও স্থানান্তরিত হতে থাকবে। এজন্য তাসাওউফ ও সুলুকের মধ্যে শাইখের সান্নিধ্য অবলম্বন করা ও তার শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। শুধু কথা বলার দ্বারা এ জিনিস লাভ হয় না। বরং কারো ঘষা-মাজা খেলে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেন, ফলে এ জিনিস লাভ হয়।

আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য

যাই হোক, পীর ও শাইখের হাতে বাই'আত হওয়া ফরয নয়। কোনো শাইখের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। আত্মশুদ্ধির জন্যে যখন কোনো মানুষ কোনো শাইখের শরণাপন্ন

হয়, তখন তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে উত্তম গুণাবলি লাভ করা এবং মন্দ চরিত্র দূর করা। মন্দ চরিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সুলূক ও তাসাওউফের এটাই মূল উদ্দেশ্য। তবে বিভিন্ন যিকির, আমল ও ওযীফা এ পথের পথিকের জন্য সহযোগী ও উপকারী বিষয়। তবে এসবের পরিমাণ, সময় ও ক্ষণ নির্ধারণ শাইখের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে হওয়া জরুরী। এর মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধির উপকার পাওয়া যায়। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় এসব যিকির ও ওযীফা এই পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়। আসল কাজ হলো নিজের চরিত্রের সংশোধন ও তার পরিশুদ্ধি। এর জন্যে শাইখকে নিজের অবস্থা জানাতে থাকা, তার থেকে দিকনির্দেশনা নিতে থাকা এবং সে অনুপাতে আমল করা অপরিহার্য। সারাটা জীবন এ কাজই করতে থাকবে। শাইখের শরণাপন্ন হওয়ার মূল উদ্দেশ্য এটাই।

এই 'আনফাসে ঈসা' কিতাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. 'রাযায়েল' ও 'ফাযায়েল' সংক্রান্ত যেসব মালফূয ও বাণী সংকলন করেছেন, সেগুলো পড়ছি এবং সাথে সেগুলোর কিছু ব্যাখ্যাও পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় এগুলো বোঝার তাওফীক দান করুন এবং এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'তাযকিয়া'র ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- ২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত তাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী।[১]

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! বেশ কিছুদিন ধরে সূরা মু'মিনূনের প্রথম আয়াতগুচ্ছের তাফসীর ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বর্ণনা চলে আসছে। এসব আয়াত এজন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সেসব মৌলিক গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, একজন মুসলমানের নিকট যেগুলো আল্লাহ তা'আলার কাম্য। আল্লাহ তা'আলা চান আমার ঈমানদার বান্দাগণ এসব গুণের অধিকারী হোক। তারা নিজেদের মধ্যে এসব গুণ সৃষ্টি

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৬৫-৮০, জুমার নামাযের পূর্বে, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা মু'মিনুন ১-৪

করুক। আল্লাহ তা'আলা একথাও বলেছেন যে, যারা এসব গুণের ধারক হবে এবং যারা এসব কাজ সম্পাদন করবে তারা সফলকাম হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব গুণের ধারক বানান এবং এসব কাজের তাওফীক দান করুন।

তিনটি গুণের বর্ণনা

সর্বপ্রথম গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা নামাযের মধ্যে খুশু অবলম্বন করে। আলহামদুলিল্লাহ! এ সম্পর্কে প্রয়োজন পরিমাণ আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা অসার, অহেতুক ও অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় না। অর্থাৎ, অহেতুক কাজের মধ্যে নিজের সময় ব্যয় করাকে পছন্দ করে না। অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি নিবেদন করেছি যে, এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এই যে, তারা যাকাত দেয়। যাকাতও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয। দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। এ সম্পর্কে গত দুই-তিন জুমায় বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছি। এতদসংক্রান্ত জরুরী মাসআলাসমূহও বর্ণনা করেছি। আজ এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ পেশ করবো।

আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থ

আরবী ভাষার ভিত্তিতে আয়াতটির আরো একটি অর্থ হতে পারে। তা এই যে, তারা এমন লোক যারা আত্মশুদ্ধি করে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে। এখানেও সেই একই সমস্যা। আমরা যখন আরবী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করি, তখন আরবী শব্দের অর্থ উপস্থাপনের জন্যে উর্দূতে সঠিক ও উপযুক্ত শব্দ পাই না। আমাদের ভাষায় 'যাকাত' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। এজন্য আমরা এ আয়াতের এভাবে তরজমা করি যে, এরা এমন লোক যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে। কিন্তু এখানে পবিত্রতা দ্বারা দৈহিক পবিত্রতা উদ্দেশ্য নয়। কারণ দৈহিক পবিত্রতার জন্য আরবী ভাষায় 'তাহারত' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখানে পবিত্রতা দ্বারা চারিত্রিক পবিত্রতা উদ্দেশ্য। আরবী

ভাষায় একে 'যাকাত' ও 'তাযকিয়া' বলা হয়। এদিক থেকে وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ আয়াতের তরজমা হবে, এরা এমন লোক যারা নিজেদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাখে এবং পাক-পবিত্র রাখে। চরিত্রের মধ্যে যেসব নোংরামি ও অপবিত্রতা অন্তর্ভুক্ত হয় তা থেকে তারা নিজেদেরকে পবিত্র করে। এই অর্থের দিক থেকে এ আয়াতের উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত এবং এর প্রেক্ষাপট অনেক ব্যাপক।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার চারটি উদ্দেশ্য

তবে এ কথা বোঝার পূর্বে জেনে নিন যে, কুরআনে কারীম কমপক্ষে চার জায়গায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের দায়িত্বের বর্ণনা দিয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন? কি দায়িত্ব তাকে ন্যস্ত করা হয়েছে? কি কাজ তাকে সম্পাদন করতে হবে? কুরআনে কারীম চার জায়গায় এসব কাজের বর্ণনা দিয়েছে। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

এ আয়াতে সর্বপ্রথম কাজ বলেছেন,

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

অর্থাৎ, আমি তাঁকে এজন্য পাঠিয়েছি, যেন তিনি মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন।

দ্বিতীয় কাজ বলেছেন,

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

আমি তাঁকে এজন্য পাঠিয়েছি, যেন তিনি মানুষকে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ শিক্ষা দেন। কারণ, মানুষ আমার এই কিতাব নিজে নিজে বুঝতে সক্ষম হবে না।

তৃতীয় কাজ বলেছেন,

وَالْحِكْمَةَ

যেন তিনি মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় শিক্ষা দেন।

চতুর্থ কাজ বলেছেন,

وَيُزَكِّيهِمْ

আমি তাঁকে এজন্য পাঠিয়েছি, যেন তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন। তাদেরকে পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেন।

পরিশুদ্ধির প্রয়োজন কেন?

আপনারা চিন্তা করে দেখুন এ আয়াতে 'তাযকিয়া' তথা পরিশুদ্ধির বর্ণনার পূর্বে কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের কথা এসেছে। তারপর কুরআনে কারীমের শিক্ষা ও তা'লীমের আলোচনা এসেছে। তারপর হিকমত শিক্ষা দেওয়ার কথা এসেছে। কিন্তু কুরআনে কারীম বলে যে, শুধু এই তিন কাজ যথেষ্ট নয়। বরং আপনার চতুর্থ কাজ এই যে, মানুষের আমল ও আখলাককে পরিশুদ্ধ করবেন। এখন প্রশ্ন জাগে যে, তিনি যখন কুরআনে কারীম শিখিয়েছেন, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন, হিকমতের কথার বর্ণনা দিয়েছেন, তাহলে এই অতিরিক্ত কাজের কথা কেন বলা হলো যে, আপনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করবেন।

বই-পুস্তকের শিক্ষার পর হাতে-কলমের শিক্ষা অপরিহার্য

এর উত্তর বোঝার পূর্বে এ কথা বুঝুন যে, দুনিয়াতে যতো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্ম রয়েছে, সেগুলোর এক তো হয়ে থাকে পুথিগত বা থিওরিটিক্যাল শিক্ষা। তার মধ্যে ঐ জ্ঞানের থিওরী ও দর্শনগত বর্ণনা দেওয়া হয়। তাকে তা'লীম বা শিক্ষা বলা হয়। কিন্তু দুনিয়ার কোনো শাস্ত্র বোঝার জন্যেই থিওরিটিক্যাল শিক্ষা যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে-কলমে ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া না হয়। আপনি যদি ডাক্তার হতে চান, তাহলে মেডিক্যাল সাইন্সের বই পড়লেই কি আপনি ডাক্তার হয়ে যাবেন? না। বরং আপনি যদি মেডিক্যাল সাইন্সের পুরো কোর্স পড়েন এবং সমস্ত থিওরী বুঝতে সক্ষম-ও হন যে, কি কি ব্যাধি হয় এবং সেগুলোর পিছনে কারণ কি থাকে এবং সেগুলোর চিকিৎসাই বা কি, এ সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানার পরেও আপনি ডাক্তার হতে পারবেন না। আপনি ডাক্তার তখন-ই হতে পারবেন, যখন

কোনো বিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে অবস্থান করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। চিকিৎসা কীভাবে করা হয়, রোগ নির্ণয় কীভাবে করা হয়, ঔষধপত্র কীভাবে নির্ধারণ করা হয়, রোগীর সঙ্গে কীভাবে আচরণ করা হয় ইত্যাদি, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি চিকিৎসা করার যোগ্য হবেন না। এ কারণেই যেসব প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল সাইন্স শিক্ষা দিয়ে থাকে, তারা কোর্স পুরা করার পর ইন্টার্নশীপ আবশ্যকীয় করে থাকে। হাসপাতালে অবস্থান করে অভিজ্ঞ কোনো ডাক্তারের সঙ্গে থেকে হাতে-কলমে চিকিৎসা-পদ্ধতি শিখতে হয়। প্রতিষ্ঠানে যা পড়েছিলো তা ছিলো শিক্ষার দর্শন, আর হাসপাতালে গিয়ে ওয়ার্ডে যেই ইনডোর ডিউটি করছে তা হলো প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা'লীম ও তারবিয়াত উভয়টির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় কাজের জন্যই প্রেরণ করেছেন। তিনি কুরআনে কারীমের থিওরিটিক্যাল শিক্ষাও দিবেন, তার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যও বুঝাবেন, একই সাথে তিনি মানুষের তারবিয়াত ও তাযকিয়াও করবেন। তাদের নেগরাণীও করবেন। তাদের আমল-আখলাককে কলুষতা মুক্ত করবেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। এসব বিষয় শুধু কিতাব পড়ানোর দ্বারা লাভ হয় না। দর্শন বুঝিয়ে দেওয়ার দ্বারা অর্জন হয় না। এগুলো সোহবতের মাধ্যমে লাভ হয়। মানুষ যখন কারো সাহচর্যে একটি উল্লেখযোগ্য সময় অবস্থান করে তার কর্মপদ্ধতি লক্ষ করে, তখন তার কর্মপদ্ধতির সৌরভ ক্রমান্বয়ে তার মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। এরই নাম 'তাযকিয়া'।

চারিত্রিক পরিশুদ্ধির অর্থ কি?

দ্বিতীয় তাফসীর অনুপাতে وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ আয়াতের অর্থ এই যে, সফলতা তারা লাভ করে, যারা নিজেদের আমল-আখলাককে পবিত্র করার জন্য পরিপূর্ণরূপে চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন হলো, পবিত্র করার অর্থ কি? শরীর পাক করতে হলে পানি দ্বারা নাপাকী ধুয়ে ফেলতে হয়। কাপড় পাক করতে হলে পানি দ্বারা নাপাকী ধুয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু আমল ও আখলাক পাক

করার পদ্ধতি কি? এগুলো কি পানি দিয়ে ধুতে হবে? নাকি গোসল দেওয়াতে হবে?

আত্মা মানুষের আমলের উৎস

খুব ভালো করে বুঝুন! মানুষের যাবতীয় আমলের মূল উৎস ও কেন্দ্র তার আত্মা। সর্ব প্রথম মানুষের অন্তরে আমলের ইচ্ছা সৃষ্টি হয় তারপর তার দ্বারা ঐ আমল সম্পাদিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি জুমার নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসলেন। তখন সর্বপ্রথম আপনার অন্তরে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে যে, আজকে জুমার দিন। মসজিদে গিয়ে আমার জুমার নামায আদায় করা উচিত। প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে, তারপর ঐ ইচ্ছা পোক্ত হয়েছে। মনের অলসতার বিরোধিতা করে ইচ্ছাকে সংকল্পে পরিণত করতে হয়েছে। এই সংকল্পের ফলে আপনার পা মসজিদের দিকে ধাবিত হয়েছে। আপনি যদি সংকল্প না করতেন তাহলে আপনার পা মসজিদের দিকে চলতে আরম্ভ করতো না। হ্যাঁ, কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে তার হাত-পা ইচ্ছা ছাড়াও নড়াচড়া করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, অনুভূতি আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে ইচ্ছা না জাগলে কোনো কাজ করতে পারবে না। সে কাজ ভালো হোক বা মন্দ। এতে বোঝা গেলো যে মানুষের সমস্ত কাজের উৎস তার আত্মা।

আত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ গচ্ছিত রাখা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা 'দিল' নামক বিস্ময়কর এক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে রক্তের একটি টুকরা মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐ রক্তের টুকরার সঙ্গে কিছু সূক্ষ্ম শক্তি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। সেসব শক্তি চোখে দেখা যায় না। কোনো ল্যাবরেটরিতে এগুলোর টেস্টও করা যায় না। কিন্তু এসব শক্তি আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আত্মার মধ্যে বিভিন্ন কামনা বাসনা সৃষ্টি হয়। এ কাজ করবো, ও কাজ করবো। অন্তরেই এসব বাসনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। অন্তরেই আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই ক্রোধ সৃষ্টি হয়। অন্তরেই চাহিদা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই দুনিয়া জোড়া কামনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই বেদনা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হয়। অন্তরেই আনন্দ সৃষ্টি হয়। এসব কিছুই আত্মাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

অন্তরে ভালো ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া উচিত

অন্তরে ভালো ইচ্ছা জাগ্রত হলে মানুষের দ্বারা ভালো কর্ম সম্পাদিত হয়। আর যদি মন্দ বাসনা জাগে তাহলে তার ইচ্ছাও মন্দ হয় এবং আমলও মন্দ হয়। এজন্য মানুষের যাবতীয় কল্যাণের ভিত্তি তার অন্তরে এমন কামনা বাসনা জাগ্রত হওয়ার উপর, যা সদিচ্ছা জন্ম দেয় এবং তার ফলে উত্তম আমল অস্তিত্ব লাভ করে। এমন কামনা বাসনা যেন অন্তরে সৃষ্টি না হয়, যার ফলে মানুষ ভুল পথে পতিত হয়। এমন ইচ্ছা জাগলেও তা যেন পরাভূত হয়। যাতে মানুষ ভুল পথে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে যায়। মানুষের সমস্ত কর্ম এই মূলনীতির অধীনেই আবর্তিত হয়।

আত্মার গুরুত্ব

এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণে ইরশাদ করেন,

اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'ভালো করে শুনে নাও! নিঃসন্দেহে দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে তা ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায়, আর তা খারাপ হলে পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়। খুব ভালো করে শোনো! সেই মাংসপিণ্ডটি হলো আত্মা।'[১]

আল্লাহ তা'আলা আত্মা নামের এক বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যার উপর মানুষের বাহ্যিক জীবনও নির্ভরশীল এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ভালো-মন্দও নির্ভরশীল। শারীরিক সুস্থতা আত্মার উপর নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি তো সকলেই জানে যে, আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকভাবে কাজ করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকে। আত্মা মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে কাজ আরম্ভ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার কাজ অব্যাহত থাকে। তার ছুটি নেই। তার

---

১. সুনানে বাইহাকী আলকুবরা, হাদীস নং ১০১৮০, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ২৯৭, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩৩, আযযাওয়াজির আন ইকতারাফিল কাবাইর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৮, ইতহাফুল খুবারাতিল মুহারা বি যাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারা, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৪, মুসতাখরাজে আবী আওয়ানা, হাদীস নং ৪৪৪৩, আযযুহদুল কাবীর লিল বাইহাকী, হাদীস নং ৮৭২, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৮, আল আরবাউন লিল ফাসাবী, হাদীস নং ৩৮, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩

কাজের কোনো বিরতি নেই। তার কখনো বিশ্রাম নেই। তার কাজ এই যে, সে এক মিনিটে বাহাত্তর বার পুরো দেহে রক্ত ছড়িয়ে দেয় আবার তা ফিরিয়ে নেয়। সে এ কাজ থেকে কখনোই বিশ্রাম পায় না। অন্যান্য অঙ্গের কাজের বিরতি আছে। অন্যান্য অঙ্গ বিশ্রাম করে। মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে তার চোখ বিশ্রাম করে, কান বিশ্রাম করে, দেহের অন্যান্য অঙ্গ বিশ্রাম করে, কিন্তু আত্মা ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার কাজ চালিয়ে যায়। এমনকি অচেতন অবস্থাতেও আত্মার কাজ অব্যাহত থাকে। কারণ, যেদিন আত্মা বিশ্রাম নিবে সেদিন ঐ মানুষের মৃত্যু ঘটবে। মানুষের ইহলীলা সাঙ্গ হবে।

দেহের সুস্থতা আত্মার সুস্থতার উপর নির্ভরশীল

এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আত্মা যদি সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী হয় তাহলে পুরা দেহ সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী হয়। আত্মা অসুস্থ হওয়ার চেয়ে মানুষের দেহের জন্য বড়ো কোনো বিপদ নেই। এজন্য জনৈক কবি বলেছেন,

نیست بیماری چوں بیماری دل

'আত্মার ব্যাধির সমান কোনো ব্যাধি নেই।'

এটা তো হলো আত্মার বাহ্যিক অবস্থা।

আত্মার ইচ্ছা পবিত্র হওয়া উচিত

আত্মার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ সৃষ্টি করেছেন। যার প্রভাবে কামনা-বাসনা সৃষ্টি হয় এবং আবেগ-উদ্দীপনা জন্ম গ্রহণ করে। যার দ্বারা ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। সেসব সূক্ষ্ম শক্তি যদি পাক-পবিত্র হয় তাহলে মানুষের আমলসমূহও পাক-পবিত্র হয়। আর যদি সেগুলো পাক-পবিত্র না হয়, বরং নোংরা ও নাপাক হয় তাহলে আমল-আখলাকও নাপাক হয়। একটি কাজ বাহ্যিকভাবে নেক আমল বলে দৃষ্টিগোচর হলেও আত্মার যেই ইচ্ছা ও প্রেরণা একে জন্ম দিয়েছে তা পাক না হলে ঐ আমলও পাক হবে না।

সদিচ্ছার দৃষ্টান্ত

উদাহরণস্বরূপ, এখন আমরা সকলে এখানে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে জুমার নামায পড়ার জন্য একত্রিত হয়েছি। নামায পড়া বাহ্যিকভাবে একটি ভালো আমল। আপনার আত্মা যদি আপনার দ্বারা এই নেক আমলটি এজন্য

করায় যে, নামায পড়া আল্লাহ তা'আলার হুকুম। আল্লাহ তা'আলার হুকুম তামিল করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। ছওয়াব দান করবেন। এই ইচ্ছায় যদি আমলটি করেন তাহলে এটা নেক আমল বলে গণ্য হবে। কিন্তু মন যদি এই ইচ্ছা করে যে, আমি জুমার নামায পড়ছি, যাতে মানুষের মধ্যে খ্যাতি লাভ হয় যে, এই লোকটি অত্যন্ত নামাযী, অত্যন্ত ইবাদতগুজার, অত্যন্ত পরহেযগার, মসজিদের মধ্যে প্রথম কাতারে গিয়ে নামায পড়ে, তাহলে আমলটি যদিও ভালো, কিন্তু ইচ্ছা খারাপ, কামনা খারাপ এবং আত্মা খারাপ হওয়ার ফলে তা বদ আমল রূপে পরিগণিত হবে। এজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে, তোমাদের আত্মা যদি সঠিক থাকে, সঠিক আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সঠিক ইচ্ছা ও সংকল্প সৃষ্টি করে তাহলে তোমাদের সমস্ত আমল সঠিক হবে। কিন্তু আত্মা যদি ঠিক না থাকে, সে যদি ভুল পথ দেখায় তাহলে তোমাদের আমলও ভুল হবে। বাহ্যিকভাবে দেখতে তা যতো ভালোই হোক না কেন।

আত্মার আমল হালাল হারাম উভয় প্রকার হয়ে থাকে

মোটকথা, অন্তরে ভালো কামনা সৃষ্টি হওয়া, ভালো উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া এবং বিশুদ্ধ সংকল্প সৃষ্টি হওয়ার নাম 'তাযকিয়া'। কারণ, তাযকিয়া অর্থ হলো আত্মাকে মন্দ কামনা, মন্দ উদ্দীপনা ও মন্দ সংকল্প থেকে পবিত্র করা। যেভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি বাহ্যিক আমলসমূহ আমাদের দায়িত্বে ফরয এবং মদ পান করা, মিথ্যা বলা, ঘুষ নেওয়া, ঘুষ দেওয়া এ সমস্ত বাহ্যিক আমল হারাম, ঠিক একইভাবে আত্মারও কিছু আমল আল্লাহ তা'আলা ফরয ও ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন এবং কিছু আমলকে হারাম ও নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন।

ইখলাস আত্মার হালাল আমল

যেমন, ইখলাস আত্মার একটি হালাল আমল। এটা হাত, পা, নাক, কান, জবানের কাজ নয়। কারণ ইখলাস জন্ম নেয় অন্তরে। এটা অভ্যন্তরীণ আমল। ইখলাস অর্জন করা তেমনি ফরয, যেমন ফরয নামায পড়া এবং রমাযানের রোযা রাখা। বরং ইখলাস এরচেয়েও বড়ো ফরয। কারণ অন্তরে ইখলাস না থাকলে বাহ্যিক সব আমল বেকার হয়ে যায়। নামায যদি ইখলাস ছাড়া পড়েন তাহলে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

শোকর ও সবর আত্মার আমল

এমনিভাবে নেয়ামতের জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা আত্মার একটা অমল। মানুষ আত্মা দিয়ে একথা চিন্তা করবে যে, আমি এই নেয়ামতের যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কেবলই দয়া করে আমাকে এই নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন। একে শোকর বলে, এটা আত্মার আমল। এটা ফরয।

আত্মার আরেকটি আমল হলো সবর। সবরের অর্থ হলো, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটলে বা কোনো কষ্টের শিকার হলে মানুষ চিন্তা করবে যে, যদিও আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার উপর রাযি আছি। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করছেন তা হিকমতের দাবিতেই করছেন। এর নাম সবর, এটা আত্মার কাজ। এ গুণটি অর্জন করা ফরয। এরকম আরো অনেক আমল আছে, যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে, এগুলোকে 'আখলাক' বলা হয়। উত্তম আখলাক অর্জন করা ফরয।

তাকাব্বুর আত্মার হারাম কাজ

আত্মার সাথে সম্পৃক্ত কিছু আমল এমন আছে, যেগুলো হারাম। যেমন অহংকার করা, নিজেকে নিজে বড়ো মনে করা। এমন মনে করা যে, আমার মতো আর কেউ নেই। আমার তুলনায় অন্য সবাই তুচ্ছ। তাদের কোনোই গুরুত্ব নেই। আমি সবচেয়ে বড়ো। এটা তাকাব্বুর। এটা অন্তরে সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এই অহংকার মুখে প্রকাশ পায় না। মুখে তো বলে যে, আমি খুবই তুচ্ছ, খুবই অধম, খুবই খারাপ, কিন্তু অন্তরে অহংকার ভরা থাকে। কারণ, সে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই অহংকার আত্মার ব্যাধি, যা হারাম। অহংকার এতো মারাত্মক যে, শূকরের মাংস খাওয়ার চেয়েও তা অধিক হারাম। মদ পান করার চেয়েও অধিক হারাম। কারণ, অহংকারকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যুদ্ধকারী। কারণ বড়ত্ব শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্যই অবধারিত। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি বড়ো, সে মূলত আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মোটকথা, অহংকার অনেক বড়ো বিপদ ও হারাম।

এরই নাম 'তাযকিয়া'

এমনিভাবে হিংসা আত্মার একটি ব্যাধি। অর্থাৎ, অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো একটা নেয়ামত লাভ করেছে। এই নেয়ামত দেখে অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি

হচ্ছে যে, এই নেয়ামত সে কেন পেলো? এই নেয়ামত তার হাতছাড়া হোক। এই যে বাসনা তার অন্তরে জাগ্রত হচ্ছে, এটা হারাম। মোটকথা, বাহ্যিক আমলসমূহের মধ্যে যেমন কিছু ফরয, ওয়াজিব, আর কিছু হারাম রয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের আবেগ-উদ্দীপনা, কামনা-বাসনা ও ইচ্ছা-সংকল্পের মধ্যেই কিছু রয়েছে ফরয ওয়াজিব, আর কিছু রয়েছে হারাম। ফরয ও ওয়াজিবসমূহকে মানুষ ঠিক রাখবে, আর যেগুলো গোনাহ ও হারাম সেগুলো থেকে নিজের আত্মাকে রক্ষা করবে, এরই নাম তাযকিয়া, এরই নাম আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। তাই এ আয়াতের মধ্যে যে বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

সে সব লোক, যারা তাযকিয়া করে।

অর্থাৎ, নিজেদের আত্মাকে অপবিত্র চরিত্র, উদ্দীপনা ও ইচ্ছা থেকে পবিত্র করে তারা সফলকাম।

তাসাওউফের প্রকৃত স্বরূপ

আপনারা তাসাওউফ শব্দটি অনেকবার শুনে থাকবেন। মানুষ তাসাওউফ সম্পর্কে অনেক ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে একে একটি অপবিত্র জিনিস বানিয়ে দিয়েছে। অথচ তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য হলো আপনার আবেগ-অনুভূতি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। আপনার স্বভাব-চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। আপনার কামনা-বাসনা বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। এগুলোকে বিশুদ্ধ করার পদ্ধতিই তাসাওউফের মধ্যে বলা হয়। এতোটুকুই হলো তাসাওউফের হাকীকত। এর অতিরিক্ত মানুষ যেসব বিষয়কে তাসাওউফের অন্তর্ভুক্ত করেছে, তাসাওউফের সাথে সেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। ফকীহগণ যেভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, বেচা-কেনা, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বাহ্যিক আমলসমূহের বিধান বর্ণনা করে থাকেন, তেমনিভাবে সূফীয়ায়ে কেরাম আত্মার মধ্যে সৃষ্ট আবেগ-অনুভূতির বিধানসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

সারকথা

মোটকথা, কুরআনে কারীম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবীরূপে প্রেরীত হওয়ার যেসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য মানুষের চরিত্র পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ আগামী জুমাগুলোতে পেশ করব। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাজ সংস্কার কীভাবে হবে?*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

‘হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎ পথে রয়েছো, তখন কেউ পথ ভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করতে।’[১]

এই বিরল-বিস্ময়কর আয়াতটি আমাদের মারাত্মক একটি ব্যাধি নিরূপণ করেছে। যদি বলা হয় যে, আয়াতটি আমাদের অসুস্থ শিরার উপর হাত রেখেছে, তাহলে অতিশয়োক্তি হবে না। মানুষের মনস্তত্ত্ব, তার রুচি-প্রকৃতি এবং তার রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক আর কে জানতে পারে? তাছাড়া এ আয়াতের মধ্যে আমাদের বড়ো একটি প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমানে আমাদের অন্তরে খুব বেশি জাগ্রত হয়।

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৮-২২০, শুক্রবার, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা মায়েদা, আয়াত-১০৫

সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে কেন?

প্রথমে সে প্রশ্নটি তুলে ধরছি, তাহলে আয়াতটির অর্থ ভালোভাবে বুঝে আসবে। অনেক সময় আমাদের অন্তরে প্রশ্ন জাগে যে, আমরা সমাজ সংস্কার ও অবস্থার উন্নতির জন্য সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দিক থেকে এবং বিভিন্ন কোণ থেকে অনেক চেষ্টা হতে দেখছি। অনেক সংগঠন, অনেক দল, অনেক জামাত, অনেক ব্যক্তি, অনেক জলসা, অনেক সমাবেশ ও অনেক সম্মেলন হতে দেখছি। বাহ্যিকভাবে সবগুলোর উদ্দেশ্য সমাজে বিস্তৃত দুরাচারসমূহ বন্ধ করা। সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে আসা। মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানানোর চিন্তা-চেষ্টা করা। সবার লক্ষ্য ও উদ্দশ্য অবস্থার সংশোধন, সমাজ সংস্কার, উন্নতি ও সফলতা ইত্যাদি বড়ো বড়ো বিষয়। বড়ো বড়ো দাবীও করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত দল, সংগঠন ও ব্যক্তি এ কাজে ব্যস্ত, তাদের সংখ্যা হাজার হাজার হবে। হাজার হাজার দল, হাজার হাজার ব্যক্তি এ কাজ করছে।

অপরদিকে বাজার, অফিস এবং ব্যস্ত ও জাগ্রত জীবন কাছে থেকে দেখার সুযোগ হলে অনুভূত হয় যে, সব প্রচেষ্টার বিপরীতে মন্দ কাজের ঢল চলছে। সংস্কার প্রচেষ্টার উল্লেযোগ্য কোনো প্রভাব সমাজের উপর দৃষ্টিগোচর হয় না। বরং মনে হয় যে, জীবনের চাকা একইভাবে ভুল পথে ঘুরে চলছে। উন্নতি হলে মন্দ কাজে হচ্ছে, ভালোর দিকে হচ্ছে না। তাই প্রশ্ন জাগে যে, এতো সব চেষ্টা সমাজ পরিবর্তনে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? দুই-একটি দৃষ্টান্ত অবশ্য এর ব্যতিক্রম রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিলে উল্লেযোগ্য কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। এর কারণ কী?

রোগ নির্ণয়

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে এই প্রশ্নের উত্তরও দান করেছেন এবং আমাদের একটি রোগও নির্ণয় করেছেন। এটি এমন একটি আয়াত, যা বেশিরভাগ সময় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এর অর্থও আমাদের জানা থাকে না এবং এর মর্মও আমাদের সামনে থাকে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা নিজেদের খবর নাও, তোমরা যদি সঠিক পথে চলে আসো (তোমরা যদি হেদায়েত লাভ করে সঠিক পথ অবলম্বন করো) তাহলে যেসব লোক পথভ্রষ্ট রয়েছে তাদের এই ভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে আল্লাহ তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে কি করেছো?'[১]

নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল, আর অন্যদের চিন্তায় মগ্ন

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আমাদের অত্যন্ত মৌলিক একটি ব্যাধির কথা বলেছেন যে, সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার একটি বড়ো কারণ হলো, যে ব্যক্তিই সংস্কারের পতাকা নিয়ে দাঁড়ায়, তারই কামনা থাকে অন্য ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন ও সংস্কার করতে আরম্ভ করুক। আর যে ব্যক্তি অন্যদেরকে আহ্বান করছে, দাওয়াত দিচ্ছে, ইসলাহের পয়গাম দিচ্ছে, সে নিজের ব্যাপারে উদাসীন এবং নিজের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে গাফেল। আমরা সবাই একটু চিন্তা করে দেখি, বিভিন্ন সমাবেশে, বিভিন্ন সভায় আমরা খুব মজা নিয়ে সমাজের মন্দ দিকসমূহের আলোচনা করি আর বলি যে, 'সব মানুষ এই কাজ করছে' 'মানুষের অবস্থা এই', 'সমাজের অবস্থা এতো খারাপ হয়ে গেছে', 'আমি অমুককে দেখেছি সে এই কাজ করছিলো'। এই বিকৃত সমাজে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো অন্যের উপর আপত্তি করা, অন্যের সমালোচনা করা, অন্যের দোষ বর্ণনা করা যে, মানুষ এই করছে, সমাজের মধ্যে এই হচ্ছে ইত্যাদি। আমাদের খুব কম বৈঠকই এবং খুব কম সমাবেশই এসবের আলোচনা থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু কখনো নিজের দিকে তাকিয়ে দেখার তাওফীক হয় না যে, আমি নিজে কতো নষ্ট হয়ে গেছি। আমার নিজের অবস্থা কতো খারাপ হয়ে গেছে। আমার নিজের কর্মপদ্ধতি কতো ভুল। এর কি পরিমাণ সংশোধন প্রয়োজন! শুধু অন্যের সমালোচনার ধারা অব্যাহত থাকে। অন্যের দোষের অনুসন্ধান চলতে থাকে। এর ফল এই হয় যে, সমস্ত আলোচনা কথার ফুলঝুড়ি ফুটানো, আসর জমানো এবং স্বাদ গ্রহণের জন্য হয়ে থাকে। ফলে সংশোধনের দিকে কোনো পদক্ষেপ অগ্রসর হয় না।

---

১. সূরা মায়েদা, আয়াত-১০৫

সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি

একটি হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কি অপূর্ব তার এ বাণী! আমাদের সকলের তা মুখস্থ রাখা উচিত। তিনি বলেন,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যে ব্যক্তি বলে যে, সারা দুনিয়ার মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে (অর্থাৎ অন্যদের উপর আপত্তি করে যে, মানুষ বিগড়ে গেছে, তাদের মধ্যে বদদ্বীনি ছেয়ে গেছে, তাদের মধ্যে বিপথগামিতা চলে এসেছে, তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হচ্ছে) সে ব্যক্তি নিজেই সবচে' বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত।'[১]

কারণ এই যে, সে অন্যদের উপর আপত্তি উত্থাপনের জন্য বলছে যে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। বাস্তবেই যদি তার ধ্বংস নিয়ে চিন্তা থাকতো, তাহলে আগে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতো এবং নিজের সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতো।

অসুস্থ ব্যক্তির অন্যের অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়?

যে ব্যক্তির পেট ব্যথা হচ্ছে, পেট মোচড়াচ্ছে, কোনোভাবেই শান্তি পাচ্ছে না, সে অন্যের হাঁচির বিষয়ে কীভাবে চিন্তা করবে? অন্যের হাঁচি আসছে, সর্দি আসছে তা নিয়ে কিসের পরওয়া করবে। আল্লাহ না করুন, আমার পেটে যদি তীব্র ব্যথা হয়, তাহলে আমার নিজের চিন্তা হবে, নিজের জানের চিন্তা হবে, নিজের ব্যথা দূর করার চিন্তা হবে, নিজের কষ্ট দূর করার চিন্তা হবে, তখন অন্যের ব্যাধি ও অন্যের সাধারণ কষ্টের দিকে মনোযোগ যাবে না। এমনও দেখা গেছে যে, নিজের কষ্ট সাধারণ, আর অন্যের কষ্ট অনেক বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কষ্টের চিন্তা এতো বেশি আচ্ছন্ন করে রাখে যে, অন্যের অধিক কষ্টের দিকে দৃষ্টি যায় না।

তার পেটে তো ব্যাথা নেই

আমার এক আত্মীয়া মহিলা ছিলেন। তার পেটে ব্যথা ছিলো। সে ব্যথা খুব বেশি আশঙ্কাজনকও ছিলো না। তাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য ডাক্তার

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৫৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৩১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ১৫৫৯

খানায়ও নিয়ে যাই। লিফটে যাওয়ার সময় দেখি যে, এক মহিলা হুইল চেয়ারে বসে এদিকে আসছে। তার হাত-পা ভাঙ্গা, প্লাস্টার করা, বুক জ্বলা, খুব মর্মান্তিক তার অবস্থা। আমি আমার আত্মীয়া মহিলাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললাম যে, দেখুন! এই মহিলাটি কি মারাত্মক পেরেশানি ও কষ্টের মধ্যে আছে। তাকে দেখলে নিজের কষ্ট কম অনুভব হয়। মুখে আল্লাহর শোকর চলে আসে। তখন উত্তরে ঐ মহিলা বললেন, বাস্তবিকই তার হাত-পা ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু তার পেটে তো ব্যথা নেই। দেখুন! তার চিন্তায় সবচেয়ে বড়ো কষ্ট এই যে, আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে। অন্যের জ্বলে যাওয়া চামড়া ও ভাঙ্গা হাত-পা দেখেও নিজের কষ্টের চিন্তা দূর হচ্ছে না। কারণ, নিজের কষ্ট ও রোগের অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু যার নিজের কষ্ট ও রোগের অনুভূতি নেই, সে অন্যের সাধারণ সাধারণ কষ্ট দেখে থাকে। তাই আমাদের বড়ো একটি ব্যাধি এই যে, আমরা নিজেদের সংশোধনের বিষয়ে গাফেল। অন্যের উপর আপত্তি ও অন্যের সমালোচনা করতে আমরা সদা প্রস্তুত।

রোগের চিকিৎসা

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মধ্যে বলেন যে, হে ঈমানদারগণ! প্রথমে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করো। তোমরা বলো, অমুক গোমরা হয়ে গেছে, অমুক ধ্বংস হয়ে গেছে। মনে রেখো! তুমি যদি সঠিক পথে থাকো, তাহলে তার বিপথগামিতা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষের সাথে তার নিজের আমল যাবে। এজন্য নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো। তোমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যাবে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা কী আমল করতে? তোমাদের আমল বেশি ভালো ছিলো, নাকি অন্যদের আমল? জানা তো নেই যার উপর আপত্তি করছেন, যার দোষ তালাশ করছেন, তার কোনো কাজ, তার কোনো আঙ্গিক, আল্লাহ তা'আলার নিকট এতো মাকবুল যে, সে আপনার চেয়ে আগে চলে যাবে। মোটকথা, শুধু আসর জমানোর জন্যে, শুধু কথার মজা ভোগ করার জন্যে আমরা যেসব কথা বলে থাকি, তা সংশোধনের পথ নয়।

আত্মসমালোচনার মজলিস

হ্যাঁ, কোথাও যদি এ উদ্দেশ্যে সভা অনুষ্ঠিত করা হয় যে, সেখানে আত্মসমালোচনা করা হবে। নিজেদের মধ্যে কি কি দোষ রয়েছে, তা নিয়ে

আলোচনা করা হবে। আর তাতে মানুষ এই নিয়তে অংশগ্রহণ করে যে, এসব কথা শুনবে, বুঝবে এবং সে অনুপাতে আমল করার চেষ্টা করবে, তাহলে এমন বৈঠক করা ঠিক আছে।

মানুষের সর্ব প্রথম কাজ

মানুষের সর্ব প্রথম কাজ এই যে, নিজের রাত-দিনের উপর জরিপ চালাবে এবং দেখবে যে, আমি কতোটুকু কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক এবং তাঁর বলা পদ্ধতি অনুপাতে করছি, আর কতোটুকু কাজ তার বিপরীত করছি। যদি দেখা যায় যে, তার বিপরীত করছি, তাহলে তা সংশোধনের পথ কী? আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে এই চিন্তা জাগ্রত করে দিলে আমাদের সমাজও সংশোধিত হয়ে যাবে।

সমাজ কি?

সমাজ কিসের নাম? মানুষের সমষ্টি হলো সমাজ। প্রত্যেকের যদি নিজের সংশোধনের চিন্তা জাগ্রত হয়, তাহলে পুরো সমাজ নিজে নিজে শুধরে যাবে। আর যদি প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের চিন্তা করে, নিজের চিন্তা বাদ দেয়, তাহলে পুরা সমাজ খারাপই থেকে যাবে।

সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি

সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে, তাঁদের প্রত্যেকে এই চিন্তায় মগ্ন যে, কীভাবে আমি ঠিক হতে পারি? কীভাবে আমার ব্যাধি দূর করতে পারি? হযরত হানযালা রাযি. একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আসতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে অবস্থান করে এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে অন্তরে কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতো, আত্মা কেমন বিগলিত হতো, কেমন আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একদিন তিনি অস্থির চিত্তে চিৎকার করতে করতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং নিবেদন করলেন,

نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَارَسُولَ اللهِ

'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।'[১]

হযরত হানযালা রাযি. নিজের সম্পর্কে বলছেন যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে মুনাফিক হলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মজলিসে বসা থাকি, আপনার কথাবার্তা শুনি, অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং অবস্থা সংশোধনের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন বাইরে চলে যাই এবং দুনিয়ার কাজে মগ্ন হই, তখন আপনার মজলিসে বসে যে আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো তা লোপ পেয়ে যায়। এটা তো মুনাফিকের কাজ যে, বাইরের অবস্থা থাকবে এক রকম, আর ভিতরের অবস্থা থাকবে অন্য রকম। এ জন্য আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমি মুনাফিক হয়ে যাইনি তো!

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হানযালা! তুমি মুনাফিক হওনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। সবসময় মনের অবস্থা এক রকম থাকে না। কখনো আবেগ-অনুভূতি বেশি হয়, আর কখনো কম হয়। এর দ্বারা এ কথা মনে করা যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি, এটা ঠিক নয়।

হযরত হানযালা রাযি.-এর অন্তরে নিজের সম্পর্কে তো চিন্তা জেগেছে যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি, কিন্তু তিনি অন্য কাউকে মুনাফিক বলেননি। আত্মসমালোচনা করে নিজেকে নিজে মুনাফিক চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েছেন। নিজের চিন্তা করেছেন যে, আমার মধ্যে মুনাফিকি নেই তো?

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর বৈশিষ্ট্য

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অনেক রহস্যের কথা বলেছিলেন। তাঁকেই গোপনে মুনাফিকদের পুরো তালিকা বলেছিলেন যে, মদীনা শরীফের অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। এতো আস্থাপূর্ণভাবে বলেছিলেন যে, মদীনা শরীফে কারো মৃত্যু হলে সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ করতেন যে, এর জানাযার নামাযে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. অংশ নিয়েছেন কি না। যদি হযরত হুযাইফা রাযি. অংশ নিতেন তাহলে এটা আলামত ছিলো যে, এ ব্যক্তি মুমিন। আর যদি তিনি ঐ জানাযায় অংশ না নিতেন তাহলে সাহাবায়ে কেরাম অনুমান

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৩৭, সুনানে তিরমিযী, হাদসী নং ২৪৩৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২২৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৯৪৯

করতেন যে, হয় তো এ ব্যক্তি মুনাফিক। যদি মুমিন হতো তাহলে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. তার জানাযার নামাযে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর নিজের সম্পর্কের মুনাফেকির আশঙ্কা

হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর ফারুক রাযি. খলীফা হয়েছেন। দুনিয়ার বেশি অর্ধেকের উপর তাঁর রাজত্ব চলছে। প্রসিদ্ধ আছে যে, সবসময় তিনি মানুষের সংশোধনের জন্যে ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত, এমতাবস্থায় তিনি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে তোষামোদ করে বলছেন যে, হে হুযাইফা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মুনাফিকদের যেই তালিকা বলেছেন তার মধ্যে খাত্তাবের পুত্র ওমরের নাম নেই তো? হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর অন্তরে চিন্তা জাগছে যে, এ তালিকায় আমার নাম নেই তো? আমি তো মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত নই?[১]

আত্মা থেকে বের হওয়া কথায় প্রভাব হয়ে থাকে

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এই ছিলো যে, তাঁদের প্রত্যেকের সবসময় চিন্তা ছিলো যে, আমার কোনো কাজ, আমার কোনো কর্ম, আমার কোনো কথা, আমার কোনো ভঙ্গি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের পরিপন্থী নয় তো? এই চিন্তা নিয়ে যখন তাঁরা অন্য কাউকে সংশোধনের কোনো কথা বলতেন, তা মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতো। এর ফলে জীবনে পরিবর্তন সাধিত হতো। বিপ্লব ঘটতো। বিপ্লব ঘটিয়ে তাঁরা জগতবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লামা ইবনে জাউযী রহ. বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তাঁর একেক ওয়াযে নয়-নয়শ' মানুষ তাঁর হাতে গোনাহ থেকে তাওবা করেছে। ওয়ায করেছেন, আর মানুষের মন কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতা খুব আবেগ উদ্দীপ্ত ছিলো না। তাঁর বক্তব্য সাহিত্য ও অলংকারপূর্ণ ছিলো না। আসল বিষয় এই ছিলো যে, মন থেকে উত্থিত আবেগ যখন মুখে চলে আসে, তখন তা অন্যদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯

আমলহীন মানুষের কথায় প্রভাব সৃষ্টি হয় না

আমাদের অবস্থা এই যে, আমি আপনাকে একটি বিষয়ে নসীহত করছি, কিন্তু তার উপর আমার নিজেরই আমল নেই। এজন্য প্রথমত এ কথার প্রভাবই সৃষ্টি হবে না, আর যদি প্রভাব সৃষ্টি হয়ও তাহলে শ্রোতা চিন্তা করবে যে, এটা যদি ভালো কাজই হতো, তাহলে প্রথমে সে নিজে এর উপর আমল করতো। এভাবে তার কথা বাতাসে উড়ে যায়। এর কোনো প্রভাব সৃষ্টি হয় না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ বিপ্লব ঘটিয়েছে। মাত্র তেইশ বছর সময়ে পুরো আরব উপদ্বীপের রূপ পাল্টে দিয়েছে। বরং সমগ্র পৃথিবীর চেহারার পরিবর্তন সাধন করেছে। এই বিপ্লব এজন্য ঘটেছে যে, তিনি উম্মতকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রথমে নিজে তার উপর সর্বাধিক আমল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমাদেরকে তিনি হুকুম দিয়েছেন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, অথচ তিনি নিজে প্রতিদিন আট ওয়াক্ত নামায পড়তেন। অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়া ইশরাক, চাশ্‌ত ও তাহাজ্জুদও পড়তেন। বরং তাঁর অবস্থা তো এই ছিলো যে,

إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

অর্থাৎ, যখন তাঁর কোনো পেরেশানী দেখা দিতো, সাথে সাথে নামাযের জন্য দাঁড়াতেন এবং আল্লাহমুখী হয়ে দু'আ করতেন।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

'আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে।'[২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা

এমনিভাবে অন্যদেরকে সারা বছরে শুধুমাত্র রমাযানের এক মাস রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে বছরের প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন

---

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১১২৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৭০

২. সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৩৮৭৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৮৪৫

দিন রোযা রাখতেন। কতক সময় তিন দিনের অধিকও রাখতেন। অন্যদেরকে তো হুকুম দিচ্ছেন যে, ইফতারের সময় হলে অবিলম্বে ইফতার করবে। দুই রোযা একত্র করাকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এভাবে রোযা রাখাকে 'সওমে বেসাল' বলা হয়।

'সওমে বেসালে'র নিষেধাজ্ঞা

কতিপয় সাহাবীকে তিনি দেখলেন, তারা দুই রোযাকে মিলিয়ে 'সওমে বেসাল' রাখে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করে বললেন, তোমাদের জন্য এভাবে মিলিয়ে রোযা রাখা জায়েয নেই, হারাম। কিন্তু তিনি নিজে 'সওমে বেসাল' রাখতেন এবং বলতেন, তোমরা নিজেদেরকে আমার সাথে তুলনা করো না। কারণ, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এভাবে রোযা রাখার শক্তি নেই, আমার মধ্যে আছে, এজন্য আমি রাখি। অন্যদের জন্য সহজ ও সুবিধাজনক পথ বলে দিয়েছেন যে, ইফতারের সময় খুব পানাহার করো। সারারাত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত

আমাদেরকে তো তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, নিজের সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থা এই ছিলো যে, যতো সম্পদ আসতো সব দান করে দিতেন। একবার তিনি নামায পড়ানোর জন্য জায়নামাযের উপরে দাঁড়ালেন। একামত হলো। নামায আরম্ভ হবে। এমন সময় হঠাৎ তিনি জায়নামায থেকে সরে গিয়ে ঘরের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। অল্প সময় পর ফিরে আসলেন। নামায পড়ালেন। সাহাবায়ে কেরাম অবাক হলেন। নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি এমন কাজ করেছেন ইতিপূর্বে যা কখনো করেননি, এর কারণ কি? সরকারে দো 'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, যখন আমি জায়নামাযে দাঁড়ালাম তখন আমার স্মরণ হলো, আমার ঘরে সাতটি দিনার রয়েছে। আমার লজ্জা হলো

---

১. সহীহ বোখারী, হাদীস নং ১৮২৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৪৫২২, মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ৫৯১, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ১৬৪১

যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর সামনে এমতাবস্থায় হাজির হবে, যখন তাঁর ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাতটি দিনার রয়েছে। তাই আমি সেগুলোকে যথাস্থানে কাজে লাগিয়ে তারপর এসে নামায পড়ালাম।[১]

আল্লাহর মাহবুব পরীখাও খনন করেছেন

খন্দকের যুদ্ধে পরীখা খনন করা হচ্ছিলো। সাহাবায়ে কেরাম পরীখা খনন করছিলেন। এমন ছিলো না যে, অন্যরা তো পরীখা খনন করছে, আর নিজে আমীর হওয়ার কারণে আরামে বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। সেখানের অবস্থা তো এই ছিলো যে, অন্যেরা পরীখা খনন করার জন্য যে পরিমাণ অংশ পেয়েছিলো, ঐ পরিমাণ অংশ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্যও নির্ধারণ করেছিলেন। এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে, পরীখা খনন করা হচ্ছিলো। কষ্ট-ক্লেশের সময় চলছিলো। পানাহারের ব্যবস্থা ছিলো না। ক্ষুধায় আমি অস্থির ছিলাম। ক্ষুধার তীব্রতায় আমি আমার পেটে একটি পাথর বেঁধে ছিলাম।

পেটে পাথর বাঁধা

পেটে পাথর বাঁধার কথা আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু কখনো দেখিনি। আল্লাহ যেন না দেখান। কিন্তু যার উপর এ অবস্থা অতিবাহিত হয়েছে, সে এর মর্ম বুঝে। মানুষ মনে করে যে, পেটে পাথর বাঁধলে কি লাভ? পাথর বাঁধলে ক্ষুধা নিবারিত হয় কীভাবে! আসল বিষয় এই যে, প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগলে

---

১. সীরাত গ্রন্থসমূহে সাত দিনার সম্পর্কে দুটি ঘটনা পাওয়া যায়। একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন হযরত উম্মে সালামা রাযি.। তিনি বলেন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরীফ আনলেন। তাঁর নিকট সাতটি দিনার ছিলো। তিনি সেগুলো বিছানার নীচে রাখলেন। তারপর বাহিরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তাঁর পবিত্র চেহারার রং ছিলো পরিবর্তিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি ব্যাপার! আপনি ভালো আছেন তো? তিনি বললেন, ঐ দিনারগুলো আমাকে অস্থির করে রেখেছে, যেগুলো সকালে আমার কাছে এসেছে। বিকাল হয়ে গেলো এখনো সেগুলো আমার কাছে রয়ে গেছে। সেগুলো আমি ব্যয় করিনি। [এসব দিনার আমার কাছে রয়ে যাওয়া আমাকে পেরেশান করেছে]
{তাহযীবুল আসার, তবারী কৃত, হাদীস নং ২৪৭৮, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৬২}

দ্বিতীয় ঘটনাটি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, যার মধ্যে অন্তিম রোগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে থাকা সাতটি দিনার দান করার জন্য তাঁকে হুকুম দিয়েছিলেন।
{আততারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ১৩৭, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৭১৬, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৪}

মানুষ এতো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে যে, সে কোনো কাজ করতে পারে না। পাথর বাঁধার ফলে পেট কিছুটা শক্ত হয়, যার ফলে মানুষ দাঁড়ানোর শক্তি পায়। অন্যথায় দুর্বলতার কারণে দাঁড়াতেও পারে না।

তাজেদারে মদীনার পেটে দুটি পাথর বাঁধা ছিলো

যাই হোক, এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে, প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে আমি আমার পেটে একটি পাথর বেঁধে ছিলাম। এমতাবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করি যে, হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধার তীব্রতায় আমি আমার পেটে পাথর বেঁধেছি। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেটের উপর থেকে জামা সরিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

এটাই শেখার বিষয় যে, যে কথার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যে বিষয়ের তাবলীগ করা হচ্ছে, যে কাজের হুকুম দেওয়া হচ্ছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজে তাঁর উপর বেশি আমল করে দেখাচ্ছেন।

হযরত ফাতেমা রাযি.-এর কষ্ট

হযরত ফাতেমা রাযি. জান্নাতের নারীদের সর্দার। একবার তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নিজের পবিত্র হাত দেখিয়ে নিবেদন করেন, যাঁতা পিষে পিষে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে, পানির মশক বহন করে করে বুকে কালো দাগ পড়ে গেছে, হে আল্লাহর রাসূল! খায়বারের বিজয়ের পর সমস্ত মুসলমানের মধ্যে দাস-দাসী বিতরণ করা হয়েছে, তারা তাদের ঘরের কাজ করে। আমাকেও একজন কাজের দাসী দান করুন।

হযরত ফাতেমা রাযি. কাজের দাসী পেলে মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়তো না। কিন্তু উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

'ফাতেমা! সমস্ত মুসলমানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য কোনো দাস-দাসী আসবে না। এই কষ্টের বিনিময়ে আমি তোমাকে দাস-দাসীর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা বলছি। তারপর বললেন, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।'[১]

---

১. সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৫৮৪৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯০৬, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৩০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৯৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭০২

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাযি.-কে এটা শিক্ষা দিয়েছিলেন, এ কারণে একে 'তাসবীহে ফাতেমী' বলা হয়। অন্যদেরকে তো দাস বন্টন করা হচ্ছে, দাসী বিতরণ করা হচ্ছে, পয়সাও ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, আর নিজের ঘরের এ অবস্থা!

এজন্য বক্তা নিজে যখন অন্যদের চেয়ে অধিক আমল করে তখন তার কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হয়। সে কথা অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়। তা মানুষের আত্মার জগতকে পরিবর্তন করে। তাদের জীবনে বিপ্লব ঘটায় এবং বিপ্লব ঘটিয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সাহাবায়ে কেরামকে কতো উপরে উঠিয়েছে!

শাবানের ৩০ তারিখে নফল রোযা রাখা

শাবানের ৩০ তারিখে রোযা না রাখার নির্দেশ রয়েছে। কেউ কেউ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রোযা রাখে যে, হতে পারে আজ রমাযানের ১ম দিন। সম্ভাবনা আছে রোযার চাঁদ উঠেছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। এরজন্য মানুষ সতর্কতা স্বরূপ শাবানের ৩০ তারিখে রোযা রাখে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতা স্বরূপ শাবানের ৩০ তারিখে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এ রোযা না রাখার হুকুম শুধুমাত্র তার জন্য, যে রমাযান মনে করে সতর্কতা হিসাবে রোযা রাখছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণভাবে নফল রোযা রেখে আসছে, সে যদি শাবানের ৩০ তারিখেও রোযা রাখে এবং রমাযানের সম্ভাবনার কারণে সতর্কতার নিয়ত না থাকে, অন্তরে এ চিন্তা না জাগে, তাহলে তার জন্য রোযা রাখা জায়েয।[১]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. শাবানের ৩০ তারিখে নিজে রোযা রাখতেন এবং পুরো শহরে ঘোষণা করতেন যে, আজ যেন কেউ রোযা না রাখে। কারণ, সাধারণ মানুষের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিলো যে, তারা এ দিনে রোযা রাখলে সম্ভাব্য রমাযানের সতর্কতার চিন্তা তাদের অন্তরে জাগবে। ফলে রোযা রাখা গোনাহের কাজ হবে। এজন্য কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

হযরত থানভী রহ.-এর সতর্কতা

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.- আমরা আপনারা যাঁর নাম নিয়ে থাকি- আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৬২২, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৯৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৬৩৫, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ২১৫৯, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ১৬২০

পদাঙ্কানুসরণ করার তাওফীক দান করুন। মানুষকে ফতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে সবসময় তিনি সহজ করার চিন্তা করতেন। যাতে মানুষের জন্য কঠিন হয়ে না পড়ে। যথাসম্ভব সহজ করতেন। আপনারা হয়তো জানেন যে, বর্তমানে গাছে ফল আসার পূর্বেই পুরো ফসল বিক্রি করে দেওয়া হয়। ফল আসার পূর্বে এভাবে বিক্রি করা জায়েয নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল প্রকাশ না পাওয়া (ব্যবহারোপযোগী না হওয়া) পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। শরীয়তের এই বিধানের কারণে কতক আলেম ফতওয়া দিয়েছেন যে, বাজারে যেসব ফল বিক্রি হয় সেগুলো এই নিষিদ্ধ পন্থায় বেচা-কেনা হওয়ার কারণে তা ক্রয় করে খাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু হযরত থানভী রহ. বলেন যে, এসব ফল খাওয়ার অবকাশ রয়েছে। তবে নিজে সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সারাটা জীবন বাজার থেকে ফল কিনে খাননি। কিন্তু অন্যদেরকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এরা ছিলেন আল্লাহর প্রকৃত বান্দা। অন্যদেরকে যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তারচে' বেশি নিজেরা সে বিষয়ে আমল করেছেন। ফলে তাদের কথায় প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজ সংস্কারের পন্থা

আমাদের সমস্যা এই যে, সংস্কারমূলক কাজে ব্যস্তপ্রায় সমস্ত দল, সংগঠন ও ব্যক্তির মস্তিষ্কে এ কথা থাকে যে, সব মানুষ খারাপ হয়ে গেছে, এদেরকে সংশোধন করতে হবে। নিজের খারাবির দিকে মনোযোগ থাকে না। নিজেকে সংশোধন করার চিন্তা থাকে না। এজন্য এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

'হে ঈমানদারগণ! নিজের খবর নাও। তোমরা সঠিক পথে এলে বিপথগামীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[১]

এজন্য আসর জমানো এবং নিছক আলোচনার উদ্দেশ্যে অন্যদের দোষ চর্চা করায় কোনো লাভ নেই। নিজের ফিকির করুন। যতো বেশি সম্ভব নিজেকে সংশোধন করুন। বাস্তবে সমাজ সংস্কারের পন্থা এটাই। সমাজ কিসের নাম? আমার, আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সমষ্টির নাম সমাজ। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের সংশোধনের চিন্তা করে যে, আমি ঠিক হয়ে যাই

---

১ সূরা মায়েদা, আয়াত-১০৫

তাহলে ক্রমান্বয়ে পুরো সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি ব্যাপার এরকম দাঁড়ায় যে, আমি আপনার সমালোচনা করবো, আর আপনি আমার সমালোচনা করবেন, আমি আপনার দোষ বর্ণনা করবো, আর আপনি আমার দোষ বর্ণনা করবেন, এভাবে তো সমাজের অবস্থা কখনোই শোধরাবে না। বরং নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন। আপনি দেখছেন সারা দুনিয়ার লোক মিথ্যা বলছে, কিন্তু আপনি মিথ্যা বোলবেন না। অন্য লোক ঘুষ নিচ্ছে, আপনি নিবেন না। অন্যে সুদ খাচ্ছে, আপনি খাবেন না। মানুষ ধোঁকা দিচ্ছে, আপনি দিবেন না। অন্যে হারাম খাচ্ছে, আপনি খাবেন না। এর তো কোনো অর্থ নেই যে, লোক সমাবেশে বসে বলছে যে, মানুষ মিথ্যা বলছে; তারপর নিজেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিথ্যা বলে যাচ্ছে। এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নিজেকে সংশোধন করার চিন্তা জাগ্রত করে দিন।

নিজের দায়িত্ব পালন করুন

তবে এখানে এ বিষয়টি বোঝা জরুরী যে, যেখানে নেক কাজের কথা বলা জরুরী, সেখানে নেক কাজের কথা বলা এবং নিজের দায়িত্ব পালন করা নিজের সংশোধনের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া তাকে সঠিক পথের অনুসারী বলা হবে না। এতদভিন্ন নিজের সংশোধনের দায়িত্বও পূর্ণ হবে না। এ কথাই হযরত আবু বরক সিদ্দীক রাযি. একটি হাদীসে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন,

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هٰذِهِ الْآيَةَ:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ[1]

وَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

'হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পাঠ করো يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ (হে ঈমানদারগণ! নিজের খবর নাও। তোমরা সঠিক পথে এলে বিপথগামীরা

১. সূরা মায়েদা, আয়াত-১০৫

তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।) অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন জালেমকে জুলুম করতে দেখেও তাকে বাধা দিবে না, তখন অতি সত্বর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ব্যাপক আযাবে আক্রান্ত করবেন।'[১]

এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কুরআনে কারীমের এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস ইরশাদ করেছেন, যার দ্বারা এ আয়াতের সঠিক অর্থের উপর আলোকপাত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কতক লোক এ আয়াতের অর্থ এই বোঝে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছেন নিজের খবর নাও, নিজেকে সংশোধন করো, তাই এখন কেবল নিজেকে সংশোধন করার চিন্তা করা আমাদের দায়িত্বে ওয়াজিব। অন্য কাউকে ভুল কাজ করতে দেখলে তাকে ধরা, তার সংশোধনের চিন্তা করা, আমাদের দায়িত্বে জরুরী নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, এ আয়াতের এ অর্থ নেওয়া ভুল। কারণ, মানুষ যদি কোনো জালেমকে অন্য কারো উপর জুলুম করতে দেখে, আর বাধা না দেয়, তাহলে এমতাবস্থায় এ ধরনের সকলের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আযাব নাযিল করার আশঙ্কা রয়েছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলছেন যে, এ হাদীস এ কথা বুঝায় যে, তোমাদের সামনে জালেম জুলুম করছে। মাজলুম মার খাচ্ছে। জালেমকে জুলুম থেকে প্রতিরোধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা চিন্তা করো যে, সে জুলুম করলে, সে ভুল কাজ করলে, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তো জুলুম করছি না। এজন্য তার বিষয়ে আমার নাক গলানো উচিত না। তার থেকে আমার পৃথক থাকা উচিত। আর সে তার এই কর্মপদ্ধতির উপর এ আয়াত দিয়ে প্রমাণ পেশ করে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন নিজের সংশোধনের চিন্তা করো। অন্যে ভুল কাজ করলে তা তোমার

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৯৪, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ০১

ক্ষতি করবে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলছেন, এই হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, আয়াতটির এ অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, তোমার মধ্যে জালেমকে জুলুম থেকে বাধা দেওয়ার শক্তি থাকলে অবশ্যই বাধা দিবে।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কি? এ আয়াতে বলা হয়েছে, তুমি যদি নিজের সংশোধনের চিন্তা চেষ্টা করো তাহলে অন্যের ভুল পথে চলা তোমাকে ক্ষতি করবে না। এ কথার আসল উদ্দেশ্যে এই যে, এক ব্যক্তি নিজের শক্তি সামর্থ্য মতো আমর বিল মা'রূফের দায়িত্ব পালন করেছে এর পরেও অপর ব্যক্তি তার কথা মানছে না, তাহলে তার উপর এর কোনো দায় দায়িত্ব বর্তাবে না। তার ভুল কর্ম তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। এবার সে নিজের ফিকির করবে, নিজেকে সংশোধন করবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে পাকড়াও করা হবে না।

সন্তানের সংশোধন কতক্ষণ পর্যন্ত করবে

যেমন সন্তানের ব্যাপারে নির্দেশ হলো, মা-বাবা যদি দেখে যে, সন্তান ভুল পথে চলছে তাহলে তাকে বাধা দেওয়া এবং ভুল পথ থেকে বাঁচানো তাদের দায়িত্ব। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

' হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকেও আগুন থেকে বাঁচাও এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকেও আগুন থেকে বাঁচাও।'[১]

মা-বাবার দায়িত্বে এটা ফরয। কিন্তু এক ব্যক্তি তার যাবতীয় শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও সন্তান মানলো না, তাহলে এমতাবস্থায় ইনশাআল্লাহ ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাযুর বলে গণ্য হবে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে শেষ পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেনি। তিনি তাকে বুঝিয়েছেন, তাবলীগ করেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি তাবলীগের হক কে আদায় করতে পারে! কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এখন এ বিষয়ে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে ধরা হবে না।

---

১. সূরা তাহরীম, আয়াত-৬

এক ব্যক্তির বন্ধু ভুল পথে চলছে, অন্যায় কাজ করছে, সে তার সামর্থ্য মোতাবেক আদর-মহব্বত করে সার্বিকভাবে তাকে বুঝালো। বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গেলো, কিন্তু ঐ বন্ধু অন্যায় কাজ থেকে ফিরে এলো না, তাহলে তার উপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না।

তোমরা নিজেকে নিজে ভুলে যেয়ো না

এরপর আল্লামা নববী রহ. একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমরা কি (অন্য) মানুষকে নেক কাজের হুকুম দাও আর নিজেদেরকে নিজেরা ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাবও তিলাওয়াত করো। তোমাদের কি এতোটুকু জ্ঞানও নেই।'[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, তোমরা অন্যদেরকে সৎকর্মের উপদেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাও অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো। অর্থাৎ, তোমরা তাওরাতের আলেম হওয়ার কারণে মানুষ তোমাদের শরণাপন্ন হয়। এ নির্দেশ যদিও ইহুদীদের জন্য ছিলো, কিন্তু মুসলিমদের জন্য তা আরো বেশী উপযুক্ত। যে ব্যক্তি অন্যকে নসীহত করছে তার উচিত আগে নিজের উপরে তা বাস্তবায়ন করা।

এ মাসআলা তো আমি আপনাদেরকে পূর্বে বলেছি যে, তাবলীগের বিষয়ে এ বিধান নেই যে, যে ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত সে তাবলীগ করবে না, অন্যদেরকে উপদেশ দিবে না, বরং বিধান এই যে, উপদেশ দিবে কিন্তু উপদেশ দানের পর চিন্তা করবে যে, অন্যদেরকে যখন উপদেশ দিচ্ছি তখন নিজেও এর উপর আমল করি। নিজেকে ভুলে না যাই। এরূপ মনে করবে না যে, এ উপদেশ অন্যের জন্যে। বরং চিন্তা করবে যে, এ উপদেশ আমার জন্যেও। আমাকেও এর উপর আমল করতে হবে।

বক্তা ও ওয়ায়েযদের জন্যে বিপজ্জনক কথা

এ আয়াতের পর আল্লামা নববী রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে অত্যন্ত মারাত্মক কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর লক্ষ্যে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। ইরশাদ করেন,

---

[১] ...রাহ, আয়াত-৪৪

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ بِهِ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَاءِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

'হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, আগুনে পড়া মাত্র তীব্র তাপে তার নাড়ী-ভুড়ী পেট থেকে বাইরে বের হয়ে আসবে। সে ব্যক্তি তার নাড়ী-ভুড়ীর চর্তুদিকে এভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চর্কার চর্তুদিকে ঘুরে। (সে যুগে বড়ো মাপের চর্কায় গাধা বেঁধে দেওয়া হতো। গাধা ঐ চর্কা ঘুরাতো) জাহান্নামীরা এই দৃশ্য দেখে তার নিকট এসে একত্রিত হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কি ব্যাপার? তোমাকে এমন শাস্তি কেন দেওয়া হচ্ছে? তুমি কি সেই ব্যক্তি নও যে মানুষকে নসীহত করতে? মন্দ কাজ থেকে বাধা দিতে? (তুমি আলেম ফাযেল ছিলে, সত্যের দাওয়াত দিতে, মানুষের সংশোধন করতে) আজ তোমার এ পরিণতি কীভাবে হলো? তখন ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি মানুষকে তো নেক কাজের নসীহত করতাম, কিন্তু নিজে নেক কাজ করতাম না। মানুষকে মন্দ কাজে বাধা দিতাম, কিন্তু নিজে সেই মন্দ কাজে লিপ্ত হতাম। যার ফলে আজ আমার এ পরিণতি হয়েছে।'[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। এ হাদীস যখন পড়ি তখন ভয় লাগে। যেসব লোককে নেক কাজের কথা বলার ও দ্বীনের কথা শোনানোর কাজ করতে হয় তাদের জন্য এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও স্পর্শকাতর অবস্থান। তারা যেন এর লক্ষ্যে পরিণত না হয়! আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় এর লক্ষ্যে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

---

১. সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৩০২৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩০৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২০৭৮৫

বাতি থেকে বাতি জ্বলে

যাই হোক, মানুষের যদি নিজের বিষয়ে চিন্তা না থাকে আর অন্যের সংস্কার-সংশোধনের চিন্তা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং অন্যের দোষ তালাশ করে, তাহলে এভাবে সমাজ সংশোধিত না হয়ে বরং অধিক ফেৎনা-ফাসাদের পথ খুলে অধিক বিকৃতি ঘটবে। যেমনটি আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের অন্তরে এই চিন্তা জাগ্রত করে দেন যে, আমরা প্রত্যেকে নিজের দোষগুলোর উপর জরিপ চালাবো যে, আমি কি কি ভুল কাজ করছি? তারপর তা সংশোধনের চিন্তা করবো। দশ বছর জীবন অবশিষ্ট থাক বা পনের-বিশ বছর, পরিশেষে প্রত্যেককে নিজের কবরে যেতে হবে। আল্লাহর সামনে নিজের সমস্ত আমলের জওয়াব দিতে হবে। একথা সামনে রেখে নিজের জীবনের উপর সমীক্ষা চালাবে, নিজের অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করবে, যেখানে যেখানে খারাপ কিছু দৃষ্টিগোচর হবে তা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এরপর কোনো সংগঠন বা দল যদি নাও বানায় কিন্তু কমপক্ষে নিজেকে নিজে সংশোধন করে। নিজে সঠিক পথে চলতে আরম্ভ করে। তাহলে কুরআনে কারীমের এ হুকুমের উপর আমল হবে। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন এভাবে চলতে থাকবে। বাতি থেকে বাতি জ্বলে এবং প্রদীপ থেকে প্রদীপ আলোকিত হয়। এভাব দ্বীনের এ পন্থা অন্যদের পর্যন্তও পৌছে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে এ চিন্তা জাগ্রত করে দিন। নিজেদেরকে সংশোধন করার হিম্মত ও তাওফীক দান করুন। তাঁর পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আত্মশুদ্ধির চিন্তাও করুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎ পথে রয়েছো, তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করতে।'[১]

এটি কুরআনে কারীমের ছোট্ট একটি আয়াত। কুরআনে কারীমের এটি বিরল-বিস্ময়কর একটি মোজেযা যে, এর কোনো আয়াত কলেবরে ছোট হলেও মানুষ যদি সঠিকভাবে তা বুঝে এবং সে অনুপাতে আমল করে, তাহলে তার জীবন শুধরানোর জন্যে একটিমাত্র আয়াতই যথেষ্ট হয়ে যায়। এ আয়াতটিও সে ধরনের। এ আয়াতে বিরল-বিস্ময়কর এক হাকীকতের বর্ণনা

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৮-৭০, ২৬ শে মে ১৯৯৪, আসরের নামাযের পর, আকসা জামে মসজিদ, জয় এরিয়া, কৌরাঙ্গী, করাচী

১. সূরা মায়েদা, আয়াত-১০৫

দেওয়া হয়েছে। পুরো মুসলিম উম্মাহকে এতে বিস্ময়কর এক হেদায়েত দান করা হয়েছে। এ হেদায়েত যদি আমাদের অন্তরে গেঁথে যায় এবং এর উপর আমল করার জন্য যদি আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এর মাধ্যমে আমাদের সমস্ত বিপদ আপদের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মুসলিমদের দুর্দশার কারণ

এ আয়াতের অর্থ এবং তার ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যা অনেক সময়ই আমাদের অনেকের অন্তরে জাগ্রত হয়। আপনারা দেখছেন, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যেখানেই বসবাস করছে সেখানেই তারা সমস্যায় জর্জরিত। বিপদ ও অস্থিরতায় আক্রান্ত।

বসনিয়ার মুসলিমদের উপর জুলুম অত্যাচার চলছে। কাশ্মীরের মুসলিমরা নির্যাতন নিপীড়ণের শিকার। ভারতের মুসলিমরা কাফের ও হিন্দুদের অত্যাচারে জর্জরিত। সুমালিয়ার মুসলিমগণ গৃহযুদ্ধে আক্রান্ত। আফগানিস্তানের মুসলিমগণ পরস্পরে যুদ্ধ করে চলছে। পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ যে সমস্ত সমস্যায় আক্রান্ত, তার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে যাদের অন্তরে ঈমানের সামান্য স্পন্দনও অবশিষ্ট রয়েছে তারাই বলে যে, এসব বিপদাপদ ও সমস্যার মৌলিক কারণ হলো, আমরা আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহর বন্দেগী ছেড়ে দিয়েছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছি। তার সুন্নাতের অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছি। অপকর্মে লিপ্ত হয়েছি। এর ফলে আমাদের উপর এতো সব বিপদের ঘনঘটা। আর একথা পুরোপুরি সঠিক। কারণ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ, যাকিছু মুসীবত তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে তা সব তোমাদের স্বহস্তে অর্জিত কৃতকর্মের ফল। তোমাদের অনেক গোনাহের কাজ এমন আছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন। যেগুলোর শাস্তি তোমাদেরকে দেন না।[১]

---

১. সূরা শূরা, আয়াত-৩০

কতক বদ আমল এমন আছে যেগুলোর শাস্তি ইহজগতে বিপদাপদের আকারে দেওয়া হয়। যখন আমরা পরস্পরে বসে মুসলিম উম্মাহর এসব বিপদাপদের কথা আলোচনা করি, এগুলোর কারণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করি, তখন খুব কমই আমাদের কোনো মজলিস এ আলোচনা থেকে খালি থাকে যে, আমরা সবাই বদ আমলে লিপ্ত, মন্দ আচরণে লিপ্ত, গোনাহের কাজে লিপ্ত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ছেড়ে দিয়েছি, এ সমস্ত বিপদ এসব বদ আমলের ফল।

এ কেমন গন্তব্য! কেমন পথ!

কিন্তু এসব আলোচনা সত্ত্বেও যেখানের পানি সেখানেই গড়াচ্ছে। অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। সংস্কার ও সংশোধনের জন্যে অনেক দল, অনেক সংগঠন এবং অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি যথাপূর্ব। বদদ্বীনীর যেই প্লাবন বয়ে চলছে তার গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, হ্রাস পাচ্ছে না। যাত্রার পূর্বে যেই দূরত্ব ছিলো, এখনও সেই দূরত্ব বহাল রয়েছে। শত সহস্র ত্যাগ কতাওবানী চলছে, মানুষ জান দিচ্ছে, বিভিন্ন সংগঠন দল ও প্রতিষ্ঠান সংস্কারকর্মে নিয়োজিত। পরিশ্রম চলছে। কিন্তু বাস্তব জগতে তার উল্লেখযোগ্য কোনো ফায়দা চোখে পড়ছে না। কিন্তু এমনটি কেন হচ্ছে?

সংশোধনের সূচনা অন্যদের থেকে কেন?

আমি এখন আপনাদের সামনে যেই আয়াত তিলাওয়াত করেছি, তাতে এই প্রশ্নের তৃপ্তিজনক উত্তর দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীম এ আয়াতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, তোমরা যখন সংস্কার চিন্তা নিয়ে দাঁড়াও তখন সবসময় অন্যের দ্বারা সংস্কার কর্মের সূচনা করতে চাও। তোমাদের অন্তরে এ কথা থাকে যে, মানুষ খারাপ হয়ে গেছে, মানুষ বদ আমলে লিপ্ত, ধোঁকা ও প্রতারণা করছে, মন্দ আচরণে লিপ্ত, ঘুষ নিচ্ছে, সুদ খাচ্ছে, নগ্নতা ও অশ্লীলতার সয়লাব চলছে, এসব বিষয়ে আলোচনার সময় তোমাদের মাথায় থাকে যে, এসব কাজ অন্যেরা করছে, তাদেরকে এসব কাজ থেকে বাধা দেওয়া উচিত। তাদেরকে সংশোধন করা উচিত।

আত্মশুদ্ধির চিন্তা নেই

কিন্তু এ চিন্তা কোনো আল্লাহর বান্দার অন্তরে খুব কমই আসে যে, আমিও খারাপ কাজে লিপ্ত। আমার মধ্যেও দোষ ও অন্যায় আছে। আমার

সর্ব প্রথম দায়িত্ব এগুলো সংশোধন করা। আমি অন্যদের দিকে পরে দৃষ্টি দেবো, আগে নিজের উপর সমীক্ষা চালাবো, নিজেকে সংশোধনের চিন্তা চেষ্টা করবো। বর্তমানে আমাদের অবস্থা এই যে, কোনো দল, কোনো সংগঠন বা কোনো প্রতিষ্ঠান যখন সংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে দাঁড়ায়, তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং ঐ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রত্যেকের মাথায় এই চিন্তা থাকে যে, আমি জনসাধারণকে সংশোধন করবো। কিন্তু আমি নিজেকে সংশোধন করবো, নিজের দোষ ত্রুটির সংস্কার করবো তা খুব কম আল্লাহর বান্দার অন্তরেই এসে থাকে।

কথায় ওজন নেই

আমি যখন আমার দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে উদাসীন, নিজের খারাপ আমলের সংশোধনের চিন্তা আমার নেই, আমার নিজের আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক নয়, এমতাবস্থায় আমি যখন অন্যের সংশোধনের চিন্তায় মগ্ন হই, তার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, আমার কথার মধ্যে কোনো প্রভাব ও ওজন সৃষ্টি হয় না। কোনো বরকত ও নূর থাকে না। ফলে অন্যের অন্তরে আমার কথা স্থান পায় না। অন্যেরা তা মানার জন্য প্রস্তুত হয় না। বরং তা হয় একটি রসালো বক্তব্য। যা কানের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে বাতাসে বিলীন হয়ে যায়।

প্রত্যেককে নিজের আমলের জওয়াব দিতে হবে

কুরআনে কারীমের ইরশাদ হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ইসলাহের ফিকির করো। তোমরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন করো এবং হিদায়াতের পথে চলে আসো তাহলে যারা গোমরাহীর দিকে যাচ্ছে, বিপথগামী হচ্ছে, তাদের বিপথগামিতা, তাদের অন্যায় অপকর্ম তোমাদের ক্ষতি করবে না। তোমাদের সকলকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বলবেন, যা কিছু তোমরা দুনিয়াতে করতে। এ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর নিকট নিজের আমলের উত্তর দিতে হবে। এমন হবে না যে, মন্দ কর্ম করেছে অন্যে, আর জওয়াবদিহি চাওয়া হচ্ছে আমার কাছে যে, সে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলো কেন? বা আমি কোনো খারাপ কাজ করবো আর অপরের নিকট এর জওয়াব চাওয়া হবে, এমন হবে না। বরং প্রত্যেকের নিকট নিজের

আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এজন্য তোমরা প্রথমে নিজের ফিকির করো যে, তোমাদের আমল কেমন? তোমরা যখন আল্লাহর সম্মুখে হাজির হবে, তখন নিজের আমল সম্পর্কে কি উত্তর দিবে? এজন্য অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার পূর্বে নিজের খবর নাও। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আমল আখলাকের উপর জরিপ চালিয়ে দেখবে যে, সে কি কি ভুল পদ্ধতি ও ভুল কর্মে লিপ্ত। তারপর সে ভুলগুলো দূর করার চেষ্টা করবে। এমন যেন না হয় যে, অন্যের দোষ ও মন্দ কর্ম খুঁজে ফিরছে আর নিজের দোষের ব্যাপারে গাফেল।

এক হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যে ব্যক্তি বলে যে, সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ তাদের আমল খারাপ, আকীদা খারাপ, ইবাদত খারাপ, তাই তারা সকলে ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে সবচে' বেশি ধ্বংসগ্রস্ত ব্যক্তি সে নিজে। যে অন্যদের দোষ বর্ণনা করে ঠিকই, কিন্তু নিজের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল। যদি নিজের আমল ও নিজের সংশোধনের চিন্তা জাগে, অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যে, আমি আল্লাহর সামনে কি জওয়াব দিবো? তাহলে নিশ্চিতভাবে তখন সে নিজেকে নিজে সবচে' খারাপ মনে করবে। তখন অন্যদেরকে খারাপ চোখে দেখবে না।[১]

হযরত যুননুন মিসরী রহ.-এর আলোচনা

হযরত যুননুন মিসরী রহ. বড়ো মাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি এতো উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন যে, আমরা তার কল্পনাও করতে পারবো না। তাঁর সম্পর্কে ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ পেরেশান। বৃষ্টির জন্য দু'আ করছে। কিছু লোক হযরত যুননুন মিসরী রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলো, হযরত! আপনি দেখছেন, পুরো জাতি দুর্ভিক্ষের শিকার। জিহবা ও গলা শুকিয়ে গেছে। পশুপালকে পান করানোর পানি নেই। জমিতে সেচ দেওয়ার পানি নেই। আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। আল্লাহ তা'আলা যেন বৃষ্টি দান করেন। হযরত যুননুন মিসরী রহ. বললেন, দু'আ তো আমি

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৫৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৩১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮১৫৮, মুওয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস নং ১৫৫৯

করবো ইনশাআল্লাহ, তবে একটি কথা শোনো, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, দুনিয়াতে তোমাদের যে কোনো বিপদ বা পেরেশানী হোক তা তোমাদের অপকর্ম ও গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। তাই বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার অর্থ এই যে, আমরা বদ আমলে লিপ্ত। আমাদের বদ আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বদ আমলে লিপ্ত কে? আমি যখন আমার উপর জরিপ চালাই, তখন দেখতে পাই, এ পুরো জনপদে আমার চেয়ে খারাপ কোনো মানুষ নেই। আমার চেয়ে বেশি গোনাহগার আর কেউ নেই। আমার প্রবল ধারণা যে, এ জনপদে আমি অবস্থান করার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। এ জনপদ থেকে আমি বের হয়ে গেলে এখানে আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হবে, ইনশাআল্লাহ। এজন্য বৃষ্টি হওয়ার ব্যবস্থা এই যে, আমি এ জনপদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিরাপদে রাখুন, তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

নিজের গোনাহের প্রতি দৃষ্টি ছিলো

লক্ষ করুন! হযরত যুননুন মিসরীর মতো আল্লাহর কামেল ওলী এবং আল্লাহর নেক বান্দা মনে করছেন যে, এ পৃথিবীর বুকে আমার চেয়ে বড়ো কোনো গোনাহগার নেই। তাই এ জনপদ থেকে আমি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা এখানে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এবার বলুন! তিনি কি ভুল বলছিলেন? তিনি কি বিনয়ের কারণে এমন বলছিলেন? হযরত যুননুন মিসরী রহ.-এর মতো কামেল ওলীর মুখ থেকে মিথ্যা বের হতে পারে না। বরং বাস্তবেই তিনি নিজেকে নিজে সর্বাধিক গোনাহগার ও খারাপ মনে করতেন। এরূপ কেন মনে করতেন? এ কারণে যে, তাঁর নিজের মধ্যে কি কি খারাপ দিক রয়েছে এবং সেগুলোকে কীভাবে সংশোধন করা যায়, তাঁর দৃষ্টি সবসময় সেদিকে নিবদ্ধ ছিলো?

আমার চোখে কেউ খারাপ থাকলো না

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা এ যুগে আমল ও তাকওয়ার নমুনা বানিয়েছিলেন। তাঁর এক খলীফা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি তাঁকে বললাম, আপনি যখন বয়ান করেন আর

আমি আপনার মজলিসে উপস্থিত থাকি তখন আমার মনে হয় যে, এ বৈঠকে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ নেই। আমি সবচেয়ে বেশি গোনাহগার। অন্যদের তুলনায় নিজেকে পশু মনে হয়। এ কথা শুনে হযরত মাওলানা থানভী রহ. বললেন, ভাই! তুমি নিজের যেই অবস্থা বর্ণনা করলে সত্য কথা হলো, আমার অবস্থাও একই রকম। আমি যখন ওয়ায করি, বয়ান করি, তখন মনে হয় যে, সবাই আমার চেয়ে ভালো, আমি সবার চেয়ে খারাপ।

এমনটি কেন হয়েছিলো? কারণ সবসময় তাদের এই চিন্তা ছিলো যে, আমার মধ্যে যেই দোষ রয়েছে, যেই গোনাহ রয়েছে, আমি তা কীভাবে দূর করবো? আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কীভাবে লাভ করবো? মানুষ যখন নিজের দোষের উপর জরিপ চালাতে আরম্ভ করে, তখন অন্যের দোষ আর চোখে পড়ে না। তখন মানুষ নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়। বাহাদুর শাহ যফর মরহুম বলেছিলেন,

تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب وہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদেরকে দেখেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মনে হতো যে, অমুকের মধ্যে এ দোষ রয়েছে, অমুকের মধ্যে ঐ দোষ রয়েছে। কিন্তু যখন নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তখন বুঝতে পারলাম আমার মতো খারাপ আর কেউ নেই। যখন নিজের আমলের উপর জরিপ চালানোর তাওফীক হলো, তখন নিজের সমস্ত খারাপ দিক এবং সমস্ত অন্যায় অপরাধ ধরা পড়লো।

মনে রাখবেন! কোনো মানুষ অন্যের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে এ পরিমাণ অবগত হতে পারে না, যে পরিমাণ নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। মানুষ নিজের সম্পর্কে জানে যে, সে কী চিন্তা করে, তার অন্তরে কী সব কথা উদয় হয়? কী ধরনের ইচ্ছা তার অন্তরে জাগে? কিন্তু যেহেতু নিজের দিকে দৃষ্টি নেই। নিজের দোষের ব্যাপারে অচেতন। নিজের সংশোধনের বিষয়ে উদাসীন। সেজন্য অন্যের দোষ চোখে পড়ে।

নিজের রোগের চিন্তা কেমন হয়ে থাকে!

উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তির পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথার তীব্রতায় শান্তি নেই। স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে পারে না। বলুন! সে ব্যক্তি কি অন্যদের দিকে

দেখতে থাকবে যে, কার সর্দি হয়েছে, কার কাশি হয়েছে, কার নাকে পানি আসছে? সে তো নিজের ব্যথা নিয়েই বিভোর থাকবে। অন্যের রোগ ব্যাধির প্রতি ভ্রূক্ষেপই করবে না। বরং কেউ যদি তাকে বলে যে, আমার সর্দি-কাশি হয়েছে তাহলে উত্তরে সে বলবে, তোমার সর্দি-কাশি হয়েছে ঠিক, কিন্তু আমি তো পেট ব্যথায় আক্রান্ত। আমি নিজের ব্যথার চিকিৎসা আগে করবো, নাকি তোমার সর্দি-কাশির দিকে আগে তাকাবো। সারা দুনিয়ায় এমন মানুষ নেই, যে তার ব্যথায় অস্থির অবস্থায় অন্যদের মামুলি রোগ-ব্যাধির দিকে তাকাবে।

এক মহিলার শিক্ষনীয় ঘটনা

আমার এক আত্মীয়া মহিলার একবার পেটে গ্যাস জমে কষ্ট হচ্ছিলো। ব্যথ্যায় সে অস্থির ছিলো। সে অনেক বেশি অসুস্থ বোধ করছিলো। তাকে ডাক্তার দেখানোর জন্যে আমি একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। লিফট যোগে উপরে আরোহণের সময় সেখানে হুইল চেয়ারে একজন মহিলা বসা দেখতে পাই। তার সারা শরীর আগুনে ঝলসে গেছে। কয়েক জায়গার হাড্ডিও ভেঙ্গে গেছে। চামড়া পুড়ে গেছে। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার এ আত্মীয়া মহিলাকে বলি, সে তোমার চেয়ে বেশি কষ্টে আছে। তাহলে তার রোগের কষ্ট লাঘব হবে। আমি তাকে বললাম, দেখো! এ মহিলা কেমন বিপদে আছে। কেমন মারাত্মক কষ্টে আছে। আমার ঐ আত্মীয়া মহিলা তার প্রতি একবার দৃষ্টি দিয়ে বললো, হ্যাঁ সে কষ্টে আছে ঠিক, কিন্তু তার পেট ব্যথা তো নেই। দেখুন! যার পুরো শরীর জ্বলে গেছে, হাড্ডি ভেঙ্গে গেছে, তার রোগের ব্যাপারে এমন অনুভূতি নেই, নিজের রোগের ব্যাপারে যেমন অনুভূতি রয়েছে।

এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিলেন যে, হায়! দ্বীনের বিষয়ে আমাদের অন্তরে যদি এমন চিন্তা জাগতো। আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের রোগ এবং আত্মার ব্যাধি সম্পর্কে যদি চিন্তা জাগ্রত করে দিতেন যে, আমার আত্মার ব্যাধি সম্পর্কে আমার চিন্তা করা উচিত। তাহলে অন্যের ব্যাধির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজের ব্যাধি সংশোধনের চিন্তা করতাম।

হযরত হানযালা রাযি.-এর নিজের ব্যাপারে মুনাফেকির সন্দেহ

একবার হযরত হানযালা রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলেন এবং নিবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো

ধ্বংস হয়ে গেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে মুনাফিক হয়ে গেছো? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মজলিসে আমি যখন বসি তখন অন্তরে ভালো আবেগ-উদ্দীপনা ও ভালো চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়। অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জীবন্ত থাকে। নিজের সংশোধনের চিন্তা জাগে। আখেরাতের নেয়ামতের কথা স্মরণ হয়। কিন্তু যখন জীবনের ব্যস্ততায় মগ্ন হই, পরিবার-পরিজনের কাছে যাই, তখন সে অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। এটা তো মুনাফেকি যে, বাহ্যিকভাবে তো মুসলিম, আর অন্তরে খারাপ চিন্তা জাগ্রত হচ্ছে। এজন্য ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো মুনাফিক হয়ে গেছি। আপনি বলুন, এ থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পেতে পারি?

দেখুন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী এ কথা বলছেন। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে পুরো উম্মত একমত যে,

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ

'সমস্ত সাহাবী ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।'

তাদের মধ্যে কেউই ফাসেক হতে পারে না। তাদের এ সন্দেহ জাগছে যে, আমি তো মুনাফিক হয়ে যাইনি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বাড়িতে যাওয়ার পর চিন্তার জগতে যেই পরিবর্তন মনে হয়, নিজের অবস্থার যেই পরিবর্তন অনুভব হয়, সেজন্য পেরেশান হয়ো না। এর কারণে মানুষ মুনাফিক হয় না। সময় বিশেষে এমন হয়ে থাকে। কখনো মানুষের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ অধিক হয়, ফলে আত্মা বিগলিত হয়। তাই অবস্থার এই পরিবর্তনের কারণে মানুষ মুনাফিক হয় না।[১]

সাহাবায়ে কেরামের এ নিয়ে চিন্তা ছিলো না যে, অমুক মুনাফিক হয়ে গেছে, বরং এ বিষয়ে চিন্তা ছিলো যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি।

হযরত ওমর রাযি.-এর নিজের ব্যাপারে মুনাফিকির সন্দেহ

হযরত ওমর ফারুক রাযি. মুসলিমদের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৩৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৩৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২২৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৯৪৯

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ

আমার পরে যদি কোনো নবী আসতো তাহলে ওমর নবী হতো। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই।[১]

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এতো উঁচু মাকাম দান করেছেন। তাঁর অবস্থা শুনুন। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. ছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'রহস্যজাত্তা' হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদীনায় বসবাসকারী মুনাফিকদের নাম বলেছিলেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। হিকমতের কারণে তিনি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. ছাড়া অন্য কাউকে তাদের নাম বলেননি। কারো মৃত্যু হলে মানুষ লক্ষ করতো যে, হযরত হুযাইফা রাযি. তার জানাযার নামাযে অংশ নিয়েছেন কি না। কারণ, হযরত হুযাইফা রাযি.-এর অংশ গ্রহণ এ কথার আলামত ছিলো যে, তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় নেই। আর যদি অংশগ্রহণ না করতেন তাহলে বুঝা যেতো যে, তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় আছে, বিধায় হযরত হুযাইফা রাযি. জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করেননি।

হযরত ওমর ফারুক রাযি. হযরত হুযাইফা রাযি.-এর নিকট গমন করে আবেদনের সুরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে হুযাইফা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো, তোমার নিকট মুনাফিকদের যেই তালিকা রয়েছে তার মধ্যে ওমরের নাম নেই তো?[২]

এ কথা এমন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছেন, যিনি নিজ কানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছেন যে,

عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ

'ওমর জান্নাতে যাবে।'[৩]

যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে সে ওমর হতো। তাঁকে এ চিন্তা পেয়ে বসেছে যে, আমি তো মুনাফিক নই।

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৭৬৪

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৮০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৪৩

এ চিন্তা এজন্য ছিলো যে, নিঃসন্দেহে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ওমর জান্নাতে যাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তিই 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে যাবে।'[১]

এতদসত্ত্বেও হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর চিন্তা জাগে যে, কালেমা পাঠকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যদি কারো আমল খারাপ হয়ে যায় তাহলে সে এ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এজন্য আমার ভয় হয় যে, হয়তো আমার আমল খারাপ হয়ে গেছে, ফলে আমি মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়ে গেছি।

বাস্তবতা এই যে, মানুষ যখন নিজের দোষ পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজের সংশোধনের ব্যাপারে চিন্তা শুরু করে, তখন সে নিজ দৃষ্টিতে অন্যদেরকে এতো খারাপ দেখতে পায় না, নিজেকে যতো খারাপ দেখতে পায়।

দ্বীনের বিষয়ে অজ্ঞতার চূড়ান্ত

বর্তমানে আমাদের ব্যাপার হয়ে গেছে উল্টা। আমরা যদি দ্বীনের কোনো বিষয় আলোচনা করি তখন সাধারণত তার মধ্যে ইসলাহের কোনো বিষয় থাকে না। বরং বিভিন্ন দলীয় আলোচনায় লিপ্ত হয়ে যাই। কখনো রাজনৈতিক কথা শুরু করে দেই, আবার কখনো এমন থিওরী বা দর্শন নিয়ে আলোচনা শুরু করি, বাস্তব জীবনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এর ফলে আজ আমাদের সমাজে দ্বীনের বিষয়ে অজ্ঞতা এতো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, পূর্বে দ্বীনের যেসব বিষয় শিশুদের জানা থাকতো, আজ বড়ো বড়ো শিক্ষিত মানুষেরও সেগুলো জানা নেই। তাদেরকে যখন বলা হয় যে, এটি দ্বীনের বিষয়। তখন অপরিচিতের ন্যায় বিস্ময়ের সাথে বলে, আচ্ছা এটাও দ্বীনের বিষয়! আমার তো জানাও নেই যে, এটা দ্বীনের একটি অংশ। এর কারণ এই যে, বর্তমানে আমাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কুরআনে কারীম পরিষ্কার ভাষায় বলছে যে, সমাজ সংস্কারের যতো সংগঠন আর যতো প্রতিষ্ঠানই করো না কেন, তোমাদের প্রত্যেকে নিজের মধ্যে

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৬২

আত্মশুদ্ধির চিন্তা জাগ্রত না করা পর্যন্ত সমাজের সংশোধন কখনোই সম্ভব হবে না।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা

এখন যদি আমি পতাকা হাতে নিয়ে ব্যাজ লাগিয়ে সমাজ সংস্কারের শ্লোগান দিয়ে ঘুরতে থাকি আর আমার নিজের অবস্থা এই হয় যে, ঘুষ নেওয়ার সুযোগ হলে আমি কারো থেকে পিছিয়ে থাকি না। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলে ডরাই না। সুদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে তো সবার আগে, কিন্তু সুদী কারবার করার সুযোগ হলে চুপচাপ তা করে ফেলি, বলুন! তাহলে সমাজ সংস্কার কীভাবে হবে? সারা দুনিয়ার লোক সম্পর্কে মন্তব্য করে বলি, মানুষ মিথুক হয়ে গেছে, ধোঁকা ও প্রতারণা বিস্তার লাভ করেছে, ঠকবাজি চলছে, পাপ ও অনাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু যখন মিথ্যা বলার সুযোগ হয় এবং ছুটি বাড়ানোর জন্যে মিথ্যা ও জাল মেডিকেল সার্টিফিকেট বানানোর প্রয়োজন পড়ে, তখন কি চিন্তা করি যে, এটা মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট? এটাও এই মিথ্যা আল্লাহর রোষ টেনে আনবে। এসব মন্দ কাজ যখন আমি ছাড়ি না, তাহলে আমার সমাজ সংস্কারের শ্লোগান দ্বারা, সভা-সমাবেশ করার দ্বারা, মিছিল করার দ্বারা কী লাভ হবে? এমনিভাবে আমি যদি অন্যদেরকে তিরস্কার করি যে, তারা দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছে, দ্বীনের বিধি-বিধানের উপর আমল করছে না, কিন্তু আমার কোনো মজলিস গীবত থেকে খালি থাকে না, কখনো ওর দোষ বলছি, কখনো এর দোষ বলছি, এভাবে কুরআনে কারীমের ভাষ্য মতো প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্তে নিজের মরা ভাইয়ের গোশত খাচ্ছি, তাহলে বলুন! সমাজের সংশোধন কীভাবে হবে?

সংশোধনের পদ্ধতি এই

সমাজের সংশোধন তো তখন হবে যখন চিন্তা করবো যে, আমার মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে, তা কীভাবে ছাড়তে পারি? আমি অন্যদের গীবত করি, এটা কীভাবে ছাড়তে পারি? মানুষকে ধোঁকা দেই, কীভাবে তা ত্যাগ করতে পারি? যদি ঘুষ নেই তাহলে ঘুষ নেওয়া ছেড়ে দেই। যদি সুদ খাই তাহলে সুদ খাওয়া ছেড়ে দেই। যদি বেপর্দা, উলঙ্গপনা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকি তাহলে তা পরিহার করি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্তরে এ চিন্তা জাগ্রত না

হবে, মনে রাখবেন! ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাহের এ ফিকির অন্যদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে না। এজন্য কুরআনে কারীম বলেছে,

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

'নিজেদের জানের চিন্তা করো, অন্যেরা যদি বিপথগামী হয় তাহলে তাদের বিপথগামিতা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা সঠিক পথে থাকো।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তারবিয়াত করেছেন?

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন। নবুওয়্যাত লাভের পর তেইশ বছর ইহজগতে অবস্থান করেছেন। এমন এক সময় তিনি তাশরীফ আনেন, যখন পুরো আরব উপদ্বীপ গোমরাহী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। আশার কোনো কিরণ চোখে পড়ছিলো না। হেদায়াতের কোনো আলো বিদ্যমান ছিলো না। এমতাবস্থায় তিনি একা তাশরীফ আনেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে বিপ্লব ঘটাতে হবে। তেইশ বছর পর যখন তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান, তখন আরব উপদ্বীপ থেকে কুফুর ও শিরক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে জাতি ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো, তেইশ বছর পর সেই জাতি সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক আদর্শ নমুনা রূপে দাঁড়িয়ে যায়। এ বিপ্লব কীভাবে ঘটেছে?

এই তেইশ বছর সময়ের তেরো বছর অতিবাহিত হয়েছে মক্কায়। এ তেরো বছরে না জিহাদের নির্দেশ ছিলো, না কোনো রাজত্ব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিলো, না কোনো আইন কানুন ছিলো। এ সময় হুকুম ছিলো, কেউ তোমাকে মারলেও তার প্রতিশোধ নিবে না। মার খাবে। কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

'(হে নবী) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার ধৈর্যধারণ আল্লাহর তাওফীকেই হবে।'[১]

---

১. সূরা নাহল, আয়াত-১২৭

আঘাত করার অনুমতি নেই। অথচ অন্য ব্যক্তি দশবার মারতে পারলে তিনি তো একবার হলেও মারতে পারতেন। হযরত বেলাল হাবশী রাযি.-কে উত্তপ্ত বালির মধ্যে শোয়ানো হচ্ছে। বুকের উপর ভারী পাথর রাখা হচ্ছে, আর বলা হচ্ছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাকে অস্বীকার করো। হযরত বেলাল রাযি.-তাঁর উপর জুলুমের প্রতি-উত্তরে একটা থাপ্পড় তো মারতে পারতেন। কিন্তু তখন হুকুম ছিলো যে, মার খেতে থাকো। তাওবাই উঠানোর বা হাত উঠানোর অনুমতি নেই।

সাহাবায়ে কেরাম খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়েছিলেন

এসব কেন করা হয়েছিলো? কারণ, পরীক্ষার এ হাঁপড়ে জ্বালিয়ে তাদেরকে নিখাদ স্বর্ণে পরিণত করা উদ্দেশ্য ছিলো। মার খাবে, আর ধৈর্য ধরবে। কোন্ মানুষ এমন আছে, যাকে অন্য মানুষ মারবে আর তার রাগ হবে না? কিন্তু হুকুম দেওয়া হচ্ছে যে, রাগকে দমন করো। যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগকে দমন করবে, তখন নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে আল্লাহর হুকুমের সামনে কতাওবান করার উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। এজন্যে মক্কী জীবনের তেরো বছর এভাবে অতিবাহিত হয় যে, তাতে হুকুম ছিলো, অন্যের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হাত উঠাবে না। বরং ইবাদতের মধ্যে মগ্ন থাকবে। আল্লাহমুখী হবে। আল্লাহকে স্মরণ করবে। আখেরাতের কথা চিন্তা করবে। জান্নাত জাহান্নামের কথা চিন্তা করবে। নিজের আমল আখলাকের ইসলাহ করবে। দীর্ঘ তেরো বছর সময়ে সাহাবায়ে কেরামের জামাত যখন ধৈর্য ও পরীক্ষার কঠিন সময় অতিক্রম করে নিখাদ স্বর্ণে পরিণত হন, তখন মদীনা শরীফের জীবনের সূচনা হয়। তখন তিনি সেখানে এমন রাজত্ব এবং এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন যে, আকাশ-বাতাস এমন ব্যবস্থা না ইতিপূর্বে কখনো দেখেছে, না এরপরে কখনো দেখেছে। কারণ, প্রত্যেকে নিজের ইসলাহের চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজেকে নিজে নিখাদ স্বর্ণে পরিণত করেছিলেন। এজন্য প্রথম কাজ হলো নিজের ইসলাহের ফিকির করা। নিজের ইসলাহের পর মানুষ যখন অন্যের ইসলাহের জন্য অগ্রসর হবে, তখন ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে। সাহাবায়ে কেরাম যে জায়গাতেই পৌঁছেছেন, আল্লাহ তা'আলা বিজয় ও সফলতা তাঁদের ভাগ্য লিপিতে পরিণত করেছেন। কারণ, তাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নিজেদের ইসলাহ করিয়েছিলেন।

আজ ইসলাহের যাবতীয় চেষ্টা সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ মনে হয়। সমাজের উপর তার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব দেখা যায় না। এর কারণ এই যে, আমরা নিজেদের ইসলাহের বিষয়ে গাফেল হয়ে গেছি। আমাদের ভিতরে এ চিন্তা নেই যে, আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জওয়াব দিতে হবে। আমার মধ্যে যে সমস্ত খারাবী আছে, সেগুলো সংশোধন করার চিন্তা আমার মধ্যে নেই।

নিজের উপর জরিপ চালান

আমার আজকের নিবেদনের সারকথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন জরিপ চালিয়ে দেখবে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করছি। ইসলাম হলো পাঁচ ধরনের আমলের সমন্বয়।

১. আকীদা বিশ্বাস সঠিক হতে হবে।
২. ইবাদত তথা নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি সঠিক হতে হবে।
৩. মুআমালাত তথা বেচা-কেনা হালাল পদ্ধতিতে হতে হবে। আমদানী হালাল হতে হবে। হারাম কোনো আমদানী থাকা যাবে না।
৪. মুআশারাত, তথা পরস্পরে একত্রে বসবাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম-আহকামের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে।
৫. আখলাক তথা মানুষের নীতি-চরিত্র বিশুদ্ধ হতে হবে। মন্দ চরিত্র- যেমন বিদ্বেষ, অহংকার, হিংসা, হঠকারিতা প্রভৃতি না থাকতে হবে। উত্তম চরিত্র- যেমন বিনয়, তাওয়াক্কুল, শোকর ও সবর থাকতে হবে।

এ পাঁচ শাখার উপর মানুষ যখন আমল করবে, তখন তার দ্বীন পরিপূর্ণ হবে। তখন সে মানুষ সঠিক অর্থে মুসলিম হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এ পাঁচ শাখাকে সামনে রেখে নিজের উপর জরিপ চালাবে। যেমন আমার আকীদা-বিশ্বাস ঠিক আছে কি না? আমার জিম্মায় জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয, আমি তার মধ্যে কতগুলো আদায় করি, আর কতগুলো ছেড়ে দেই? আমার আমদানী হালাল না হারাম? বাজারে যখন লেনদেন করি, সে লেনদেন সঠিক হয় কি না? আমার নীতি-চরিত্র ঠিক আছে কি না? অন্যের সঙ্গে আমার আচার-ব্যবহার ঠিক আছে কি না? আমি তো মিথ্যা বলি না? আমি তো গীবত করি না? আমি কারো মনে কষ্ট দেই না তো? কাউকে

পেরেশান করি না তো? নিজের মধ্যে এসব বিষয়ে জরিপ চালাবে। যদি কোথাও কোনো খারাবী থাকে, তাহলে তা দূর করার চেষ্টা করবে। যদি একেবারে ছাড়তে না পারে, তাহলে কম করার চেষ্টা করবে।

যেমন দেখবে যে, আমি দিনে কতো বার মিথ্যা বলি। তারপর দেখবে যে, এর মধ্যে থেকে কতো বার মিথ্যা বলাকে অবিলম্বে ছাড়তে পারি, সেগুলো অবিলম্বে ছেড়ে দিবে। মজলিসে বসলে কতবার গীবত করি? তা কি পরিমাণ ছাড়তে পারি? সে পরিমাণ ছেড়ে দিবে। এভাবে জরিপ চালিয়ে গোনাহ ছাড়া শুরু করবে। নিজের ইসলাহের ফিকির জাগ্রত করবে। ইসলাহের ফিকিরের প্রদীপ একবার যদি আপনার হৃদয়ে আলোকিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ প্রদীপ আপনার জীবনকে আলোকিত করবে। এরূপ চিন্তা করবেন না যে, একজন ঠিক হলে এর কী প্রভাব পড়বে?

বাতি থেকে বাতি জ্বলে

মনে রাখবেন! আমার আপনার ও অন্যান্য লোকের সমন্বয়েই সমাজ। সমাজের একজন ব্যক্তি যদি সংশোধিত হয়, সে যদি কিছু গোনাহ ত্যাগ করে, আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য শুরু করে, তাহলে কমপক্ষে একটি বাতি তো জ্বললো। বাতি ছোট হলেও তার আশেপাশে অন্ধকার থাকতে দেয় না। নিজের পরিবেশকে অবশ্যই আলোকিত করে। অসম্ভব নয় যে, একটি বাতিকে জ্বলতে দেখে অন্য ব্যক্তি তার নিজের বাতি জ্বালিয়ে নিবে। দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয় বাতি জ্বলে উঠবে। এভাবে পুরো পরিবেশ আলোকিত হবে। কিন্তু মানুষ যদি চিন্তা করে যে, আমি আমার বাতিকে নিভিয়ে রাখবো এবং সে নিভানো বাতি থেকে অন্যদের বাতি জ্বালিয়ে দেবো, তাদেরকে আলোকিত করবো, এমনটি হতে পারে না। যে বাতি নিজেই নিভে আছে, সে অন্য বাতিকে আলোকিত করতে পারে না। ঠিক একইভাবে আমি যদি নিজের ইসলাহের ফিকির না করে অন্যের ইসলাহ করতে আরম্ভ করি, তাহলে এটা তেমন, যেমন কি না নিজের নিভানো বাতি দ্বারা অন্যের বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করা। এটা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদের অন্তরে নিজেরদেরকে সংশোধন করার চিন্তা জাগ্রত করে দিন।

এ চিন্তা কীভাবে সৃষ্টি হবে?

এখন প্রশ্ন হলো, নিজের ইসলাহের চিন্তা কীভাবে সৃষ্টি হবে? এর পদ্ধতি এই যে, এখন এখানে বসে আমরা যেমন নিজেদের ইসলাহের চিন্তা সম্পর্কে

আলোচনা করলাম এবং শুনলাম, এর ফলে আমাদের অন্তরে ইসলাহের কমবেশি চিন্তা জাগ্রত হয়েছে। এ আলোচনাই যদি বারবার শোনা হয়, বিভিন্ন বৈঠকে শোনা হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ বারবার শোনার ফলে এ ফিকির আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে। দেখুন! কুরআন শরীফে وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ 'নামায কায়েম করো' কথাটা বাষট্টি বার এসেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা একবার যদি হুকুম দিতেন যে, নামায কায়েম করো তাহলে তাই যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বারবার বলেছেন। কেন? এ কারণে যে, মানুষের স্বভাব হলো, যখন কোনো কথা বারবার বলা হয়, তখন অন্তরে তার প্রভাব পড়ে। সে কথা অন্তরে বসে যায়। শুধু একবার শুনলে ফায়দা হয় না। এজন্য এ ফিকির পয়দা করার জন্যে এমন মজলিসগুলোতে যাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, যেখানে ইসলাহের আলোচনা হয়।

দারুল উলূমে অনুষ্ঠিত ইসলাহী মজলিসসমূহ

আপনাদের নিকটে দারুল উলূম করাচী রয়েছে। সেখানে প্রতি সপ্তাহে তিনটি করে মজলিস হয়। দারুল উলূমের সদর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রফী' উসমানী ছাহেবের বয়ান বুধবার দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হয়। সেখানে পুরুষদেরও ব্যবস্থা আছে এবং মহিলাদেরও।

হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ ছাহেব দারুল উলূম করাচীর শাইখুল হাদীস এবং আমাদের ওস্তাদ ও মুরুব্বী। প্রতি রবিবার আসর এবং মাগরিবের মাঝে তাঁর বয়ান হয়।[১]

হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রউফ ছাহেব (মু. যি.) দারুল উলূমের ওস্তাদ এবং হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী' ছাহেব রহ.-এর খলীফা ও মুজায। প্রতি মঙ্গলবার আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তাঁর বয়ান হয়। এভাবে প্রতি সপ্তাহে দারুল উলূমে তিনটি মজলিস হয়। এসব মজলিসের উদ্দেশ্যও হলো নিজেদের মধ্যে ইসলাহের ফিকির সৃষ্টি করা।

দেখুন! সভা-সমাবেশ ও ওয়ায-বক্তৃতা অনেক হয়ে থাকে, কিন্তু এসব মজলিসের উদ্দেশ্য হলো আমাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধনের চিন্তা জাগ্রত করা। সপ্তাহে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এক ঘণ্টা সময় যদি আপনি

---

১. মাওলানা সাহবান মাহমুদ ছাহেব রহ. আল্লাহ কাছে চলে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন এবং তাঁর কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

এর জন্য অবসর করেন এবং এসব মজলিসের মধ্যে থেকে কোনো একটি মজলিসেও অংশগ্রহণ করেন, তাহলে এর ফলে অন্তরে নিজেকে সংশোধন করার চিন্তা জাগ্রত হবে এবং কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় কোথায় ত্রুটি হচ্ছে, তাও জানা যাবে। কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, আমাদের তো এখনো তাই জানা নেই। তারপর ঐ সব ভুল সংশোধনের পদ্ধতিও জানা যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমাদের সকলকে নিজেদেরকে সংশোধন করার চিন্তা দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আত্মার পবিত্রতা ও তার প্রভাবসমূহ*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿۴﴾

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- ২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত তাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী।[১]

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! যে আয়াতগুচ্ছ আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি বিগত কয়েক জুমা ধরে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলে আসছে। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সফল মুমিনদের জন্যে তাদের নৈতিক চরিত্র পরিশুদ্ধ করাকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন। কুরআনে কারীম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠানোর একটি উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করেছে যে, তিনি মানুষের স্বভাব-চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করবেন। এর গুরুত্ব এজন্য বেশি যে, মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভিত্তি তার

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১০০-১১৬, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত: ১-৪

নীতি চরিত্রের উপর। মানুষ যদি কোনো ভালো কাজ করে তবে তা নিজের ভালো চরিত্রের ফলে করে, আর যদি কোনো মন্দ কাজ করে তবে তাও মন্দ চরিত্রের ফলে করে। মানুষের চরিত্র যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে তার সারাজীবন ঠিক হয়ে যায়। আর যদি তার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সারাজীবন নষ্ট হয়ে যায়।

আত্মার গুরুত্ব

বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বলেছেন,

اَلَا إِنَّ فِيْ الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে তা সঠিক হলে পুরো দেহ সঠিক থাকে, আর তা খারাপ হয়ে গেলে পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়, সে মাংসপিণ্ডটি হলো মানুষের আত্মা।'[১]

উদ্দেশ্য হলো, অন্তরে যেসব আবেগ উদ্দীপনা ও কামনা বাসনা সৃষ্টি হয় তা যদি সঠিক না হয় তাহলে মানুষের পুরো জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

ফেৎনা ফাসাদের কারণ নীতি চরিত্রের অশুদ্ধতা

আমাদের বর্তমান অবস্থায় এবং বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব এজন্য অধিক যে, আমাদের চর্তুদিকে যেই বিস্তৃত ফেৎনা ফাসাদ দেখছি, আমরা গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবো যে, বর্তমানে নীতি চরিত্র সংশোধনের গুরুত্ব না থাকার কারণে মূলত এসব ফেৎনা ফাসাদ দেখা দিয়েছে। আমাদের আত্মার যদি সঠিক আবেগ উদ্দীপনা প্রতিপালিত হতো, সৎ কামনা সৃষ্টি হতো, তাহলে আজ আমাদের চতুর্দিকে এতো ফেৎনা ফাসাদ দেখা দিতো না।

---

১. সুনানে বাইহাকী, হাদীস নং ১০১৮০, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ২৯৭, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩৩, আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৮, ইতহাফুল খুবারাতুল মুহারা বি যাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারাহ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৪, মুসতাখরাজে আবি আওয়ানা, হাদীস নং ৪৪৪৩, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৪৩, আযযুহদুল কাবীর লিল বাইহাকী, হাদীস নং ৮৭২, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৮, আল আরবাউন লিল ফাসাবী, হাদীস নং ৩৮, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩

একজন জালেম অন্যের উপর এজন্য জুলুম করে যে, তার অন্তরে এমন আবেগ উদ্দীপনা ও কামনা বাসনা সৃষ্টি হচ্ছে, যা শয়তানী আবেগ উদ্দীপনা ও শয়তানি কামনা বাসনা। যা নোংরামী ও নাপাকী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোনো মানুষ নগ্নতা ও অশ্লীলতার মধ্যে এজন্য মগ্ন যে, তার অন্তরে নোংরা বাসনা ও নোংরা উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে। নোংরা চিন্তা ও নোংরা উদ্দীপনা যদি সৃষ্টি না হতো, তাহলে সে অশ্লীলতা ও নগ্নতাপূর্ণ কাজ করতো না। এ জিনিসই আমাদের সমাজে ফেৎনা ফাসাদ বিস্তার করেছে।

মন্দ চরিত্রের ফল

বিশেষ করে সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক পরিবেশে মন্দ চরিত্র আমাদেরকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে অবস্থা চলছে, তাতে প্রত্যেকে অভিযোগ করছে যে, ঘুষের বাজার গরম। দুর্নীতি ছড়িয়ে আছে। হারাম খাওয়ার জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে। হারাম মালকে মায়ের দুধ মনে করা হচ্ছে। মায়ের দুধ যেমন হালাল, ঘুষকেও তেমন হালাল মনে করছে। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে উপার্জন করা সম্পদকেও হালাল মনে করছে। মিথ্যার মাধ্যমে আয় করা সম্পদকেও হালাল মনে করছে। বরং অনেক সময় যেসব ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে নামায পড়ে, ইবাদত করে, ওয়ায নসীহত শোনে তারা যখন দুনিয়ার কারবার করে, টাকা-পয়সা লেনদেন করে, সেখানে হালাল হারামের তারতম্য করে না। তারা একথা চিন্তা করে না যে, যে পয়সা আমি কামাচ্ছি, তা হালাল না হারাম। আমার মুখে যে লোকমা যাচ্ছে, তা হালাল না হারাম। বরং বর্তমানে পয়সা উপার্জনের জন্য মিথ্যা বলায় কোনো সংকোচ নেই। মিথ্যা সার্টিফিকেট বানাতে কোনো ভয় নেই। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে কোনো লজ্জা নেই। টাকা পয়সা লেনদেনের সময় সব দ্বীনদারি এবং সব পরহেযগারী অথর্ব হয়ে যায়।

টাকা কামানোর প্রতিযোগিতা

বর্তমানে টাকা কামানোর প্রতিযোগিতা চলছে। দুই হাতে যতো টাকা জমাতে পারো জমাও। হালাল পদ্ধতিতে হোক বা হারাম পদ্ধতিতে। টাকা চাই। এর জন্য ঘুষ নিতে হলে ঘুষ নাও। ঘুষ দিতে হলে ঘুষ দাও। ধোঁকা দিতে হলে ধোঁকা দাও। মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করতে হলে মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করো। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হলে মিথ্যা সাক্ষ্য দাও। যা কিছু করতে হয়

করো, কিন্তু টাকা চাই। আজ আমাদের সমাজে যে ফেৎনা ফাসাদ ছড়ি আছে, তা মূলত এ চিন্তা চেতনা ও এ মানসিকতার ফল।

আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার স্বল্পতার ফল

আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিম ভাইদের ভালোবাসা অন্তরে বদ্ধ হলে দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-দৌলতের ভালোবাসা অন্তরে প্রবল হতো ন মানুষ দুনিয়া লাভের জন্যে হালাল হারাম এক করতো না।

ইরাকের উপর আমেরিকার আক্রমণ

বিগত দিনে ইরাকে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কারণে আজ পুরো মুসলি উম্মাহের হৃদয় চূর্ণ হয়ে আছে। বাগদাদের পরাজয়ের বেদনাদায়ক ঘটন কারণে প্রত্যেক মুসলমানের আত্মা নিথর ও নির্জীব হয়ে আছে। সব পেরেশান। আর এ পেরেশানী যথার্থ। কারণ, একটি মুসলিম দেশের উপ অন্যায় অবিচার করে আক্রমণ করা হয়েছে। সারা দুনিয়া তামাশা দেখেছে কোনো মুসলিম দেশ তার সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হতে পারেনি। এ ঘটন কারণে পুরো মুসলিম উম্মাহ অস্থিরতা, অশান্তি, বেদনা, আক্ষেপ ও ক্ আক্রান্ত।

কুরআনে কারীমের হুকুম এবং তার উপর আমল না করার ফল

কিন্তু মনে রাখবেন! আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াকে উপকরণের জগ বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে আমাদের উপর কিছু দায়ি আরোপ করেছেন। এ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিয়ম বানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি যেমন উপকরণ অবলম্বন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তেমন ফ দান করবেন। শত শত বছর ধরে আমরা কুরআনে কারীমের হুকুমকে পিছ ফেলে রেখেছি। কুরআনে কারীমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হুকুম এই যে,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

'হে (মুসলিমগণ) তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যতাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত করো, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদে (বর্তমান) শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে রাখবে।'[১]

---

১. সূরা আল আনফাল, আয়াত-৬০

অর্থাৎ, তোমরা যতো বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম; সঞ্চয় করো। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা এমন শক্তি অর্জন করো যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর দুশমনের উপর এবং নিজেদের দুশমনের উপর ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। এ নির্দেশের দাবি ছিলো এই যে, পুরো মুসলিম উম্মাহ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন নিজেকে নিজে শক্তিশালী করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে, রসদ সংগ্রহের দিক থেকে, অর্থনীতির দিক থেকে নিজেদেরকে শক্তিশালী করবে।

মুসলিম উপকরণসমৃদ্ধ

কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর দৃষ্টি বুলালে চোখে পড়বে যে, মুসলিমগণ নিজেদেরকে শক্তিশালী বানানোর পরিবর্তে নিজেদের যাবতীয় কিছুর লাগাম অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে। বর্তমানে মুসলিমদের সংখ্যা এতো অধিক যে, ইতিহাসে পৃথিবীর বুকে এতো সংখ্যক মুসলিম পূর্বে কখনো ছিলো না। বর্তমানে মুসলিমদের নিকট এতো উপকরণ রয়েছে যে, ইতিহাসে পূর্বে এতো উপকরণ কখনো ছিলো না। বর্তমানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে এতো সম্পদ দান করেছেন যে, ইতিহাসে পূর্বে এতো সম্পদ কখনো তাদের নিকট ছিলো না। পৃথিবীর বৃহত্তম উৎপাদন উপকরণ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের ভূখণ্ডে দান করেছেন। এখানে তেল বের হয়, গ্যাস বের হয়, স্বর্ণ বের হয়। আল্লাহ তা'আলা উৎকৃষ্টতম মানবীয় যোগ্যতা এখানে দান করেছেন। পৃথিবীর মানচিত্র হাতে নিয়ে দেখুন, পুরো পৃথিবীর হৃদয় মুসলিমদের হাতে রয়েছে।

ব্যক্তিস্বার্থ সামনে রাখার ফল

মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম দেশের ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেন একটা শিকল, মুসলিমগণ যাতে গেঁথে আছেন। মাঝে শুধু দুটি দেশ আড়াল হয়ে আছে। একটি ইসরাইল, একটি ভারত। পৃথিবীর বৃহত্তম রাজপথসমূহ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। সুইস খাল তাদের হাতে। বসফারস প্রণালী তাদের হাতে। ইডেন উপসাগর তাদের নিকট। মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি তাদের এ শক্তি ব্যবহার করে তাহলে অমুসলিমদেরকে

শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলতে সক্ষম। কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা এই যে, এ সমস্ত উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেকে ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এই ব্যক্তি স্বার্থের ফল এই হয়েছে যে, যেসব দেশে স্বর্ণের ছড়াছড়ি, যেসব দেশে তেলের স্রোত বয়ে চলছে তারা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত রসদের উপর নিজেদেরকে নির্ভরশীল করে রেখেছে। তাদের নিজেদের দেশে কোনো কিছু তৈরি হয় না এবং এসব দেশে এমন ব্যক্তি তৈয়ার করা হয় না, যারা যুগের চাহিদা অনুপাতে রসদ তৈরি করতে সক্ষম। উপযুক্ত সমরাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম।

আমরা স্বার্থপরতায় লিপ্ত

এসব কিছু এজন্য হচ্ছে যে, এসমস্ত সম্পদ এবং এসমস্ত উপকরণের উপর স্বার্থপরতার শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি চায় যে, আমার টাকা পেতে হবে, হালাল পদ্ধতি হোক বা হারাম পদ্ধতিতে। সাময়িকভাবে আমি খুশি হয়ে যাই। সাময়িকভাবে আমার কাজ হয়ে যাক। সাময়িকভাবে আমি আরাম লাভ করি। সেজন্যে আমার জাতি ও দেশকে ঝুঁকিতে ফেলতে হলে তাই ফেলবো। এর জন্য পুরো জাতিকে বিক্রি করতে হলে বিক্রি করবো। কিন্তু যে কোনোভাবে আমি নিজের আখের গোছাতে চাই। এমন এক পরিবেশে আমরা জীবন যাপন করছি। শাসক গোষ্ঠি থেকে নিয়ে জনসাধারণ পর্যন্ত প্রত্যেকে এ ব্যাধিতে আক্রান্ত।

আমাদের দেশে দুর্নীতি

আজ প্রত্যেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। সকলেই বলছে যে, সরকারী যে কোনো অফিসে যাও টাকা না দেওয়া পর্যন্ত কাজ হয় না। অফিসগুলোতে মানুষ হারাম খাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সকলেই এ অভিযোগ করছে। কিন্তু যখন তার সুযোগ হয় তখন সে নিজেও হা না করে থাকতে পারে না। অন্যদের যে পরিমাণ ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করছে সে তার চেয়ে বেশি ঘুষ নিবে। অন্যদের চেয়ে অধিক দুর্নীতির প্রদর্শনী করবে। জাল সার্টিফিকেট তৈরি করবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। এসব কাজ আমাদের দেশে এবং আমাদের সমাজে হচ্ছে।

পৃথিবীতে সফলতার জন্য পরিশ্রম শর্ত

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবী নিঃসন্দেহে আপনাদের জন্য বানিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে মেহনত মুজাহাদা করে এবং চেষ্টা সাধনা করে হালাল ও বৈধ পন্থায় তা উপার্জন করতে হবে। এর উপকরণসমূহকে নিজের এবং উম্মতের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। এ দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা এজন্য বানাননি যে, প্রত্যেক মানুষ অন্যকে ধোঁকা দিয়ে এবং অন্যকে প্রতারিত করে সম্পদ উপার্জন করবে। অন্যের উপর ডাকাতি করে নিজের আলমারি ভরবে। দেশ ও জাতিকে ভুলে যাবে। আজ মুসলিমগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে সর্বত্র তারা মার খাচ্ছে। শত্রুর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করবো? শত্রুর কাজই তো হলো তারা আমাদেরকে ধ্বংস করবে। অভিযোগ আর আপত্তি তো নিজেদের বিরুদ্ধে। আমরা নিজেদেরকে কেমন বানিয়ে নিয়েছি যে, পৃথিবীর যে কোনো জাতি এসে আমাদের উপর ডাকাতি করতে পারে এবং আনন্দের তালি বাজিয়ে ফিরে যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার একটি মূলনীতি

মনে রাখবেন! এ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন না করবো। কুরআনে কারীমের স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ তা'আলা ঐ জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যে জাতি নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে তৈরি না হয়।'[১]

এটি কুরআনে কারীমের বাণী। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে যা বলা হয়েছে। তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা পরিবর্তন করতে না পারলে তোমাদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে না। তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমরা প্রহৃত হলে ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রহার চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের কর্ম না ছাড়বে।

আমাদের দু'আ কবুল হলো না কেন?

বর্তমানে মানুষ বলে যে, এতো দু'আ করা হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে এতো চাওয়া হলো, কিন্তু আমাদের দু'আ কবুল হলো না। আমাদের

১. সূরা র'দ, আয়াত-১১

বিজয় লাভ হলো না। শত্রু বিজয় লাভ করলো। এর কারণ কি? এমনকি মানুষের ঈমান নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। মানুষের অন্তরে এসব সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন না কেন, আমাদের সাহায্য করলেন না কেন?

কিন্তু আমি যেমন বললাম, আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াকে উপকরণের জগত বানিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত না হবো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া না দিবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসবে না। যেখানেই চার পয়সার লাভ দেখবো, সেখানেই আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাবো, আল্লাহর রাসূলকে ভুলে যাবো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কেন সাহায্য করবেন? কুরআনে কারীমে আছে,

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ

'তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ভুলে গেছেন।'[১]

আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান ভুলে যাওয়া।

আমরা পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর আমলকারী নই

সাধারণত মানুষের মাথায় এ চিন্তা জাগে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেলাম কীভাবে? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন নামায পড়ো, আমরা নামায পড়ছি। আল্লাহর হুকুম ছিলো জুমার নামাযের জন্য আসো, আমরা জুমার নামাযের জন্য আসছি। আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছিলো রমাযান মাসে রোযা রাখো, আমরা রোযা রাখছি, বিধায় আমরা আল্লাহকে ভুলি নাই।

আসল কথা এই যে, মানুষ শুধু নামায পড়া এবং রোযা রাখাকে দ্বীন মনে করেছে। যাকাত দেওয়া, হজ করা ও ওমরাহ করাকে দ্বীন মনে করেছে। অথচ দ্বীনের অসংখ্য শাখা রয়েছে। এর মধ্যে লেনদেনও আছে, সমাজ সামাজিকতাও আছে, নীতি চরিত্রও আছে। এসবগুলো দ্বীনের শাখা। আমরা নামাযও পড়ছি, রোযাও রাখছি, যাকাতের সময় হলে যাকাতও দিচ্ছি,

---

১. সূরা তাওবা, আয়াত-৬৭

ওমরাহ করে খুব ভ্রমণ করছি, কিন্তু আল্লাহর হুকুমের সামনে যখন নিজেদের স্বার্থ ত্যাগের সময় আসে, তখন সেখানে পদস্খলিত হই। তখন কথা ঘুরিয়ে বলতে থাকি যে, বর্তমানে সবাই এমন করছে, পরিস্থিতি এমন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ আমরা আল্লাহর হুকুমকে ভুলে গেছি। বিশেষ করে নিজেদের সমাজ জীবনে, লেনদেনের জীবনে, নীতি চরিত্রের জীবনে, রাজনীতির জীবনে, ইসলাম ও ইসলামের বিধানকে ভুলে গেছি।

আমরা শত্রুর মুখাপেক্ষী হয়ে গেছি

এরই একটি শাখা এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, নিজেদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করো। কিন্তু আমরা শক্তি সঞ্চয় করিনি। আমাদের সকল উপকরণ যেহেতু ঘুষের পিছনে ব্যয় হচ্ছে, দুর্নীতির পিছনে বিলীন হচ্ছে, তাই সবসময় আমাদেরকে শত্রুর সামনে ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাদের কাছে চাই যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে দান করো। তাহলে আমাদের শক্তি কি করে সঞ্চিত হবে? এখন যদি শত্রু আমাদেরকে প্রহার করে, আমাদের উপর শাসন চালায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিসের? কারণ, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে তাদের মুখাপেক্ষী বানিয়েছি। আমাদের অবস্থা এমন বানিয়েছি যে, আমাদের জীবন তাদের উপর নির্ভরশীল। তাই তাদের বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ? অভিযোগ তো নিজেদের বিরুদ্ধে যে, আমরা নিজেদেরকে লাঞ্ছিত করেছি। আজও যদি আমাদের পাকিস্তানের মতো দেশের উপকরণসমূহ সঠিকভাবে আমানতদারী ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবহার হয় এবং আমরা এজন্য প্রস্তুত হই যে, আমাদের আয় মোতাবেক ব্যয় করবো, আমাদের উপকরণের মধ্যে থেকে আমরা কাজ করবো, আমাদের উপকরণসমূহের সঠিক ব্যবহার করবো, তাহলে আমাদেরকে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে অন্যের শরণাপন্ন হতে হবে না। আমরা স্বনির্ভর হতে পারবো। আমরা নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবো। কিন্তু ঘুষ ও দুর্নীতি আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।

এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন

যাই হোক, যা কিছু ঘটলো (আমেরিকা ইরাকের উপর আক্রমণ করে শক্তি বলে সেখানকার সরকারকে উৎখাত করে নিজেদের দখলে নিলো)

এজন্য ব্যথিত হওয়া তো ঠিক আছে, কিন্তু আমাদেরকে এ ঘটনা থেকে শি গ্রহণ করতে হবে। সেই শিক্ষা এই যে, আমাদের প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত নি হবে যে, আজকের পর কোনো হারাম গ্রাস আমাদের পেটে যাবে না, কো হারাম পয়সা আমাদের ঘরে আসবে না, ঘুষের পয়সা আসবে না, ধোঁকা পয়সা আসবে না, মিথ্যার পয়সা আসবে না, সুদের পয়সা আসবে না। য যে পয়সা আসবে তা হালাল ও পরিশ্রমের পয়সা আসবে। আমি আল্লা উপর ভরসা করে আপনাদেরকে নিশ্চয়তার সাথে বলছি যে, জাতি যদি এ জন্য প্রস্তুত হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ কোনো শত্রু তাদের উপর বিজয় লা করতে পারবে না।

ব্যক্তির সংশোধন দ্বারা সমাজের সংশোধন হয়

মানুষ প্রশ্ন করে যে, পুরো সমাজ যখন খারাপ তখন আমি একা নিজে পরিবর্তন করে পুরো সমাজকে কি করে বদলাবো? আমাদের পরিবর্ত সমাজে কি প্রভাব পড়বে?

মনে রাখবেন! এটা শয়তানের ধোঁকা। প্রত্যেকে যদি এ কথা চি করতে থাকে তাহলে কখনোই সংশোধন হওয়া সম্ভব নয়। সংশোধন তে এভাবে হয় যে, এক ব্যক্তি নিজের জীবনকে ঠিক করলে এর ফলে কমপক্ষে একটি অন্যায় এ দুনিয়া থেকে দূর হয়। একটি অন্যায় যখন দূর হয় তখ একটি আশার প্রদীপ জ্বলে উঠে। আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো, যখন একটি বাতি জ্বলে উঠে তখন তা থেকে দ্বিতীয় আরেকটি বাতি জ্বলে উঠে, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়টা জ্বলে উঠে, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে পরিবেশকে আলোকিত করেন।

মোটকথা, একদিকে প্রত্যেককে নিজের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে এব সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি আমার বাস্তব জীবনে আল্লাহ তা'আলা বিধানের অনুসরণ করবো। আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী পুরো সমাজে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, আমি সেই নাফরমানী করবো না। দুর্নীতি করবো না কোনো হারাম পয়সা আমার ঘরে আসবে না। অপরদিকে এদেশে উপকরণসমূহের সঠিক ব্যবহার আরম্ভ হলে এদেশেরও উন্নতি হবে। এ মধ্যেও শক্তি আসবে। যখন শক্তি আসবে তখন কোনো শত্রুর এ দেশে প্রতি অন্যায় উদ্দেশ্যে তাকানোর দুঃসাহস হবে না।

আমেরিকার ভীরুতা

আপনারা লক্ষ করছেন, এতো বড়ো পরাশক্তি (আমেরিকা)- যার শক্তি ও ক্ষমতার ঢোল সারা পৃথিবীতে বাজে- সেও নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য দুর্বল মুসলিমদেরকেই হাতে পেয়েছে। আফগানিস্তান যার নিকট না কোনো যুদ্ধ বিমান ছিলো, না আধুনিক সমরাস্ত্র ছিলো, না সুসংহত কোনো সেনাবাহিনী ছিলো, বা ঐ দেশ (ইরাক) যার উপর বছর বছর ধরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছিলো, যে এক পুরিয়া ঔষধও বাহির থেকে আনাতে পারতো না, আকাশে যার বিমানের ওড়ার অনুমতি ছিলো না, তাদের উপর নিজেদের শক্তির প্রদর্শনী করলো। উপরন্তু আমেরিকা একা নয়, বরং ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্র দেশের সৈন্যবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ করলো। যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) ছিলো, ততদিন কোনো দেশের উপর আক্রমণ করার সাহস তার হয়নি। কিন্তু যখন তার প্রতিপক্ষ শেষ হয়েছে, নিরস্ত্র মুসলিমরা হাতে এসেছে, তখন সেই নিরস্ত্রদের উপর আক্রমণ করার এবং তাদের উপর নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করার সাহস হয়েছে।

কতো দিন পর্যন্ত এমন আক্রমণ হবে?

মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করতে শত্রুর শরীরে কম্পন সৃষ্টি হবে, নিজেদেরকে এমন প্রতিপক্ষ না বানানো পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কাল আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ করেছে, আজ ইরাকের উপর আক্রমণ করেছে, আগামীকাল অন্য কোনো মুসলিম দেশের উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যদি কুরআনে কারীমের এই হুকুমের উপর আমল করে,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

অর্থাৎ, যেই শক্তি প্রস্তুত করতে তোমরা সক্ষম সেই শক্তি প্রস্তুত করো[১], তাহলে ইনশাআল্লাহ শত্রু আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস করবে না। তবে দুর্নীতিগ্রস্থ পরিবেশে এমন শক্তি প্রস্তুত হতে পারে না। এমন শক্তি তখন প্রস্তুত হবে, যখন আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবো এবং দুর্নীতিকে বিলুপ্ত করবো।

---

১. সূরা আনফাল, আয়াত-৬০

এসব ব্যাধি থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করুন

এ সমস্ত অন্যায় অপকর্ম এজন্য সৃষ্টি হচ্ছে যে, আমাদের অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা বদ্ধমূল। অন্তরে জাগতিক ভোগ-বিলাসিতার ভালোবাসা বদ্ধমূল। অন্তরে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তি-স্বার্থের ভালোবাসা বদ্ধমূল। এ ভালোবাসা আমাদেরকে ধ্বংস করেছে। কুরআনে কারীমের বক্তব্য হলো,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

অর্থাৎ, সফল ঈমানদারগণ নিজেদেরকে এসব ব্যাধি থেকে পরিশুদ্ধ করে। আপনারা যদি এসব ব্যাধি থেকে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাহলে সফলতা লাভ করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা করুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ!

গত কয়েক দিন ধরে হযরত থানভী রহ.-এর একটি মালফূয নিয়ে বয়ান চলছিলো। যার বিষয়বস্তু হলো, কোনো লোক দ্বীনের উপর চলার জন্য সংকল্প করলে তাকে এজন্য যেই পরিশ্রম করতে হয়, তাকে সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় 'মুজাহাদা' ও 'রিয়াযত' বলা হয়। এসব মুজাহাদা ও রিয়াযতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং অন্তরে তাঁর মহব্বত বদ্ধমূল করা। এই সম্পর্ক যখন কায়েম ও মজবুত হয়ে যায় তখন দ্বীনের সকল বিধি-বিধান পালন করা সহজ হয়ে যায়। কেননা মহব্বতের ফলে কঠিন থেকে কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। কাজেই আসল জিনিস হচ্ছে, কাঙ্খিত পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত লাভ করা এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে কাঙ্খিত স্তরের সম্পর্ক কায়েম করা। এ বিষয়টি অর্জন করতে পারলে অবশিষ্ট সব কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হতে থাকে।

হযরত থানভী রহ. বলেন, মহব্বত ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। কারো সাথে মহব্বত থাকে, কারো সাথে থাকে না। কারো সাথে মহব্বত বেশি থাকে, কারো সাথে কম থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে সবধরনের আদর্শ সাম্য কায়েম করেছেন। সকলের সাথে সমান অধিকার বজায় রেখেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি দু'আ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ، وَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا لَا أَمْلِكُ

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২-১৫৩, যোহরের নামাযের পর, রমাযানুল মোবারক, জামে মসজিদ, দারুল উলূম, করাচী

'হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতাধীন বিষয়ে আমি বণ্টন করেছি। যতটুকু পয়সা একবিবিকে দিয়েছি, ততটুকু পয়সা অন্য বিবিদেরকেও দিয়েছি। যেমন খানা একস্ত্রীকে দিয়েছি, ওই পরিমাণ খানা অন্য বিবিদেরকেও দিয়েছি। যে কাপড় একজনকে দিয়েছি, ওই ধরনের কাপড় অন্যদেরকেও দিয়েছি। সুতরাং ইচ্ছাধীন ব্যাপারে আমি ইনসাফ ও সমতা বিধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলো আমার ইচ্ছাধীন নয়। হে আল্লাহ! এ ধরনের ইচ্ছাবহির্ভুত বিষয়ে আপনি আমাকে ধর-পাকড় করবেন না।'[১]

মহব্বত ইচ্ছাধীন নয়

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কোন জিনিসটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমতাধীন ছিলো না? হযরত উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেটি হলো মহব্বত। মহব্বত ইচ্ছাধীন নয়। মহব্বতের বেলায় সকল স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান সম্ভব নয়। এটি মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়। মানুষ সেই মানদণ্ড কোথায় পাবে যার দ্বারা সে মাপবে যে, এক স্ত্রীকে যতটা মহব্বত করবে অপর স্ত্রীকেও ঠিক ততটা মহব্বত করবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহব্বত ক্ষমতা ও ইচ্ছাবহির্ভূত বিষয়। আর মহব্বত যখন ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, তখন বান্দা আল্লাহর সাথে কীভাবে মহব্বত পয়দা করবে? এর জবাবে হযরত বলেন, মহব্বত ইচ্ছাধীন বিষয় না হলেও এর উপকরণসমূহ ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাভুক্ত বিষয়। এ সব উপকরণ অবলম্বন করা হলে মহব্বত পয়দা হয়। এই মালফূযে হযরত মহব্বতের উপকরণসমূহ বর্ণনা করছেন। প্রথম উপকরণটির বর্ণনা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। তা হলো অধিকহারে যিকির করা। যতো বেশি যিকির করবে ততো বেশি মহব্বত পয়দা হবে। অধিক যিকিরের কিছু তরীকা আমি বর্ণনা করেছিলাম। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আর প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। অধিকহারে দু'আ করবে। সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইবে। সামান্য সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ে তাতে গুরুত্ব সহকারে আল্লাহর যিকির করবে। এসবের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে করেছি।

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১০৫৯, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৩৮৮২, সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৮২২, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৯৬১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৯৫৯, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২১১০

আল্লাহর নেয়ামতরাজি এবং নিজের আমল সম্পর্কে চিন্তা করা

হযরত থানভী রহ. এবার 'মহব্বত' পয়দা হওয়ার দ্বিতীয় উপকরণ বর্ণনা করছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ এবং নিজের আচরণ তথা কার্যকলাপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা।'

এতে তিনি দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছেন।

এক. আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

দুই. নিজের কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার নিয়ে চিন্তা করা।

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও তাঁর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্যে এ দুটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজির যেই বর্ষণ হচ্ছে, এর ধ্যান করুন, ভাবুন ও মুরাকাবা করুন। মুরাকাবা ও ধ্যান করলে বুঝে আসবে, অন্যথায় তা বুঝেও আসবে না।

নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে মুরাকাবা ও ধ্যান করুন

মানুষ সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজির মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছে। প্রতিটি মানবসত্তার উপর প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত ও রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এসবের দিকে আদৌ ধ্যান-খেয়াল যায় না যে, এগুলোও নেয়ামত এবং এগুলোও আমরা ভোগ করছি। এর দরুণ মানুষ উদাসীন হয়ে আছে। কিন্তু মানুষ গুরুত্ব ও ধ্যানের সাথে ঐসব নেয়ামতের প্রতি মনোনিবেশ করলে সেগুলো তার সামনে ধরা দেয় এবং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তখন তার অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, এগুলোও আল্লাহর নেয়ামত, যা প্রতিমুহূর্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে।

আল্লাহওয়ালাদের সংসর্গ দ্বারা ধ্যান-খেয়াল লাভ হয়

এই ধ্যান, খেয়াল ও অনুভূতি তখনই লাভ হয়, যখন মানুষ কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে বসে। যতো দিন আল্লাহওয়ালাগণের সোহবত লাভ হয়নি, ততো দিন উদাসীনতার মধ্যে সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখন চিন্তাই

জাগেনি যে, আমার উপর আল্লাহ তা'আলার কী কী নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে? বরং কোনো না কোনো মুসীবত নিয়ে কেঁদে-কেটেই সময় অতিবাহিত হয়েছে। সামান্য কষ্ট এসেছে, সামান্য উদ্বিগ্নতা এসেছে, তা নিয়েই দিন-রাত একাকার করে বসেছে। তা নিয়েই কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু যখনই আল্লাহ পাক কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন, মানুষ যখন কোনো আল্লাহওয়ালার আঁচল ধরেছে, তখন এই উপলব্ধি ও বুঝ এসেছে যে, আরে তুমি সামান্য এক মুসীবত নিয়ে মুখ গোমরা করে বসে আছো, তোমার উপর তো সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে।

কুরআনে কারীমে চিন্তা-ফিকিরের আহ্বান

কুরআনে কারীমও আপনাকে এ আহ্বান করছে যে, সামান্য চিন্তা করো, সামান্য ভাবো। কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করার হুকুম করা হয়েছে। কিন্তু আজকাল মানুষ এর ভুল অর্থ বুঝে বসে আছে। বর্তমানে মানুষ বলে, কুরআনে কারীম বারবার চিন্তা-ফিকিরের আহ্বান করেছে। এর মর্ম হলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধন করো। কিন্তু কুরআনে কারীম যেই চিন্তা-ফিকিরের আহ্বান করেছে, তার দ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধন নিন্দনীয় কোনো বিষয় নয়, বরং তা জায়েয ও মুস্তাহাবের পর্যায়ে। ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব। কিন্তু কুরআনুল কারীম যেই চিন্তা-ফিকিরের আহ্বান করেছে, তার উদ্দেশ্য এটা নয়। কুরআনের আহ্বান করা চিন্তা-ফিকিরের মর্ম হলো, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ, তাঁর সৃষ্টি কৌশল, তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত সর্বোপরি তাঁর অবারিত নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা।

হাদীস শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য যখন জাগ্রত হতেন, তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

'আসমান ও জমিনসমূহের সৃষ্টি এবং রাত-দিনের আবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।'

বুদ্ধিমান কারা? এর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

বুদ্ধিমান তারা, যারা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায়। ঐ সব লোকেরা বলে, হে পরওয়ারদেগার! আপনি (এই আকাশ, জমিন, তারকারাজি এবং) এ বিশ্বচরাচর অহেতুক সৃষ্টি করেননি। (বরং আমাদের উপকার এবং আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যকার প্রতিটি বস্তুই একেকটি নিয়ামত। হে আল্লাহ! এই দুনিয়াতে যখন আপনি আমাদেরকে এসব নিয়ামত দান করেছেন,) তাই হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে আপনার রহমতের বদৌলতে জাহান্নামের আযাব থেকেও নাজাত দান করুন।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সময় এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

এ আকাশ আমার জন্য! এ জমিন আমার জন্য!

আমার ওয়ালেদ মাজেদ মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর একটি কবিতা রয়েছে। তাতে তিনি বলেন,

یہ زمیں میرے لئے' یہ آسماں میرے لئے

چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لئے

এ পৃথিবী আমার জন্যে, এ আকাশ আমার জন্যে
আদি কাল থেকে এ কাফেলা চলমান আমার জন্যে

অর্থাৎ, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল আল্লাহ পাক আমার কল্যাণে ও আমার উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আপনি যদি একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, এই সূর্য আপনার খেদমত করছে, এই তারকারাজি আপনার সেবা করছে, এই বাতাস আপনার খেদমত করছে। সমুদ্র, নদী, পাহাড়, বন সবকিছুই আল্লাহ পাক আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯০

'যা কিছু তিনি জমিনে পয়দা করেছেন তা তোমাদের জন্যই পয়দা করেছেন।'[১]

এই সূর্য আমার জন্য

প্রতিদিন সকালে সূর্য উদিত হয়। কিরণ ছড়ায়। আলো ও তাপ দেয়। সন্ধ্যায় অস্ত যায়। এসব কেন হয়? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে মানুষ! এতো বড়ো সৃষ্টি সূর্যকে আমি তোমার জন্যই পয়দা করেছি, যেন তুমি আলো পাও। তাপ পাও। এর আলোতে তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারো। একে এতো দূরে রেখেছি, যাতে এর দ্বারা তোমার উপকার হয় এবং তুমি এর ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারো। এই সূর্যের কিরণের মাঝে উপকারী ও অপকারী দুটি বিপরীতমুখী অংশ আছে। অপকারী অংশ ছেঁকে মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ পাক পুরো দুনিয়ার আশেপাশে চালনির একটি 'স্তর' বসিয়ে দিয়েছেন, যাকে আজকাল (বিজ্ঞানের পরিভাষায়) OZONE LAYER বলা হয়। এই ওজনস্তর খুবই সূক্ষ্ম। এই 'চালনি' সৌর কিরণকে ছেঁকে কেবল এর উপকারী অংশটুকু মানবজাতিকে পৌঁছিয়ে থাকে এবং অপকারী অংশটুকু প্রতিহত করে রাখে। সুদীর্ঘকাল পরে এই ওজনস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। নয়ত মানুষ এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যেতো। কিন্তু আসমান-জমিন সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ পাক এই ওজনস্তর সেট করে দিয়েছেন। জানি না আরো অজানা কতো বস্তু ও পদার্থ তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন! একেকটি বস্তুর প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ পাকের লাখো নেয়ামত বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়।

নিজের দেহ নিয়ে ভাবুন

এগুলো তো 'দিগন্তে'র কথা। আপনি আপনার দেহ নিয়ে চিন্তা করুন। মাথা থেকে পাতা এবং চুল থেকে নখ পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গেই আল্লাহর অপরিসীম কুদরত, তাঁর অপরূপ সৃষ্টিকৌশল এবং অবারিত রহমতের কারিশমা বিদ্যমান। আপনাদের তো এ কথাও জানা নেই যে, আপনাদের দেহের ভিতর কী হচ্ছে এবং কী ঘটছে! এখনো পর্যন্ত আপনারা নিজের দেহকে পর্যন্ত উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হননি যে, আপনার দেহের কোন্ অঙ্গ কী কাজ করছে। যখন থেকে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করেছে, তখন থেকে

---

১. সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৯

আজ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বের আবিষ্কারে মত্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞান এ গবেষণায় মত্ত যে, এই ছয় ফুট দেহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কী অদ্ভুত কারখানা সেট করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে এর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি। যতটুকু আবিষ্কার করা গেছে তাতে জানা গেছে যে, এটা কুদরতের এক অদ্ভুত কারখানা। দুনিয়ার কোনো কারখানা, কোনো ফ্যাক্টরী, কোনো মিল এমন অদ্ভুত নয়, যেমনটি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি মানবদেহের ফ্যাক্টরী। মানুষ এই চলমান ফ্যাক্টরীকে নিয়ে এদিক সেদিক চলাফেরা করছে, এর ব্যবহার করছে, এর একেকটি অঙ্গ থেকে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু তার নিজেরই জানা নেই যে, এর ভিতরে কী হচ্ছে।

ক্ষুধা কখন লাগে?

মানুষ মনে করে আমার ক্ষুধা লেগেছে। ক্ষুধা দূর করতে সে খাদ্য গ্রহণ করে। স্বাদ আস্বাদনের জন্য খাবার খাচ্ছে। কিন্তু নির্বোধ এই মানুষের খবরও নেই যে, এখন সরকারী এই মেশিনের তেল দরকার। জ্বালানি দরকার। এই তেল কখন শেষ হচ্ছে এবং কতটুকু বাকী থাকছে, তা জানার জন্য তো মিটার লাগানো নেই। গাড়ীর মধ্যে আপনি মিটার লাগিয়েছেন, যদ্দারা আপনি জানতে পারছেন যে, গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে আসছে এখন এতে পেট্রোল দিতে হবে। এই দেহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা খুব সুস্বাদু এক মিটার বসিয়ে দিয়েছেন। যখনই এর জ্বালানির দরকার হয়, তখনই ক্ষুধা লাগে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাবারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু নির্বোধ মানুষ মনে করে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার গ্রহণ করছি। স্বাদ ও তৃপ্তির জন্য খানা খাচ্ছি।

'আস্বাদন' শক্তি এক বিশাল নিয়ামত

আল্লাহ পাক মুখের মধ্যে 'আস্বাদন' শক্তি বসিয়ে দিয়েছেন। যাতে স্বাদ গ্রহণের জন্য মানুষ খাবারের প্রতি আগ্রহী হয়। স্বাদের চাহিদা মেটানোর জন্যে খাবার খায়। প্রকৃতপক্ষে দেহের পুষ্টির জন্য খাবারের দরকার হয়। আল্লাহ তা'আলা এই ছোট্ট জিহ্বার মধ্যে আস্বাদন শক্তি বসিয়ে দিয়েছেন। সুস্বাদু খাবার যদি আপনি নাকের উপর রাখেন, কিংবা দেহের অন্য কোনো অঙ্গের উপর রাখেন তাহলে স্বাদ অনুভব হবে কি? তিতা না মিঠা, বুঝে

আসবে কি? মোটেই বুঝে আসবে না। কিন্তু ছোট্ট এই জিহ্বাতে আল্লাহ তা'আলা এমন লালা দিয়েছেন যে, এর ফলে স্বাদ অনুভূত হয় এবং খাবার মজা লাগে। আস্বাদন শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে সুস্বাদু বস্তুও তিতা লাগে।

যদি আস্বাদন শক্তি নষ্ট হয়ে যায়

আমার স্মরণ আছে, একবার আমার সর্দি লেগেছিলো। ফলে কিছুই স্বাদ লাগতো না। তখন এক জায়গায় দাওয়াত খেতে যাই। একজন প্রথমে ঝাল কিমা এনে দেয়। তারপর মিঠাই ক্ষীর এনে দেয়। আপনাদেরকে সত্য বলছি, ঝাল কিমা আর মিষ্টি ক্ষীরের মধ্যে তারতম্য করতে পারিনি। না মরিচের ঝাল অনুভব হচ্ছিলো, আর না মিষ্টির মিষ্টতা। কেবল গিলেছি। সাধারণ অবস্থায় আল্লাহ পাক জিহ্বায় এমন স্বাদ গ্রহণের শক্তি দান করেছেন যাতে খাবারে মজা আসে। এই স্বাদ আস্বাদনের জন্যই মানুষ নানা প্রকারের বিচিত্র সব খাদ্য তৈরি করে। আপনাদের স্বাদ নিবারণ ও পরিতৃপ্ত করার জন্য বিশাল একদল মাখলূক দিন-রাত কাজ করে চলছে। মানুষ মনে করছে আমি রসনা পরিতৃপ্ত করছি এবং স্বাদ আস্বাদন করছি। অথচ এর দ্বারা তার শরীরে পুষ্টি লাভ হচ্ছে। শরীরে জ্বালানি মিলছে।

পাকস্থলীতে স্বয়ংক্রিয় মেশিন সেট করা

স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আপনি সব ধরনের খাদ্য মুখে ঢেলে দিয়ে গলধঃকরণ করছেন। ইফতারের সময় সম্পর্কে ভাবুন, আপনি কী করছেন! এইমাত্র মিষ্টি দ্রব্য খেলেন, টক-ঝাল খেলেন, পিঁয়াজু, আলুর চপ, বেগুনি খেলেন, পরে খেলেন খেজুর, সবই খেলেন। ভিতরে গিয়ে কী হবে তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু আল্লাহ পাক আপনার ভেতরে একটি কারখানা স্থাপন করে দিয়েছেন, যা প্রতিটি বস্তুকে পৃথক করছে এবং ছাঁকছে। মানুষ স্বাদ গ্রহণের জন্য খাদ্য-অখাদ্য বহুত কিছু গিলছে। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা ভিতরে একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিন বসিয়ে দিয়েছেন যা প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যকে পৃথক করছে। যে খাদ্য দ্বারা রক্ত তৈরি করার তা রক্ত তৈরি করছে। যে খাদ্য দ্বারা শক্তি অর্জন করা দরকার তা দ্বারা শক্তি লাভ হচ্ছে। যা অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত তা বের হয়ে যাচ্ছে। একদিক থেকে খাদ্য ঢুকছে, অপর দিক থেকে খালাস হচ্ছে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা, যা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি।

বিনা দরখাস্তে আল্লাহ তা'আলা এসব দিয়েছেন

এই কুদরতি ব্যবস্থাপনার কোনো একটি যদি ঢিল হয়ে যায় তাহলে মানুষ অস্থির ও পেরেশান হয়ে যায়। তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এবার ডাক্তারের পেছনে দৌড়াচ্ছে। আপনি কী আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলেন যে, আমি খানা খাবো, আপনি খাবারের সব ব্যবস্থাপনা ঠিক করে দিন। আমাদের দেহের মধ্যে এমন কলিজা বানিয়ে দিন। গুর্দা বানিয়ে দিন। এমন পাকস্থলি বসিয়ে দিন! এমন দরখাস্ত কি আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে করেছিলেন? না, বরং তিনি কেবল দয়া ও অনুগ্রহ করে এই গোটা কারখানা বানিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়টিই মাওলানা রুমীর রহ. তাঁর কবিতায় এভাবে তুলে ধরেছেন-

ما نبودیم و تقاضہ ما نبود　　　لطف او نا گفتۂ ما ای شنود

অর্থাৎ, আমরা অস্তিত্বহীন ছিলাম। আমাদের কোনো আবেদন ও চাহিদা ছিলো না। কিন্তু তাঁর দয়া আমাদের না বলা আবেদন শুনে এই কারখানা পয়দা করেছেন।

চোখ বিশাল এক নিয়ামত

চোখ একটি বিস্ময়কর কারখানা। এর সাথে পৃথিবীর কোনো কারখানার তুলনা হয় না। কোনো মানুষ এই কারখানা বানাতে চাইলে কোটি কোটি টাকাতেও তা সম্ভব হবে না। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ এসব নিয়ামত দেখে, এগুলো নিয়ে ভাবে, চিন্তা করে, আর বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই চক্ষু দান করেছেন। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই চোখ দিয়ে নয়নভিরাম দৃশ্যাবলী দেখছি। এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছি।

আপনার চিন্তায় কি কখনও এটা নিয়ামত হওয়ার কথা জেগেছে? কখনও কি এই নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন? বলেছেন কি, হে আল্লাহ! আপনি এই চক্ষু দিয়েছেন। এতে দৃষ্টিশক্তি ও আলো দান করেছেন। আমি এর শোকর আদায় করিনি। বরং গাফলতী ও উদাসীনতার সাথে এই মহান নিয়ামত ব্যবহার করছেন। বেপরোয়াভাবে একে কাজে লাগাচ্ছেন। আল্লাহ না করুন, এই দৃষ্টিশক্তি যদি কখনো নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা কমে যায়, তখন বুঝতে পারবেন যে, এটা কতো বড়ো নিয়ামত ছিলো, যা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বেপরোয়াভাবে এটা ব্যবহার করছেন। এটা ব্যবহারে

হালাল-হারামের বাছ-বিচার করছেন না। সুতরাং মাঝে মধ্যে একটু ভাবুন! কতো বড়ো নিয়ামত এই চোখ!। এমন বিশাল নিয়ামত অর্জন করা কি আমাদের সাধ্যে ছিলো? একবার এই নেয়ামত চলে গেলে লাখো-কোটি টাকা খরচ করলেও আর ফিরে আসবে না। শুধু কী তাই, আল্লাহ পাক চোখের হেফাজতের জন্যে দুটি পাহারাদার বসিয়েছেন। চোখের পাতা হলো সেই পাহারাদার। কোনো কিছু চোখের দিকে ধেয়ে এলে চোখের পাতা তা আটকে দেয়। যাতে করে চোখে আঘাত না লাগে। কারণ চোখ এমনই স্পর্শকাতর অঙ্গ যে, সামান্য আঘাতে তা খারাপ হয়ে যেতে পারে। এমন মহান নিয়ামতের ব্যাপারে ভাবুন, চিন্তা করুন এবং শোকর আদায় করুন!

কান ও জিহ্বা বিস্ময়কর দু'টি নিয়ামত

কান আল্লাহ পাকের দেওয়া বিশাল এক নিয়ামত। যারা শ্রবণশক্তি থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন এর মূল্য কতো! আল্লাহ তা'আলা জিহ্বা ও বাকশক্তি দান করেছেন। আত্মার ভাব প্রকাশের উপকরণ দিয়েছেন। নতুবা অন্তরে আবেগের ঢেউ তরঙ্গায়িত হতো, কিন্তু জিহ্বা দিয়ে কিছুই বলতে পারতেন না। এর মূল্য তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, যাদের জিহ্বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। তারা কথা বলতে চায়, আবেগ প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু সক্ষম হয় না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিনামূলে এই নিয়ামত দান করেছেন। মোটকথা, আপাদমস্তকের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে ভাবুন, আল্লাহ পাক আপনাকে কতো সব নিয়ামত দান করেছেন!

রাতে শোয়ার পূর্বে এই আমল করুন

এসব নিয়ামত সম্পর্কে মুরাকাবা করুন। এই মুরাকাবার ফল এই হবে যে, যেই সত্তা এসব নিয়ামত দান করেছেন তাঁর সাথে মহব্বত পয়দা হবে। মুরাকাবার উত্তম পদ্ধতি হযরত থানভী রহ. এই বলেছেন যে, রাতে শোয়ার পূর্বে ৫-১০ মিনিট মুরাকাবার জন্য নির্ধারণ করুন। ওই মুরকাবায় আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতরাজি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। একেকটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করুন। বলুন, হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে আমাকে চক্ষু দান করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমার চোখকে সুস্থ ও দৃষ্টিসম্পন্ন করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ

اَلشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কান দান করেছেন এবং একে আপনি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জিহ্বা দান করে একে বাকশক্তিসম্পন্ন করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দন্তরাজি দান করে একে সুস্থ-সবল করেছেন এবং খাদ্য গ্রহণের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পা দান করেছেন এবং এর দ্বারা চলাফেরা করার শক্তি দিয়েছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হাত দিয়েছেন এবং আমি আমার সকল কাজ এই হাত দ্বারা সম্পন্ন করছি, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। এভাবে একেকটি অঙ্গের কল্পনা করে এর ভিতরে যেসব নিয়ামত আল্লাহ পাক দান করেছেন সেগুলোর কথা স্মরণ করুন এবং শোকর আদায় করুন।

চতুর্পার্শ্বের নিয়ামতের শোকর

এরপর আপনার চতুর্পার্শ্বের নিয়ামতসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং বলুন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বাসস্থান দান করেছেন। যা শান্তির নীড়। না জানি কতো লোক বাস্তহারা হয়ে জীবন যাপন করছে, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আরামদায়ক বিছানা দান করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিবার-পরিজন দান করেছেন, যারা আমাকে ভালোবাসে, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। একেকটি বস্তুর কথা চিন্তা করুন এবং আল্লাহর শোকর আদায় করুন।

বিপদ ও পেরেশানির সময় নিয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করা

মানুষের উপর কোনো না কোনো কষ্ট ও পেরেশানি বিভিন্ন সময় এসে থাকে। কিন্তু তা নিয়েই ব্যস্ত হওয়া এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে ভুলে যাওয়া মানুষের কাজ এই নয়। বরং দুঃখ, কষ্ট ও পেরেশানির সময়ও যদি চিন্তা করে তাহলে তখনও আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামত দেখতে পাবে। কিন্তু যেহেতু মানুষ ধৈর্যহীন, তাই কোনো কষ্ট দেখা দিলে তা নিয়েই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিয়ামতসমূহ ভুলে যায়।

মিয়াঁ ছাহেব রহ. জন্মগত ওলী ছিলেন

আমার ওয়ালেদ ছাহেবের একজন উস্তাদ ছিলেন, তাঁর নাম মিয়াঁ আসগর হুসাইন রহ.। তিনি 'মিয়াঁ ছাহেব' নামেই খ্যাত ছিলেন। বিস্ময়কর বুযুর্গ ও জন্মগত ওলী ছিলেন। আমার দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসীন ছাহেব রহ.-এর শাগরিদ ছিলেন। আমার দাদাজান বলতেন, সে জন্মগত ওলী। শৈশবকালে আমার কাছে পড়তে আসতো। তখন থেকে আজ পর্যন্ত একটা মিথ্যা কথা সে বলেনি। বাচ্চাদেরকে যখন পড়াতাম, কোনো বাচ্চা দুষ্টুমি করলে আমি রেগে কড়া ভাষায় জিজ্ঞাসা করতাম, এ কাজ কে করেছে? সব বাচ্চা মুখ বুঁজে বসে থাকতো, কিন্তু মিয়াঁ আসগর দাঁড়িয়ে বলতো, ওস্তাদজি! আমার দ্বারা এ ভুল হয়ে গেছে। এমন সময়ও কখনো তার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয়নি।

অসুস্থাবস্থায় শোকরের ধরন

আমার আব্বাজান বলতেন, একবার আমি খবর পেলাম, তিনি অসুস্থ। আমি তাঁর সেবায় গিয়ে দেখলাম, প্রচণ্ড জ্বরে তাঁর পুরো শরীর উত্তপ্ত। চরম অস্থির তিনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত এখন কেমন লাগছে? তিনি বললেন, আল্লাহর শোকর! আমার চোখ দুটি ঠিক মতো কাজ করছে। আল্লাহর শোকর! আমার কানও খুব কাজ করছে, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। আলহামদু লিল্লাহ! বাকশক্তিও আমার বহাল আছে। আলহামদু লিল্লাহ! কলিজা, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী স্বাভাবিক আছে। সমান্য একটু জ্বর হয়েছে এই যা। দু'আ করুন! আল্লাহ পাক তা দূর করে দিন।

দেখুন! যে সব কষ্ট ছিলো না সেগুলোর কথা উল্লেখ করে আগে তার শোকর আদায় করলেন। অবশেষে বললেন, জ্বরের কথা। এঁরা এমন লোক যে, ঠিক কষ্টের মধ্যেও আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করছেন এবং শোকর আদায় করছেন। এরপর সামান্য আকারে কষ্টের কথা বললেন এবং তা আল্লাহর দরবারে পেশ করলেন। এই হলো একজন কৃতজ্ঞ বান্দার কর্মপদ্ধতি।

নিয়ামতসূহের শোকর আদায় করুন

আমাদের অবস্থা এই যে, সামান্য অসুখে পড়তেই সমস্ত নিয়ামতকে ভুলে যাই। অসুখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সে জন্যে অভিযোগ অনুযোগ আরম্ভ করি। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন,

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

'আমার বান্দাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।'[১]

যে সব নিয়ামতে আমি তাকে সব সময় ডুবিয়ে রেখেছি তার অনুভূতি নেই। সে দিকে মনযোগ নেই। এজন্য বলেন, নিয়ামতসমূহ স্মরণ করুন। তার শোকর আদায় করুন। যে সব কষ্ট আপনার হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাও পেশ করুন। বলুন হে আল্লাহ! আমি কমজোর। এই কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছে না। আপনি দয়া করে আমার এই কষ্ট দূর করে দিন। আপনি অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, কষ্ট দূর করার নিয়ামতটুকুও দান করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে বর্তমান নিয়ামতের না-শোকরী করবেন না।

দাঁত এক বিশাল নিয়ামত

আমাদের এক বোনের বয়স হয়ে যখন দাঁত পড়া শুরু হলো, তখন একবার তিনি দাঁত ফেলে এসে আব্বাকে বলতে লাগলেন, আব্বাজান! দাঁত এক অদ্ভুত বস্তু। এটা উঠার সময়েও কষ্ট দেয়, আবার পড়ে যাওয়ার সময়ও কষ্ট দেয়। তাঁর কথার উদ্দেশ্য ছিলো, শৈশবে যখন দাঁত উঠে তখন পেটের পীড়া হয়, কখনও বা জ্বর আসে। এদিকে শেষ বয়সে যখন পড়তে শুরু করে তখনও এটা অনেক কষ্ট দেয়। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব তাঁর কথা শুনে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন এবং বললেন, আল্লাহর বান্দী! এই দাঁতের কেবল দুটি দিকই তোমার স্মরণে আছে যে, তা উঠার সময়ও কষ্ট দিয়েছে আবার পড়ে যাওয়ার সময়ও কষ্ট দিচ্ছে । কিন্তু এর মাঝের সুদীর্ঘ ৫০-৬০ বছর এ দাঁত দ্বারা যে মজা লুটেছো, যে শান্তি উপভোগ করেছো এবং যে স্বাদ আস্বাদন করেছো, তার কথা কখনো স্মরণ হলো না?

বুঝলাম, ওঠতে ও পড়তে কষ্ট হয়, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে আল্লাহপ্রদত্ত এই দন্তমালা দ্বারা মণকে মণ, টনকে টন খাদ্য পেষণ করেছো, একে তোমার শরীরের অঙ্গ বানিয়েছো, তার প্রতি খেয়াল যায় না? সামান্য কষ্ট হলে আমরা তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ি, আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা ভুলে যাই!

আল্লাহওয়ালাগণের সোহবতের ফায়দা

আল্লাহওয়ালাগণের সোহবতের ফায়দা এই হয় যে, তারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দেন। এ যাবৎ দৃষ্টি কেবল কষ্ট, মুসীবত ও পেরেশানীর

---

১. সূরা সাবা, আয়াত-১৩

দিকে গেছে। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে তা নিয়ামতের উপরে পড়ার আরম্ভ করেছে। যতো কষ্ট আছে, সব আল্লাহর সমীপে পেশ করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি দুর্বল। আমি এই কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। হে আল্লাহ! দয়া করে এটা দূর করে দিন। কিন্তু যিনি আপনাকে এতো নিয়ামত দিয়েছেন কমপক্ষে তাঁকে ভুলবেন না।

উপকারীর সঙ্গে কী মহব্বত হবে না?

সুতরাং রাতে শোয়ার পূর্বে খানিকক্ষণ বসে নিয়ামতের সমীক্ষা করুন। নিজের দেহের নিয়ামতসমূহ, পারিপার্শ্বিক নিয়ামতসমূহ এবং পরিবারের উপর প্রদত্ত নিয়মতসমূহ সমীক্ষা করুন। এর প্রত্যেকটির জন্য শোকর আদায় করুন। এরই নাম 'মুরাকাবা'। 'মুরাকাবা' অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। প্রতিদিন করে দেখুন। প্রতিদিন আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মুরাকাবা করার ফলে আপনাআপনি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। ধরুন, এক ব্যক্তি প্রতিদিন আপনার দরজায় পয়সা রেখে চলে যায়। আপনি তা তুলে নিয়ে প্রয়োজন পুরা করেন। এভাবে আপনার কাজ সমাধা হয়। তখন আপনার অন্তরে তাকে দেখার বাসনা জাগবে। যে লোক প্রতিদিন আমার দরজায় পয়সা রেখে যায়, ফলে আমার প্রয়োজন পুরা হয়, তাকে একটু দেখি তো! তাকে দেখার সুযোগ হোক বা না হোক তার মহব্বত অন্তরে অবশ্যই সৃষ্টি হবে। একজন মানুষ দিনে একবার মাত্র আপনার দরজায় পয়সা ফেলায় এবং তা দিয়ে আপনার প্রয়োজন মিটছে, তার কল্পনায় যদি আপনার অন্তরে মহব্বত পয়দা হতে পারে; তাহলে যে মহান সত্তা প্রতি মুহূর্তে আপনার প্রতি নিয়ামত বর্ষণ করছেন, সেই সত্তাকে যদিও আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, তাই বলে কি আপনি তাঁকে মহব্বত করবেন না? তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে কি তাঁর সঙ্গে ভালোবাসা জন্মাবে না। এজন্য প্রতি রাতে ১০ মিনিটের জন্য তাঁর নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করে মুরাকাবা করুন এবং প্রত্যেক নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করুন।

শোকর আদায় করার বিস্ময়কর ঘটনা

আমার শাইখ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, আমি এ বিষয়টি আমার এক প্রিয়জনের নিকট থেকে শিখেছি। তিনি দৈনিক শোয়ার পূর্বে বিছানায় বসে নিম্নোক্ত শব্দগুলো জপতেন। বারবার বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ،

একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাতে শোয়ার পূর্বে এ কি করেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ ভাই! সারাদিন তো নেয়ামতের শোকর আদায় করার সময় পাই না। এজন্য রাতে শোয়ার পূর্বে আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করি। একেকটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করি। হযরত ডা. ছাহেব বলেন, তিনি শোকর আদায় করার বিস্ময়কর এক পদ্ধতি বাতলে দিলেন।

মোটকথা, রাতে শোয়ার পূর্বে দশ মিনিট এ কাজের জন্য বের করুন। এসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ামতের কথাও স্মরণ করুন এবং এর জন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করুন। এ আমল আপনাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা করবে। আল্লাহ পাকের মহব্বত অন্তরে পয়দা হলে সকল কাজই আসান হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এ সব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সৃষ্টি করার উপকরণ ও পদ্ধতি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ

عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ!

গত কয়েক দিন ধরে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। বিষয়বস্তু হলো 'আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব এবং তা পয়দা করার পদ্ধতি'। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত পুরো দ্বীনের বুনিয়াদ। হযরত থানভী রহ. আল্লাহ তা'আলার মহব্বত পয়দা করার প্রথম পদ্ধতি বলেছেন, 'অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা'। এর সামান্য বর্ণনা পূর্বে আরজ করেছি। দ্বিতীয় পদ্ধতির আলোচনা গতকাল সামান্য করেছি। আর তা ছিলো, 'আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহ এবং নিজেদের আচরণ সম্পর্কে চিন্তা করা'। আল্লাহ পাক যেসব নিয়ামত প্রতিমুহূর্তে বান্দাকে দিচ্ছেন তার কল্পনা ও ধ্যান করার ফলে প্রকৃত উপকারী ও দয়ালু আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। বলাবাহুল্য যে, যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের কৃপাধীন এবং সর্বদা না চাইতেই তিনি অনুগ্রহ করেন, তার সাথে মহব্বত পয়দা হওয়া সহজাত বিষয়।

তাঁর নিয়ামত সকলের জন্য উন্মুক্ত

আল্লাহ পাকের নিয়ামতের পরম্পরা অনিঃশেষ। এ সব নিয়ামত যখন বারবার স্মরণ করা হবে তখন তার মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। প্রয়োজন

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৫৬-১৮৪, যোহরের নামাযের পর, রমাযানুল মোবারক, জামে মসজিদ, দারুল উলূম, করাচী

শুধু ধ্যান করা। তাঁর নিয়ামত তো অব্যাহত আছেই। আপনি শোকর আদায় করুন আর না-ই করুন তাঁর নিয়ামতে কখনও ঘাটতি হবে না। শেখ সাদী রহ. বলেন,

ادیم زمیں سفرۂ عام اوست
بری خوان نعمت چہ دشمن چہ دوست

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সমগ্র পৃথিবীকে এমন এক সার্বজনীন দস্তরখান বানিয়ে রেখেছেন যে, সকল মাখলূক এ থেকে উপকৃত হয়ে চলেছে। এই দস্তরখানে শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ নেই। শত্রুকেও তিনি ঐভাবে দান করেন যেভাবে দান করেন মিত্রকে। এই দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার জাহেরী নিয়ামতসমূহ মুসলিম ও কাফের সকলের উপর বর্ষিত হচ্ছে। বরং ক্ষেত্র বিশেষে কাফেরদের উপর অধিক বর্ষিত হচ্ছে। তারা মুসলিমদের তুলনায় অধিক স্বচ্ছল। অধিক উন্নত। তাদের কাছে অধিক টাকা ও বিত্ত-বৈভব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দেখছেন, অমুক আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, আমাকে অপদস্ত করছে, আমার সঙ্গে গোস্তাখি করছে, আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে; এরপরও আল্লাহ পাক তাকে নিয়ামত দান করছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার নিয়ম।

দোস্তদের দিয়েছেন অভাব-অনটন এবং দুশমনদের দিয়েছেন স্বচ্ছলতা

বরং কোনো কোনো সময় আল্লাহ পাক ইচ্ছা করে প্রিয় বান্দাদেরকে এই দুনিয়ায় অভাব-অনটনে ফেলেন এবং শত্রুদের ধন-সম্পদে পূর্ণ করেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

ماپروریم دشمن وماکشیم دوست
کس راچراں وچوں نہ رسد در قضائے ما

অর্থাৎ, কখনো আমি দুশমনকে লালন করি এবং দোস্তকে হত্যা করি। যেভাবে সামেরী যাদুকরকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম দ্বারা লালন করা হয়েছে। অপরদিকে ইলিয়াস আলাইহিস সালামকে করাত দ্বারা দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছে। সুতরাং ইহজগতে আল্লাহ পাকের নিয়ামত দোস্ত-দুশমন ও

মুসলিম-কাফের সকলের জন্যে অবারিত। আল্লাহ পাকের নিয়ামতে কোনো ঘাটতি হয় না।

এসব নেয়ামতের প্রতি মনোযোগ নেই

کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج

ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

'কেউ যদি অকৃতজ্ঞ হয় তাহলে তার চিকিৎসা কী?
তাঁর দান-অনুদানে তো কোনো কমতি নেই।'

তার অনুগ্রহ-বারি তো সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজন শুধু চিন্তা করা। আমরা তার নিয়ামতের প্রতি গাফেল, চিন্তা করি না। এজন্য নিয়ামতের প্রতি খেয়াল নেই। আল্লাহ পাক যদি তাঁর ধ্যান করার তাওফীক দান করেন, তাহলে এটা মোটেই সম্ভব নয় যে, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করার পরও অন্তরে তাঁর মহব্বত পয়দা হবে না। এজন্য গতকাল আমি আরজ করেছিলাম যে, রাতে শোয়ার পূর্বে নেয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করুন এবং এর শোকর আদায় করুন। মোটকথা, মহব্বত পয়দা করার দ্বিতীয় তরীকা হলো, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কথা চিন্তা করা।

তৃতীয় পদ্ধতি:
নিজের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

এরপর হযরত বলেন, এর পাশাপাশি নিজের আচরণ ও কর্ম নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করবে। অর্থাৎ, এ কথা চিন্তা করবে যে, একদিকে বৃষ্টির মতো অবিরাম ধারায় আল্লাহ পাকের নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে, অপরদিকে আল্লাহ পাক সামান্য যেই ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন, তাতে আমি অলসতা করছি। যে গোনাহ থেকে তিনি বিরত থাকার আদেশ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রেও অলসতা করছি।

মাওলানা রুমী রহ. বলেন,

کارساز ما بساز کار ما   فکر ما در کار ما آزار ما

অর্থাৎ, আমাদের কর্ম-নিয়ন্তা দিন-রাত আমাদের কাজে লেগে আছেন। আমাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করছেন। আমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ষণ

করছেন। কিন্তু যে কাজ তিনি আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন, সে কাজকে আমরা বিপদ মনে করছি। আমরা নামায পড়া, রোযা রাখা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে মুসীবত মনে করছি। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতিদানে বান্দার কর্মকাণ্ড কতোই না নাশোকরীতে ভরা। যদি মানুষ একথা চিন্তা করে যে, আমার এমন কর্মকাণ্ডের পরও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার উপর নিয়ামতের বারি বর্ষণ হচ্ছে, তাহলে আল্লাহর মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ এবং প্রতিদানে নিজের আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করুন

হযরত থানভী রহ.-এর উপরোক্ত কথার আরেকটি মর্ম হতে পারে, যা তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন, আমাদের ভাই কালীম সাহেব বলেছেন, তিনি হযরতের কোনো এক ওয়াজে এই ব্যাখ্যা পাঠ করেছেন যে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং নিজের কর্ম নিয়ে ভাবলে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত পয়দা হয়, একইভাবে আল্লাহ পাকের নিয়ামত এবং নিজ অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করার দ্বারাও অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়। নিজ অবস্থান নিয়ে চিন্তা করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব, মহত্ব, প্রতিপত্তি, তাঁর রহমত, পূর্ণ শক্তি ও মহা কৌশলের কথা চিন্তা করবে। অপরদিকে নিজের অবস্থানগত দৈন্য কল্পনা করবে যে, আমার কোনো মূল্য নেই। আমি তো কোনো কাজের যোগ্য নই। আমার কাছে যা আছে সবই তো তাঁর দান। নতুবা আমার কাছে তো কিছুই ছিলো না। আমি নিজে নিজেকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম নই। আমি নিজেকে জীবিত রাখতেও সক্ষম নই। চেহারা, অবয়ব, সুস্থতা ও জ্ঞান কোনোটিই আমি অর্জন করতে সক্ষম নই। এর কিছুই আমার ছিলো না। এসবই তাঁর দান। তিনি চাইলে এগুলো ছিনিয়ে নিতে পারেন। ফিরিয়ে নিতে পারেন।

এতে আল্লাহর শোকর ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়

সবকিছুই যখন তাঁর আবদান তখন কী নিয়ে অহঙ্কার করবো? কীসের উপর গর্ব করবো? কিসের ভিত্তিতে আত্মগৌরব ও আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত হবো! কারণ, আমার মধ্যে তো আমার নিজের কিছুই নেই। এই হচ্ছে, নিজের

অবস্থান নিয়ে চিন্তা করা। এতে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হবে। যতো বেশি নিজের দীনতার অনুভূতি জাগ্রত হবে, ততো বেশি আল্লাহ পাকের নিয়ামতের মর্যাদা ও গুরুত্বের অনুভূতি জাগ্রত হবে। মানুষ যদি নিজেকে এসব নিয়ামতের যোগ্য মনে করে তাহলে সে ভাববে, আমার সাথে আল্লাহর এমনই করা দরকার ছিলো। আমাকে এ নিয়ামত দেওয়াই উচিত ছিলো। এ ধরনের মানুষ আল্লাহ পাকের কী শোকর আদায় করবে? তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার জন্য কোথেকে মহব্বত জন্মাবে? পক্ষান্তরে মানুষ যদি এ কথা চিন্তা করে যে, আমার কোনো মূল্য না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক আমাকে এই নিয়ামত দান করেছেন, তাহলেই কেবল সে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে এবং অন্তরে তাঁর মহব্বত পয়দা হবে।

জনৈক বুযুর্গ ও অহংকারীর ঘটনা

মনে যদি এই চিন্তা জাগে যে, আমি বড়ো মানুষ। আমার প্রভাব-প্রতি রয়েছে। অন্তরে যদি অহমিকা জাগে, তখন মানুষ অপরকে বলে, 'জানো না আমি কে!'

একবার এক বুযুর্গ জনৈক ব্যক্তিকে সংশোধনমূলক একটি কথা বললে প্রতি-উত্তরে সে বললো, 'জানো না আমি কে!' অর্থাৎ, আমি এক বিরাট ব্যক্তিত্ব, তুমি আমার ইসলাহ করছো! জবাবে ঐ বুযুর্গ বললেন, হ্যাঁ! আমি জানি তুমি কে, তোমার হাকীকত তো এই যে,

أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ وَآخِرُكَ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ

وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْقَذِرَةَ

অর্থাৎ, তোমার শুরুটা পুতিগন্ধময় নাপাক বীর্যের এক ফোঁটা। এই হলো তোমার মূল ও সূচনা। আর তোমার পরিণতি হলো, তুমি এক দুর্গন্ধময় মৃত লাশে পরিণত হবে। এমন দুর্গন্ধময় যে, তোমার পরিবারের লোকেরাও তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নিজেদের ঘরে রাখতে রাজি হবে না। তোমার মরণে তারা কাঁদবে ঠিকই কিন্তু ঘরে রাখতে রাজি হবে না। তারা বলবে, লাশের দুর্গন্ধ সহ্য করার শক্তি আমাদের নেই। সুতরাং অবিলম্বে তোমাকে কবরস্থানে নিয়ে মাটিচাপা দিবে। এদিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তুমি নাপাক বোঝা বয়ে চলেছো। এটা কোনো অতিরঞ্জিত কথা নয়, বরং একান্তই বাস্তব কথা। বাস্তবিকই চিন্তা করলে দেখতে পাবে যে, মানুষ আপাদমস্তক নাপাকের

পোটলা। আল্লাহ পাক দয়া করে চামড়া দ্বারা এগুলো আড়াল করে দিয়েছেন। দোষ-ত্রুটি গুপ্ত আছে, দুর্গন্ধ আবৃত আছে, নয়ত এই সুন্দর চেহারায় সামান্য চিড় ধরলে দেখবেন নাপাক বেরিয়ে আসছে। কোথাও রক্ত, কোথাও পুঁজ, কোথাও পেশাব, কোথাও পায়খানা ভরপুর। এখন তো সকলে মহব্বত করছে। নিকটে বসাচ্ছে। কিন্তু চেহারা থেকে চামড়া সরে গেলে কেউ ধারেও বসতে চাইবে না। বরং ঘৃণা করবে। এমনকি কেউ ওদিকে তাকাতেও চাইবে না। সুন্দর এই চেহারা তখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। দেখে সকলে ভয়ে শিউরে ওঠবে। সুতরাং তোমার সূচনা দুর্গন্ধময় বীর্য, সমাপ্তি পঁচা লাশ, আর মাঝের সময়টা নাপাকি বহন করে ফিরছো। এই হলো তোমার বাস্তবতা, তারপরেও তুমি বলো, 'জানো আমি কে?'!

বিনয় ও ভঙ্গুরতা কাম্য

মানুষের নিজের এই হাকীকত সম্পর্কে অনুভূতি-উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত তার আল্লাহ পাকের নিয়ামতের উপলব্ধি হতে পারে না এবং আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মহব্বতও পয়দা হতে পারে না। এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, 'নিজের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় লাভ করো'। তরীকতের পয়লা এবং শেষ সবক হলো, 'নিজের হাকীকত জানা, নিজেকে মিটানো এবং নিজেকে বিলুপ্ত করা'। যার মধ্যে দাবী থাকবে, অহমিকা থাকবে, শান-শওকত দেখাবে এবং অহংকার করবে, সে এ পথের কিছুই লাভ করতে পারবে না। এখানে বিনয় ও ভগ্নতা কাম্য। নিজের দীনতা-হীনতার প্রকৃত উপলব্ধি এবং আল্লাহ পাকের সামনে বিলুপ্তি কাম্য।

নিজের চোখে ছোট এবং অন্যের চোখে বড়ো

এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট এই দু'আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

'হে আল্লাহ! আপনি আমার দৃষ্টিতে আমাকে ছোট বানিয়ে দিন এবং মানুষের দৃষ্টিতে বড়ো বানিয়ে দিন।'[১]

---

১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩১, সুবুলুল হুদা ওয়ার ইরশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩২, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭, হাদীস নং ৩৬৭৫

অর্থাৎ, যখন আমি আমাকে দেখবো নিজেকে ছোট ভাববো, যাতে আমার মধ্যে বিনয় সৃষ্টি হয়। অবশ্য লোকদের দৃষ্টিতে আমাকে বড়ো বানিয়ে দিন। কেননা লোকেরা যদি আমাকে ছোট জ্ঞান করে তাহলে আমার প্রতি তারা জুলুম-অত্যাচার করবে। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি চমৎকার বলেছেন,

سگ باش' و برادر خورد مباش

'কুকুর হও কিন্তু ছোট ভাই হয়ো না।'

এ কথার উদ্দেশ্য হলো, সকল মুসীবত ছোট ভাইয়ের ওপর আপতিত হয়। এজন্য যদি অন্যে মনে করে যে, এ ছোট, তাহলে এর প্রতি জুলুম করবে, একে ভূনা করে খাবে। এ যখন ছোট, তখন তার সাথে যা খুশি তাই করো। সুতরাং প্রতিরক্ষার জন্য, নিজেকে বাঁচানোর জন্য হে আল্লাহ! লোকদের দৃষ্টিতে আমাকে বড়ো বানিয়ে দিন। কিন্তু নিজকে যেন আমি ছোটই মনে করতে থাকি।

বিলোপই শুরু, বিলোপই শেষ

হযরত হাকীমুল উম্মত (কু.সি.) বলেন, আমাদের শাইখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ.-এর প্রথম ও শেষ সবক ছিলো 'বিলোপ আর বিলোপ'। অর্থাৎ, নিজেকে মিটানো। তিনি বলেন, যে শাইখগিরি, পীরগিরি ও শান-শওকতের পথ অবলম্বন করে, আমাদের তরীকার বাতাসও তার গায়ে লাগেনি। এজন্য সাধারণ মানুষের মতো থাকো। শান-শওকত বানানোর প্রয়োজন নেই। আড়ম্বর পরিহার করো। নিজের প্রকৃত অবস্থা সামনে রাখো। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের উপলব্ধি আসবে, শোকরের তাওফীক লাভ হবে এবং আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা হবে।

চতুর্থ পদ্ধতি: আল্লাহওয়ালাদের সোহবত

হযরত থানভী রহ. মহব্বত সৃষ্টিকারী চতুর্থ উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখা'। এটাও আল্লাহর মহব্বত পয়দা করার শক্তিশালী মাধ্যম। বরং সম্ভবত সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের সাথে যতো মহব্বত হবে, যতো সম্পর্ক কায়েম হবে, যতো এঁদের সাথে ওঠা-বসা হবে, যতো সঙ্গ লাভ হবে; অন্তরে

আল্লাহর মহব্বত ততো বৃদ্ধি পাবে। আমাদের হযরত একটি কবিতা পড়তেন,

ان سے ملنے کی یہی اک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر

তাঁর মিলন লাভের পদ্ধতি এই যে, যারা তাঁর মিলন লাভ করেছেন তাদের পথ ধরো, তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ো; তাহলে ইনশাআল্লাহ তাঁকেও লাভ করতে পারবে। সুতরাং যারা আল্লাহওয়ালা, যাদের আত্মা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে পরিপূর্ণ, তাদের সাহচর্য অবলম্বন করার দ্বারা, তাদের নিকটে অবস্থান করার দ্বারা, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার দ্বারা, তাদেরকে মহব্বত করার দ্বারা আপনার আত্মার আল্লাহর মহব্বত পয়দা হবে।

আল্লাহর মহব্বত বদ্ধমূল করছি

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' ছাহেব রহ. প্রায়ই এই ঘটনা শোনাতেন যে, একবার হযরত থানভী রহ. তাঁর মজলিসে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও তাঁর রাসূলের মহব্বত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ.-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বয়ানের মাঝখানে হযরত খাজা ছাহেব বললেন, হযরত! আল্লাহর ওয়াস্তে আমার আত্মার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত ভরে দিন। হযরত থানভী রহ. বললেন, আমি এছাড়া আর কি করছি! এই যে বয়ান হচ্ছে, এর দ্বারা তোমার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ভরা হচ্ছে। এছাড়া আমি আর কি করছি!

মোটকথা, যখন মানুষ আল্লাহওয়ালদের সোহবতে বসে, তাঁদের কথা শোনে, তাঁদের বাণী আহরণ করে এবং তাঁদের কার্যকলাপ দেখে, তখন এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বত পয়দা হয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করো।

পঞ্চম পদ্ধতি: নিয়মিত ইবাদত করা

হযরত বলেন, আল্লাহর মহব্বত লাভের পঞ্চম উপকরণ 'নিয়মিত ইবাদত করা'। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান মেনে চলা। যতো বেশি

আনুগত্য করবে ততো বেশি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা 'মহব্বত' ও 'আনুগত্যে'-র মধ্যে অদ্ভুত সম্পর্ক রেখেছেন। তা হচ্ছে এই যে, 'আনুগত্য' দ্বারা মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং সেই 'মহব্বত' দ্বারা অধিক 'আনুগত্য' লাভ হয়। আবার এই আনুগত্যের ফলে আরো অধিক 'মহব্বত' লাভ হয়। এ এক অনিঃশেষ ধারা, যা কখনও শেষ হয় না।

এর দ্বারা পরস্পর পরস্পরের উপর নিরভর্শীল হওয়া আবশ্যক হচ্ছে

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, বলা হচ্ছে– আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে হলে এবং দ্বীনের ওপর চলতে হলে মহব্বত পয়দা করো। আর মহব্বত পয়দা করার জন্য দ্বীনের ওপর চলো। তাহলে তো মহব্বত ও আনুগত্য একে অপরের উপর নিভরর্শীল হলো। তাহলে এগুলো কীভাবে অর্জন করবো। এ প্রশ্নের উত্তর খুব গভীরভাবে বুঝতে হবে।

শুরুতে সামান্য মেহনত ও হিম্মত প্রয়োজন

এর জবাব এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর আনুগত্যের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, যখন কোনো বান্দা শুরুতে সামান্য মেহনত করে আনুগত্য করে তখন আল্লাহ তা'আলা এর ফলে 'মহব্বতের' এক বিশেষ স্তর তাকে দান করেন। পরে বিশেষ স্তরের এই 'মহব্বতের' পরিণতিতে অতিরিক্ত আনুগত্যের জযবা পয়দা হয়। সারকথা হলো, শুরুতে মেহনত ও আমল ছাড়া এমনিতেই কোনো প্রকার মহব্বত পয়দা হয় না। আর এমনিতেই আনুগত্য করা সহজ হয় না। বরং দ্বীন শুরুতে কিছু ত্যাগ চায়। সামান্য হিম্মত ও মেহনত চায়। এই হিম্মত ও মেহনত ছাড়া এই দৌলত অর্জন করা যায় না। সুতরাং শুরুতে মানুষের এই কাজ করতে হবে যে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং পার্থিব ও মানবিক চাহিদার বিপরীত মেহনত করতে হবে। মানুষ একবার যখন এই মেহনত করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে মহব্বতের একটি নূর পয়াদা করে দেন।

বাষ্পের চাপে রেলগাড়ি জোরে চলে

বিষয়টিকে হযরত থানভী রহ. অন্য একজায়গায় একটি উপমা দ্বারা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি রেলগাড়ির ইঞ্জিনে বাষ্প ভরা থাকে (সে যুগে

বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলতো, পেট্রোল ও ডিজেল পাওয়া যেতো না) তাহলে রেলগাড়ি খুব জোরে চলে। আর যদি গাড়িতে সবকিছু মওজুদ থাকে, চাকাও লাগানো থাকে, কিন্তু ইঞ্জিনে বাষ্প না থাকে, এমতাবস্থায় ধাক্কা লাগিয়ে ট্রেন চালাতে চাইলে সারাদিনে বড়জোর এক-দু'কিলোমিটার যেতে পারবে। পক্ষান্তরে ইঞ্জিনে বাষ্প ভরা থাকলে একদিনে চার-পাঁচশো মাইল পথ অতিক্রম করবে।

'মহব্বত' বাষ্পের মতো

হযরত বলেন, ট্রেন দ্রুত গতিতে চলার জন্য দুটি জিনিস দরকার। এক. বাষ্প, দুই. চাকা। যদি ইঞ্জিনে বাষ্প না থাকে, তাহলে শুধু চাকা দ্বারা ট্রেন জোরে চলতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বাষ্প থাকে কিন্তু চাকা না থাকে তাহলে বাষ্প এই ট্রেনকে ধ্বংস করে দেবে। ট্রেন জমিনে ধ্বসে যাবে। সুতরাং যেমন বাষ্প প্রয়োজন, তেমনি চাকাও প্রয়োজন।

হযরত থানভী রহ. বলেন, এভাবে মানুষের ভিতরের 'মহব্বত' বাষ্পের সাথে তুল্য, আর আমল চাকার সাথে তুলনীয়। এজন্য সামান্য আমল করতে হবে। পরে এই আমলের মাধ্যমে যখন মহব্বতের বাষ্প পয়দা হবে তখন দ্রুতই উন্নতি হবে এবং দ্রুততার সাথে আমল হবে।

ফ্লাইয়ের পূর্বে রানওয়েতে বিমান চলা

আজকাল উপমাটি এভাবেও বোঝা যেতে পারে যে, যেমন ধরুন বিমান হাওয়ায় ওড়ে। হাওয়ার মাঝে ভেসে ঘণ্টায় ৫০০ মাইল চলে। কিন্তু ফ্লাইয়ের পূর্বে রানওয়েতে চক্কর দেয়া লাগে। এমন কোনো বিমান নেই যা চক্কর না দিয়ে সরাসরি আকাশে ফ্লাই করে। খানিকক্ষণ তাকে রানওয়ের উপর কারের মতো চলতে হয়। এ সময়টি আমার মতো প্যাসেঞ্জারের জন্য খুবই ধৈর্যের হয়ে থাকে। কেননা যখন জাহাজ উড়াল দেয় তখন আমি আমার লেখার কাজ শুরু করে দেই। যতক্ষণ রানওয়েতে চলে ততক্ষণ কলম বন্ধ রাখতে হয়। মোটকথা, বিমান মাত্রই ফ্লাই করার আগে জমিনে কিছুক্ষণ চলে থাকে। পরে সে শূন্যে উড়ে যায়। মহব্বত পয়দা করার জন্য ঠিক এমন সামান্য মেহনত করতে হবে, সামান্য আমল করতে হবে। যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করবেন, তখন আপনার মধ্যে মহব্বতের বাষ্প পয়দা হবে এবং দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন হবে।

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করুন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসের মর্মও এই যে, যদি কোনো বেগানার প্রতি দৃষ্টি দিতে মন চায় এবং তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে স্বাদ আস্বাদন করার তীব্র চাহিদা সৃষ্টি হয়, তখন যদি আপনি আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি লক্ষ করে তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নজর হেফাজত করার কষ্ট সহ্য করেন তাহলে এর ফলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ঈমানের এমন এক স্বাদ আস্বাদন করাবেন, যার তুলনায় গোনাহের স্বাদ তুচ্ছাতিতুচ্ছ। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'বান্দা! সকাল-সন্ধ্যা আমি তোমার প্রতি কতো নেয়ামতই না বর্ষণ করে চলেছি। বিনিময়ে তোমার কাছে আমার চাওয়া এই যে, আমার খাতিরে অল্প সময়ের জন্য অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখবে। যদি তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারো তাহলে আমি তোমার কাছে ওয়াদা করছি-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ, যারা আমার রাস্তায় সামান্য চেষ্টা করবে অবশ্য অবশ্যই আমি তাদেরকে হাত ধরে আমার পথে তুলে নেবো।[১]

প্রবৃত্তি দমনে এ চিন্তা উপকারী

অতএব সামান্য কতাওবানী করতে হবে। জান্নাত এতো সস্তা নয়। আল্লাহর মহব্বতও এতো সস্তা নয়। আর সেই কতাওবানী হচ্ছে, নফসকে নাজায়েয খাহেশাত থেকে প্রতিহত করার অভ্যাস গড়া। সহজে এ কাজ করার জন্য চিন্তা করুন যে, এটা দুনিয়া, জান্নাত নয়। দুনিয়ার বড়ো থেকে বড়ো কোনো মানুষ- সে অনেক বড়ো প্রশাসক হোক, পুঁজিপতি হোক বা বিত্তশালী হোক- সে কি দাবি করতে পারে যে, দুনিয়াতে সবকিছু আমার মর্জি মতো হচ্ছে? বরং দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষের উপর তার মর্জি বিরোধী অনেক অবস্থা এসে থাকে এবং আসতে থাকবে। এ থেকে বাঁচা অসম্ভব। আজ যাদের হাতে সারা দুনিয়ার শাসনভার। যাদের কাছে বিত্ত-বৈভবের পাহাড়, নকর-চাকর, পেয়াদা-বরকন্দাজ মওজুদ, দুনিয়ার যাবতীয় উপকরণ যাদের হাতে, তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, তোমাদের মর্জির বাইরে কোনো কাজ হয়েছে কি না? অনেক সময় তাদের মনের বিরুদ্ধে এমন সব

---

১. সূরা আনকাবুত ৬৯

কাজ হয়, যা আমার আপনার বিরুদ্ধে হয় না। সুতরাং এটা তো হতে পারে না যে, আমি সবসময় খুশি থাকবো। কোনো কষ্ট-মুসীবত আমাকে স্পর্শ করবে না। কোনো দুঃখ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করবে না। কখনো আমার মনের বিরুদ্ধে কিছু হবে না। সুতরাং মনের বিরুদ্ধে নানা রকম অবস্থা আসতে থাকবে।

দু'টি পথ: খোদার পথ ও প্রবৃত্তির পথ

এখন দু'টি পথ খোলা রয়েছে। একটি পথ এই যে, নিজের মনের বিরুদ্ধে এমন পথ অবলম্বন করবে, যার পরিণতিতে আল্লাহ পাক খুশি হবেন এবং বলবেন, দেখো! আমার বান্দা আমার খাতিরে নিজের মনের চাহিদাকে পদদলিত করেছে।

দ্বিতীয় পথ হলো, নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে পুরা করতে থাকবে। সারাক্ষণ এ চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু এর ফল এই হবে যে, আপনি সারা জীবন প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করতে থাকবেন এবং আল্লাহর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবেন। যতো যাই করুন না কেন আপনার মনের বিরুদ্ধে যখন কাজ হবেই, তখন আল্লাহকে খুশি করার জন্য মনের বিরুদ্ধে কেন কাজ করবেন না?

কষ্ট সুস্বাদু হয়ে যাবে

যখন আপনি চিন্তা করবেন যে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মনের বিরুদ্ধে এ কাজ করছেন, তখন এই কষ্টও শেষ পর্যন্ত সুস্বাদু হয়ে যাবে। কারণ, যখন চিন্তা করবেন যে, আলহামদুলিল্লাহ, প্রকৃত প্রেমাস্পদের জন্য আমি আমার কু-প্রবৃত্তিকে দমন করছি, তখন মনে যেই প্রশস্ততা ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হবে এবং যেই নূর পয়দা হবে, তার সামনে দুনিয়ার হাজারো স্বাদ ও মজা কতাওবান।

ভগ্ন হৃদয়ের সাথে আল্লাহ পাক থাকেন

আল্লাহ তা'আলা চান, আমার বান্দা মাঝে মাঝে তার আত্মাকে আঘাত করুক। যেমন একটি কাজ করতে মন চাইছে, কিন্তু মনে আঘাত হেনে সেই কাজ থেকে বান্দা বিরত থাকলো। যখন আল্লাহ তা'আলার খাতিরে অন্তরে

আঘাত হানবে তখন আল্লাহ পাক বলবেন, আমি তার হৃদয়ে অবস্থান করবো। এই হৃদয়ে আমার আলো বিচ্ছুরিত হবে।

এখন আত্মা দুইভাবে ভাঙ্গতে পারে। অনিচ্ছাকৃতভাবে হৃদয় ভাঙ্গতে পারে। যেমন তার উপর কোনো মুসীবত পতিত হলো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি এদের সাথে আছি। দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, অন্তরে গোনাহের চাহিদা হচ্ছিলো, তা দমন করে নিজের হৃদয় ভেঙ্গে ফেললো। তখনও আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমার সাথে আছি।

আত্মা নূর বিকিরণের কেন্দ্র

এ কথাটি বুঝাতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বড়ো সুন্দর একটি কবিতা রচনা করেছেন-

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ

کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অর্থাৎ, তোমার আত্মা বেঁচে থাকবে এবং তার যাবতীয় কামনা-বাসনা তুমি পুরা করতে থাকবে, এমনটি করো না। কেননা যে সত্তা আত্মাকে আয়েনা বানিয়েছেন তিনিই বলছেন যে, আত্মা নামক এ আয়েনা যতো বেশি ভাঙ্গা হবে ততো বেশি আমার প্রিয় হবে। ততো বেশি আমি তার সাথী হবো। আত্মাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য বানিয়েছেন। আত্মা তাঁরই আলো বিকিরণ কেন্দ্র। এতে কারো অংশীদারিত্ব তিনি পছন্দ করেন না। খাহেশাতের কাঁচ ভেঙ্গে যখন চুরমার করা হয় কেবল তখনই তা আল্লাহ তা'আলার জন্য অবধারিত হয়।

আমি বিরান ঘরেই অবস্থান করবো

আমি একটি পংক্তি রচনা করেছিলাম। হযরত হাকীম আখতার ছাহেব রহ. তা খুব পছন্দ করে থাকেন। তাঁর মজলিসে তা পাঠ করে শুনিয়েও থাকেন। পংক্তিটি হলো-

دردِ دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا

ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا

হৃদয়-বেদনা দিয়ে তিনি বললেন,
আমি বিরান ঘরেই অবস্থান করবো।

আত্মাকে বিরান করার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার জন্য মনের কাম-বাসনাকে দলিত-মথিত করা। অন্তরে গোনাহ করার আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে, গোনাহ করার চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে, চারদিকে ছড়ানো গোনাহের উপকরণ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কিন্তু আমি আল্লাহর খাতিরে আমার আত্মাকে বিরান করছি। তাহলে আল্লাহ পাক ওই অন্তরে বসবাস শুরু করেন। তখন অন্তর আল্লাহ পাকের নূরের বিকিরণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

মহব্বত দ্বারা আনুগত্য এবং আনুগত্য দ্বারা মহব্বতের ফল

এ কথাটিই হযরত থানভী রহ. বলছেন যে, প্রথমে যখন আনুগত্যের জন্য কিছু কতাওবানী পেশ করবে, কিছুটা আগে বাড়বে এবং প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করার চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ পাক দয়া ও মায়া করে তাঁর মহব্বত দান করবেন। এটা তাঁর ওয়াদা। এরপরও মহব্বত পয়দা না হওয়া অসম্ভব। একবার মহব্বত পয়দা হয়ে গেলে পূর্বে যে কাজ কঠিন মনে হতো এখন তা সহজ মনে হবে। ফলে অতিরিক্ত আনুগত্য নসীব হবে। যখন অতিরিক্ত আনুগত্য নসীব হবে, তখন মহব্বত আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়তেই থাকবে। মহব্বত যতো বৃদ্ধি পেতে থাকবে আনুগত্যও ততো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মৃত্যু পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকবে। এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পয়গাম আসবে-

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِیْۤ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ ﴿٣٠﴾

'হে (আল্লহর ইবাদতে) প্রশান্তি লাভকারী প্রাণ! আজ তোমার পরওয়ারদেগারের দিকে ফিরে এসো, যার মহব্বতে তুমি দিনাতিপাত করেছো। আজ এসে আমার বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।[১]

এই হলো পরিণতি উপরোক্ত পরম্পরার। অর্থাৎ, আনুগত্য দ্বারা মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং মহব্বত দ্বারা সৃষ্টি হবে আনুগত্য। এই আনুগত্যের ফল

১. সূরা ফাজর ২৭-৩০

আরো মহব্বত বৃদ্ধি পাবে এবং সেই মহব্বতের ফলে বৃদ্ধি পাবে আরো আনুগত্য। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক এই মাকাম পর্যন্ত পৌছাবেন। আল্লাহ তা'আলা দয়া ও অনুগ্রহ করে আমাদেরকেও এ পথে অধিষ্ঠিত করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ আনুগত্যের সহজ পন্থা

এই আনুগত্য অর্জনের সহজ ও সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাপত্র, যা আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে মহব্বত পয়দা করা সম্পর্কে বলেছেন, তা হলো,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ

'আল্লাহ তা'আলা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনি সকল ঈমানদারকে বলুন, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করো, এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত করতে চাও তাহলে এর সহজ রাস্তা এই যে, তোমরা আমার অনুসরণ করো। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো। এর ফলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।'[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করুন, আল্লাহ তা'আলা মহব্বত করবেন

বাহ্যত বলা দরকার ছিলো যে, আল্লাহকে মহব্বত করার সহজ রাস্তা হলো, তোমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে তখন আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা হবে এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করতে শুরু করবে, কিন্তু এভাবে বলেননি। বরং বলেছেন, যদি আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করতে চাইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন। এভাবে কেন বললেন? প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তোমরা আল্লাহর সাথে মহব্বত করতে চাও কীভাবে! আল্লাহ কোথায়, আর তোমরা কোথায়! তোমাদের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ, তোমাদের সত্তা অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

---

১. আলে ইমরান ১৩

ওদিকে আল্লাহর সত্তা অবিনশ্বর ও অসীম। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত কীভাবে করবে? আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রকৃত ভালোবাসা ও তার পূর্ণতা তোমাদের কীভাবে লাভ হতে পারে? অবশ্য তোমরা যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন। পরে এই মহব্বতের প্রতিবিম্ব তোমাদের অন্তরে পড়বে। এই প্রতিবিম্বের নামই আল্লাহ তা'আলার মহব্বত।

প্রেম প্রথমে প্রেমাস্পদের অন্তরে সৃষ্টি হয়

জনৈক ফারসী কবি এ কথাটিকে নিম্নের কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন,

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود

অর্থাৎ, প্রথমে প্রেমাস্পদের অন্তরে প্রেম সৃষ্টি হয়। পরে প্রেমাস্পদের প্রেম প্রেমিকের অন্তরে প্রতিবিম্ব হয়। এভাবে প্রেমিকের অন্তরে প্রেম স্থানান্তরিত হয়। আল্লাহর মহব্বতের অবস্থাও একই রকমের। কেননা যে সত্তাকে দেখা যায় না, যার পরিপূর্ণ পরিচিতি অর্জন করা যায় না; ওই সত্তার সাথে মানুষ মহব্বত করবে কী করে? আল্লাহ পাকের সত্তা আমাদের চিন্তা ও কল্পনার বহু উর্ধ্বে। এ জন্য আল্লাহ পাক বলেন, প্রথমে আমি তোমাদেরকে মহব্বত করবো, যখন আমি মহব্বত করবো তখন আমার মহব্বতের প্রতিবিম্ব তোমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হবে এবং এরপরই তোমরা আমাকে মহব্বত করবে।

প্রতিটি কাজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ জরুরী

মোটকথা, কুরআনুল কারীম এই বাস্তবতা বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত হাসিল করার উত্তম ও সহজতর পন্থা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। প্রত্যেক কাজে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। নিজের চাল-চলন, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, সীরাত-সুরত, কর্মকাণ্ড, খানা-পিনা, লেনদেন, আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। সুন্নাতের যতো বেশি অনুসরণ করা হবে ততো বেশি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

কোনো সুন্নাতই ছোট নয়

আমাদের শাইখ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, কোনো বান্দা কোনো সুন্নাতের উপর আমল করলে, তা দেখতে যতো ছোটই হোক না কেন, ঐ বান্দা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুন্নাতই ছোট নয়। প্রতিটি সুন্নাতই অসাধারণ। যেমন আপনি মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের কথা চিন্তা করে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করলেন। মসজিদে প্রবেশ করতে মাসনুন দু'আ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পাঠ করলেন।[১] যদিও এটা ছোট একটা আমল। কিন্তু সুন্নাতের অনুসরণের উদ্দেশ্যে আপনি যখন আমলটা করবেন, তখন আপনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবেন।

তখন আপনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হলেন

আপনি বাথরুমে প্রবেশ করছেন, তখন এই নিয়তে বাম পা দিয়ে এবং প্রবেশের পূর্বের নির্ধারিত দু'আ পাঠ করে প্রবেশ করলেন যে, এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, তাহলে আপনি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হয়ে গেলেন। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় আপনি এই নিয়তে ডান পা আগে বের করলেন এবং বাইরে বেরিয়ে মাসনুন দু'আ পাঠ করলেন যে, এটা হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, তাহলে আপনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে গেলেন। কেননা আপনি আল্লাহর মাহবুবের সুন্নাতের উপর আমল করেছেন। সুতরাং আপনি যতো বেশি সুন্নাতের অনুসরণ করতে থাকবেন, ততো বেশি আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং পরিণতিতে দ্বীনের উপর আমল করা আপনার জন্য অধিকতর সহজ হতে থাকবে।

যেসব সুন্নাতে কোনো কষ্ট নেই

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনেক। জীবনের প্রত্যেক শাখায় তাঁর সুন্নাত রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু সুন্নাত এমন আছে, যা

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৫, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৭২১, সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৯৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৬৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৪৭৭, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ১৩৫৮, দু'আর অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

অবলম্বন করতে কোনো কিছু ব্যয় করতে হয় না। সময় ব্যয় করতে হয় না। অর্থ ব্যয় করতে হয় না। কষ্ট-মেহনতও করতে হয় না। শুধু খেয়াল করলেই হয়। যেমন এইমাত্র বললাম, ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা এবং বাম পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নাত। বলুন, এটুকু আমল করতে কী এমন কষ্ট হয়? কতটা সময় ব্যয় হয়? কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়? আরে ভাই! পা তো বের করতেই হবে, শুধু একটু খেয়াল করার বিষয়। খেয়াল না করার কারণে সুন্নাতের রহমত ও বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত হই। কেউ যদি প্রশ্ন করে, ডান পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া কি গোনাহ? জবাবে বলা হবে- না, গোনাহ নয়। তবে কী বাম পা দিয়ে বের হওয়া ফরয বা ওয়াজিব? না, ফরয-ওয়াজিব কোনোটাই নয়। তবে এর উপর আমল না করার কারণে বড়ো একটা রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ফলে যেই রহমত নাযিল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার যেই মহব্বত লাভ হয়, সহজ এ আমলটি না করার ফলে ঐ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এমনিভাবে ডান হাতে খানা খাওয়া, বিসমিল্লাহ বলে খানা খাওয়া, খানার শেষে শোকর আদায় করা এবং দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। এগুলো কি ফরয ওয়াজিব? না, ফরয ওয়াজিব নয়। এমনটি না করা কি গোনাহ? না, গোনাহ নয়। এমনটি না করলে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন না। তবে না করার ফলে মানুষ নিজেকে এক বিশাল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করছে, যে নিয়ামত বিনামূল্যে লাভ হচ্ছিলো।

'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সুন্নাতের ডায়েরী

সুতরাং সব মানুষই নিজের কর্ম-কাণ্ডে সমীক্ষা করে দেখবে যে, আমি কোথায় কোথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের হযরতের কিতাব 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তোমাদের জন্য আমি সুন্নাতের ডায়েরী বানিয়ে দিয়েছি। এই কিতাবকে সামনে রেখে সমীক্ষা চালাতে থাকো, কোথায় কোথায় তুমি সুন্নাতের প্রতি আমল করছো, আর কোথায় কোথায় ছেড়ে দিয়েছো। যেখানে আমল ছেড়ে দিয়েছো সেখান থেকে আমল শুরু করে দাও। এমন অনেক সুন্নাত রয়েছে, যেখানে কেবল আপনার সামান্য

মনোযোগ প্রয়োজন। তাতে কোনো মেহনত, কষ্ট, পয়সা বা সময় ব্যয় হয় না। তবে কিছু সুন্নাত এমন আছে, যা সময় ও মেহনতের দাবীদার। সামান্য মেহনত করলে সেগুলোও আদায় করা সহজ হয়ে যাবে।

যতক্ষণ বাজারে লাউ পাবে অবশ্যই কিনবে

আমাদের হযরত বলতেন, হযরত থানভী রহ. বলেন, আমি আমার বাড়িতে দেখতাম যে, দস্তরখানে লাউয়ের তরকারী থাকতো। বেশ কিছুদিন ধরে এ ধারা চলছিলো। বিবি সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লাগাতার লাউয়ের তরকারী পাকাচ্ছো যে? তিনি জবাবে বললেন, আমি একটি কিতাবে পড়েছি, লাউ হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব পছন্দ ছিলো। এজন্য বাজারকারীকে বলেছি, যতো দিন বাজারে লাউ পাওয়া যাবে, অবশ্যই কিনবে। যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য ইত্তিবা নসিব হয়। হযরত থানভী রহ. বলেন, বিবি সাহেবার এই কথা শুনে আমার শরীর কেঁপে ওঠলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাতটি না ফরয, না ওয়াজিব, বরং এটি তাঁর একটি অভ্যাস মাত্র। এই মহিলার সুন্নাতের প্রতি এতটা গুরুত্ব! আর আমরা নিজেদেরকে আলেম বলে থাকি, লোকেরা আমাদেরকে আলেম বলে জানে অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের এতটা গুরুত্ব আমাদের মধ্যে নেই।

তিন দিন পর্যন্ত নিজের কর্ম-কাণ্ডের উপর সমীক্ষা চালাই

এরপর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি গোটা জীবনের কর্ম-কাণ্ড সমীক্ষা করে দেখবো যে, কোথায় কোথায় আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সম্মুখে অগ্রসর হবো না। সুতরাং তিন দিন পর্যন্ত নিজের কর্ম-কাণ্ডের উপর সমীক্ষা চালাতে থাকি। দেখলাম, কোথায় কোথায় সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত। পরে আল্লাহ পাকের ফযল ও করমে আমলের পথ স্পষ্ট হয়ে গেলো এবং যে সকল সুন্নাত ছুটে গেছিলো আল্লাহ সেগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। মোটকথা, এই ইত্তেবায়ে সুন্নাত এমন এক জিনিস, আপনি এর দিকে যতো অধিক পরিমাণে অগ্রসর হবেন, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ততো বেশি বদ্ধমূল হবে।

এ সব তিরস্কার গলার হার

অনেক সময় মানুষ যখন সুন্নাতের প্রতি অগ্রসর হয় তখন তাদেরকে তিরস্কার করা হয়। অনেক সময় তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করা হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়। এ ধরনের ভর্ৎসনার দরুণ অনেকে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ কুরআনুল কারীম এদের প্রশংসা করে বলেছে-

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

অর্থাৎ, এরা আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করে, কোনোও তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করে না।[1] দুনিয়াবাসী যা ইচ্ছা বলুক। চাইলে ওরা আমাদেরকে 'পশ্চাদপদ' বলুক, 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলুক, অজ্ঞ মুসলিম বলুক। আরে এ সব তিরস্কার তো আল্লাহর পথিকদের গলার হার। এ সব তিরস্কার তো নবীগণকে করা হয়েছে। তাদেরকে 'বেওকুফ' বলা হয়েছে। নবীদের অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে-

اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ

অর্থাৎ, আমরাও কি তেমনি ঈমান আনবো যেমন এই বেওকুফরা ঈমান এনেছে?[2]

এই ভর্ৎসনা নবীরাও পেয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের ভাগ্যেও জুটেছে। তাঁদেরকে 'পাগল' বলা হয়েছে, 'পথভ্রষ্ট' বলা হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় যখন এ ধরনের ভর্ৎসনা আসে, প্রকৃতপক্ষে তা 'পদক' ও সম্মাননা হয়ে থাকে। দুনিয়াদারদের মুখ কতক্ষণ আটকিয়ে রাখবে? কতক্ষণ তাদের পরোয়া করবে?

কিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ কাফেরদের লক্ষ্য করে হাসবে

সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করলে এ সব তিরস্কারের পরোয়া করো না। কোমর বেঁধে তৈরি হও। ভাবো, এ সব ভর্ৎসনা ও তিরস্কার আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা। তবে কুরআন বলছে যে,

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ

---

১. সূরা মায়েদা, আয়াত-৩৫

২. সূরা বাকারা, আয়াত-১৩

'আজ সময় এসেছে ঈমানদারদের ওই কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে হাসার।'[১]

আসবে সে সময়। কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে চাও তাহলে দুনিয়াদারদের ভর্ৎসনার পরোয়া করো না।

جسکو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائیں کیوں

যার কাছে নিজের মন-প্রাণ অধিক প্রিয় সে তাঁর গলিতে যাবে কেন? এ রাস্তায় যখন এসেছো তখন তিরস্কার সইতে হবে। আল্লাহ তাঁর ফযল ও করমে আমাদেকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. সূরা তাতফীফ, আয়াত-৩৪

আল্লাহর নিকট আল্লাহর ভালোবাসা প্রার্থনা করুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ!

গত কয়েক দিন ধরে আল্লাহ পাকের মহব্বত ও তার উপকরণ নিয়ে আলোচনা চলছিলো। এই মালফূযে হযরত থানভী রহ. মহব্বত হাসিল করার পাঁচটি উপকরণ বর্ণনা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার মধ্যে চারটির বিস্তারিত বর্ণনা শেষ হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সামনে পঞ্চম উপকরণ বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে। এর দুটি অর্থ হতে পারে।

এক. যেটি গতকাল বলেছি যে, আল্লাহর কাছে কিছু না কিছু চাইতে থাকো। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে মনে মনে চাও।

দুই. 'মহব্বতও তাঁর কাছেই চাও।' বলো, হে আল্লাহ! আমরা আপনার মহব্বতের মুখাপেক্ষী। আপনিই আমাদেরকে আপনার মহব্বত দান করুন। সুতরাং হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দু'আ করেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত কামনা করছি। আমার অন্তরে আপনার মহব্বত পয়দা করে দিন। যার মহব্বত আপনার নিকট আমাকে উপকার পৌছায় তার মহব্বতও দান করুন।'[১]

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮৬-১৯৬, যোহরের নামাযের পর রমাযানুল মোবারক, জামে মসজিদ, দারুল উলূম, করাচী

অপর একটি দু'আয় তিনি বলেন-

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত আমাকে দুনিয়ার সব জিনিসের চেয়ে প্রিয় বানিয়ে দিন।'[২]

এই তিন জিনিসের চেয়ে অধিক আল্লাহর মহব্বত চাই

অপর একটি দু'আয় তিনি ইরশাদ করেন-

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় করে দিন। আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে প্রিয় করে দিন। ঠাণ্ডা পানির চেয়ে প্রিয় করে দিন।'[৩]

ঠাণ্ডা পানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুবই প্রিয় ছিলো

এর দ্বারা ঠাণ্ডা পানির প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ ও মহব্বত ফুটে ওঠে। ঠাণ্ডা পানি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতোটাই প্রিয় ছিলো যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরের 'বীরে গরস' থেকে তাঁর জন্য পানি আনা হতো। অন্য কোনো জিনিসের ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ নেই যে, অমুক খাবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয় ছিলো এবং তা অন্য স্থান থেকে আনা হতো। শুধুমাত্র পানির ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, 'বীরে গরস' থেকে তাঁর জন্য পানি আনা হতো। কারণ, ঐ কূপের পানি অন্য কূপের পানির তুলনায় ঠাণ্ডা ছিলো এবং সম্ভবত তা খুব মিষ্টিও ছিলো। সুতরাং তিনি মৃত্যুর আগে ওসীয়তও করে যান যে, আমাকে যেন এই 'বীরে গরস'-এর পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়। সুতরাং ঐ কূপের পানি দ্বারাই তাঁকে গোসল দেওয়া হয়েছিলো।[৪]

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪১২
২. হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৮২, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, খণ্ড-৩৮, পৃষ্ঠা-১৪
৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪১২
৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৪৫৭

ঠাণ্ডা পানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতো পছন্দনীয় ছিলো, তাই তিনি দু'আর মধ্যে বলছেন, হে আল্লাহ! আপনার সত্তাকে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় করে দিন। আমার পরিবার-পরিজনের চেয়েও প্রিয় করে দিন। ঠাণ্ডা পানির চেয়েও প্রিয় করে দিন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে মহব্বত কামনা করুন যে, হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত দান করুন এবং আপনার মহব্বতকে সকল মহব্বতের উপর প্রবল করে দিন।

থলি ও পেয়ালা তাঁর কাছেই চান

আমার ওয়ালেদ ছাহেব ঘটনা শোনাতেন যে, একবার হযরত থানভী রহ. তাঁর মজলিসে এ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন যে, সব কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়া উচিৎ। কেননা তাঁর দানে কমতি নেই।

হযরত বলেন, চাওয়ায় ঘাটতি থেকে যায়, নয়তো মানুষ যদি চায় তাহলে আল্লাহর দেওয়ার কোনো কমতি নেই। আল্লাহর সামনে থলি পাতার লোক দরকার। আল্লাহ পাক থলি ভরেই ফেরত দিবেন। হযরত মাজযূব ছাহেব রহ. প্রশ্ন করেন, হযরত! কারো কাছে যদি থলিই না থাকে, সে কী পাতবে? হযরত বলেন, থলিও তাঁর কাছেই চাও। বলো, হে আল্লাহ! আমার থলিও নেই। দয়া করে আমাকে থলি দান করুন। আমি চাইতে জানি না, আমাকে চাওয়ার যোগ্যতাও দান করুন।

চাওয়ার পদ্ধতিও তাঁর কাছেই চান

সুতরাং এক দু'আয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে চেয়েছেন যে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَسْئَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ الْاِجَابَةِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তমভাবে চাওয়ার পদ্ধতি কামনা করছি। অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে উত্তমভাবে চাইবো। ভালো সব বিষয় কামনা করবো। হে আল্লাহ! আপনার কাছে ভালো দু'আ করার তাওফীক কামনা করছি এবং তা যেন ভালোভাবে কবুল হয় এ কামনাও করছি।[1]

---

১. হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এ দু'আ বর্ণিত হয়েছে। আরো বিস্তারিতভাবেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু خَيْرَ الْاِجَابَةِ এ দু'আতে পাইনি। দু'আটির শব্দমালা এই- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ মাজমাউয যাওয়ায়েদ

সুতরাং ঝুলিও তাঁর কাছেই চান।

তাঁর কাছেই ভালো দু'আ করার তাওফীক কামনা করুন

আপনি যখন দু'আ কবুলের বিশেষ সময় বা স্থান পাবেন, যেখানে দু'আ কবুলের অধিক আশা করা যায়; যেমন ইফতারের সময়, সাহারীর সময়, তাহাজ্জুদের সময়, জুমুআর দিন, বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতি পয়লা নজরের সময় কিংবা তাওয়াফ করার সময়। এ সব জায়গায় দু'আ করার পূর্বে এভাবে চান, হে আল্লাহ! আমাকে ভালো দু'আর তাওফীক দান করুন। অর্থাৎ, আমি যেন এমন দু'আ করি, যা আমার দ্বীন-দুনিয়ার জন্য উপকারী হয়। হে আল্লাহ! আমার সেই দু'আ যেন কবুলও করুন। সুতরাং দু'আ কবুলের স্থানে দু'আ করার তাওফীকও তাঁর কাছেই চান।

বাইতুল্লাহর প্রতি পয়লা নজরের দু'আ

মানুষ প্রথম যখন বাইতুল্লাহ শরীফের উপর দৃষ্টিপাত করে তখন তার বুঝে আসে না যে, এ সুবর্ণ মুহূর্তে কী দু'আ করবে? আল্লাহর বান্দাদের এ সময় বিস্ময়কর সব অনুভূতি জাগে। ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, এ সময় কি দু'আ করবো? ইমাম ছাহেব বললেন, মিত্র! এই দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে 'মুসতাজাবুদ দাওয়াত' বানিয়ে দিন। আমার সারা জীবনের সব দু'আই যেন কবুল হয়। আল্লাহ তা'আলা ইমাম ছাহেবের মনে এই দু'আ ঢেলে দিয়েছিলেন।

মোটকথা, চাওয়াও একটি বিদ্যা, একটি শাস্ত্র, যা সকলেই পারে না। আমার যখন হারামাইনে (মক্কা-মদীনায়) যাওয়া হলো এবং বাইতুল্লাহ শরীফের উপর নজর পড়লো, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার বুঝে আসছে না যে আমি কি দু'আ করবো। হে আল্লাহ! আপনার নিকট যে দু'আ আমার পক্ষে উত্তম তা আমার হৃদয়ে ঢেলে দিন এবং সেভাবে দু'আ করার তাওফীক দান করুন।

এ বিষয়টিই হযরতের কথায় ফুটে উঠেছে যে, ঝুলিও তাঁর কাছেই চাও। এভাবে মহব্বতও তাঁর কাছেই কামনা করুন যে, হে আল্লাহ! আপনার

ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২৭, আলমু'জামুল কাবীর লিত তবরানী, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৪৩, আলমুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং ১৯১১, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৮, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৮২০, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৪, জামিউল আহাদীস, হাদীস নং ৪৯৩৭, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৬৪, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫২৫

মহব্বত আমার অন্তরে পয়দা করে দিন এবং এই মহব্বতকে সকল মহব্বতের ওপর প্রবল করে দিন।

মহব্বত লাভের উপায়সমূহের সারকথা

মোটকথা, হযরত থানভী রহ. মহব্বত লাভের মোট ছয়টি উপায় বলেছেন।

১. অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করা।

২. আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করা।

৩. নিজের কর্মকাণ্ড আচরণ ও বাস্তবতাকে চিন্তা করা।

৪. কোনো আল্লাহ ওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

৫. নিয়মিত ইবাদত করা।

৬. আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

এ ছয়টি জিনিস দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয় এবং তাঁর মহব্বত অন্তরে পরিপক্ক হয়। আল্লাহ তাঁর ফযল ও করমে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

মহব্বতের বিশেষ কোনো স্তর কামনা করো না

এরপর হযরত থানভী রহ.-এর মুজাদ্দিদসুলভ কথা শুনুন। তিনি বলেন,

এ সব উপায় ও ব্যবস্থাপনায় কোনো ভুল নেই, তবে শুধুমাত্র একটি ইলমী ভুলের আশংকা রয়েছে, যে বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। তা এই যে, নিজের থেকে মহব্বতের কোনো স্তর নির্ধারণ করে তা লাভের অপেক্ষায় থাকা অবশ্য ভুল।[১]

অর্থাৎ, মহব্বত পয়দা করার বিষয়ে যে সব কথা এবং যেসব উপকরণ বলা হয়েছে এতে কোনো ভুল নেই। এগুলো ইনশা আল্লাহ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, নির্ভযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ। ইনশা আল্লাহ, এর দ্বারাই মহব্বত পয়দা হবে। কিন্তু ভুল এভাবে হয় যে, মহব্বতের বিশেষ কোনো স্তর ঠিক করে মানুষ অপেক্ষমান থাকে যে, আমার মহব্বতের ঐ স্তর হাসিল হতে হবে। যেমন মনে মনে এই পরিকল্পনা এঁকে বসলো যে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর মহব্বতের যেই স্তর লাভ হয়েছিলো, আমার তা লাভ হোক। কিংবা

---

১. আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা-১৯৪

হযরত উয়াইস করনী রহ.-এর যেই ভালোবাসা লাভ হয়েছিলো, আমারও তা লাভ হোক। হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর যেই মহব্বত লাভ হয়েছিলো, তা আমারও লাভ হোক। মোটকথা, মহব্বতের একটি স্তর নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, আমারও মহব্বতের এই স্তর লাভ হতে হবে এবং সেই স্তর লাভের প্রতীক্ষায় থাকা ভুল। কারণ, পরে যখন সেই স্তর লাভ হয় না, তখন এই লোক হয় আল্লাহ পাকের নাশোকরী করে, না হয় মহব্বত লাভের উপকরণসমূহ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে, আর না হয় হতাশার শিকার হয়।

পাত্র মোতাবেক মহব্বত দেওয়া হয়

এ জন্য কোন স্তরের 'মহব্বত' আপনি অর্জন করবেন, সে ফয়সালা করার অধিকার আপনার নেই। আপনাকে কোন স্তরের মহব্বত দান করবেন তা তিনিই ফয়সালা করবেন যিনি মহব্বত দান করবেন। যে স্তরের মহব্বত আপনাকে দেওয়া হবে, তাই আপনার জন্য উপকারীও বটে।

পাত্র হিসেবে বস্তু দেওয়া হয়। আপনার পাত্র যতোটুকু, ততোটুকু মহব্বতই আপনি পাবেন। মহব্বতের বিশেষ কোনো স্তর নির্ধারণ করে আপনি বলবেন যে, এই স্তরের মহব্বত আমাকে পেতে হবে, এ অধিকার আপনার নেই। তবে মহব্বতের যেই স্তর আপনি লাভ করবেন তা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ। তবে শর্ত হলো, এসব তদবীরের উপর আমল করতে হবে।

অকৃতজ্ঞতা ও হতাশার শিকার হয়ে পড়বেন

কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো, একদিকে আমরা বুযুর্গদের বাতানো তদবীরসমূহের উপর আমল শুরু করে দেই, আর অপর দিকে নিজের জন্য কোনো একটি উঁচু স্তর সাব্যস্ত করে নেই যে, এটি আমার গন্তব্য। এই গন্তব্যে আমাকে পৌছতে হবে। সে সব তদবীরের উপর আমল শুরু করার পর যখন সেই গন্তব্য অনেক দূরে দৃষ্টিগোচর হয়, তখন এ যাবত যাকিছু হাসিল হয়েছে তার অবমূল্যায়ন ও না-শোকরী করতে আরম্ভ করি এবং কাঙ্খিত গন্তব্য লাভ না হওয়ার ফলে হতাশার শিকার হয়ে পড়ি। ফলে এক সময় সে সব উপকরণের উপর আমল করা ছেড়ে দেই। এজন্য হযরত থানভী রহ. বলছেন যে, নিজের পক্ষ থেকে কোনো স্তর নির্ধারণ করো না।

উপকরণ শুদ্ধ হলে ইনশাআল্লাহ ফল অবশ্যই লাভ হবে। আপনি যেই স্তর নির্ধারণ করেছেন সেই স্তর হয় তো লাভ হবে না। তবে আপনার জন্য যতোটুকু উপকারী তা অবশ্যই লাভ হবে। জনৈক কবি বড়ো চমৎকার বলেছেন,

بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

হে মন! সিরাতে মুস্তাকীমে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বিপথগামী হয় না।

যখন এই পথে এসে গেছেন তখন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কামিয়াব হবেন। সুতরাং এদিক সেদিক দেখার দরকার নেই। যা কিছু আপনি পেয়েছেন এর উপর শোকর আদায় করুন এবং তদবীর চালিয়ে যান। এটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।

আমার পানপাত্রে আমার উপযুক্ত মদিরাই রয়েছে

আমাদের শাইখ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ. একটি বিস্ময়কর কবিতা রচনা করেন। বক্ষমান আলোচনা সামনে না থাকলে অন্য কেউ এ কবিতার মর্মই বুঝতে সক্ষম হবে না। তিনি বলেন-

مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ے

میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

অর্থাৎ, অন্যরা কী পেয়েছে আর কী পায়নি, তা দিয়ে আমার দরকার কী। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দান করেছেন তাই আমার জন্য উপযুক্ত এবং তাই আমার লাভ হয়েছে।

সুতরাং নিজের জন্য কোনো স্তর সাব্যস্ত করা, পরে অপ্রাপ্তির দরুন অভিযোগ করা, নিরাশ হওয়া এ সবই ভুল। তদবীর যখন বিশুদ্ধ তখন তার ফল অবশ্যই প্রকাশ পাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ।

একটি চিঠি ও হযরতের জবাব

একবার আমি হযরতকে চিঠি লিখি যে, অমুক অমুক কাজ আমার দ্বারা হয় না। যে লোকের দ্বারা এতোটুকু কাজও হয় না সে দুনিয়াতে আর কী কাজ করবে? হযরত আমার শেষের লাইনটির নিচে দাগ টেনে এর সামনে জবাব লেখেন যে,

'নিজের সত্তা সম্পর্কে কি উচ্চাঙ্গ বিষয়ের আশাবাদী?'

অর্থাৎ তোমার এ কথা যে, যার দ্বারা এতোটুকু কাজও হয় না, তার দ্বারা আর কি কাজ হবে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, তুমি নিজের ব্যাপারে বড়ো বড়ো কাজের প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছো যে, আমি খুব উঁচু স্তরের মানুষ। কাজেই আমার দ্বারা এমন উঁচু স্তরের কাজ হওয়া উচিৎ। সে সব যেহেতু হচ্ছে না, তাই হতাশা হচ্ছে।

মূলত এই জবাব দ্বারা তিনি সতর্ক করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে মনে এ ধরনের চিন্তা জাগার কারণ অহংকার। অর্থাৎ, নিজের জন্য উচ্চাঙ্গের সব বিষয় সাব্যস্ত করে রেখেছো, সেগুলো যখন হচ্ছে না, তখন হতাশ হচ্ছো। এর উৎস অহংকার।

সারকথা!

সারকথা এই যে, মহব্বত অর্জনের উল্লিখিত উপায়-উপকরণের উপর আমল করুন এবং নিজের জন্য 'মহব্বতের' কোনো স্তর নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকুন যে, আমাকে মহব্বতের অমুক স্তরে পৌছতে হবে। এই তদবীরের পরিণতিতে 'মহব্বত'-এর যেই স্তর লাভ হবে, সেটাই আপনার জন্য কল্যাণকর। আপনি তারই হকদার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

নফসের সংঘাত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّـئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

'এবং যেসব লোক আমার জন্য চেষ্টা করবে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পৌছিয়ে দেবো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।'[১]

আল্লামা নববী রহ. সম্মুখে একটি নতুন অধ্যায় বগেছেন-

بَابٌ فِي الْمُجَاهَدَةِ

'মুজাহাদা'র শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। 'জিহাদ' শব্দটিও এ থেকে উদগত। কারণ আরবী ভাষায় 'জিহাদ' শব্দের (সরাসরি) অর্থ লড়াই করা নয়, বরং পরিশ্রম করা, চেষ্টা করা। 'মুজাহাদা' শব্দের অর্থও চেষ্টা করা। কুরআন, সুন্নাহ ও সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় নিজের আমল-আখলাক সঠিক করা, গোনাহ থেকে বাঁচা এবং নফসকে ভুল পথে যাওয়া থেকে

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৬-২৪৩, ১০ই মে ১৯৯১, জুমাবার, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা আনকাবুত, আয়াত-৬৯

বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করাকে 'মুজাহাদা' বলা হয়। হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

'প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।'[১]

রণাঙ্গনে শত্রুর সাথে লড়াই করাও জিহাদ। কিন্তু প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের সাথে এভাবে জিহাদ করে যে, নফসের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা একদিকে আহ্বান করছে আর সে সেগুলোকে পদদলিত করে অন্য পথ অবলম্বন করছে, এর নাম মুজাহাদা। তাই যে কোনো ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে চাইবে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইবে, তাকেই মুজাহাদা করতে হবে। অর্থাৎ, চেষ্টা-পরিশ্রম করে নিজের নফসের চাহিদা ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং কষ্ট করে আমল করতে হবে। যে কোনোভাবে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন ও নিষ্পেষিত করে তার বিরুদ্ধে কাজ করার নাম 'মুজাহাদা'।

মানুষের নফস স্বাদে অভ্যস্থ

যেই শক্তি মানুষকে কোনো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাকে নফস বলা হয়। আমাদের নফস জাগতিক স্বাদে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। এ কারণে যে কাজে সে বাহ্যিক স্বাদ উপভোগ করে, সেদিকে সে দৌড়ায়। ভোগ-বিলাসিতার দিকে মানুষকে ধাবিত করা তার স্বভাব। সে মানুষকে বলে যে, এ কাজটি করো তাহলে মজা পাবে, এ কাজটি করো তাহলে স্বাদ পাবে। এজন্য নফস মানুষের অন্তরে কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় মানুষ যদি নিজের নফসকে বল্গাহীন ছেড়ে দেয়, স্বাদ উপভোগের যে কোনো চাহিদার উপর আমল করতে থাকে এবং নফসের সব কথা মানতে থাকে তাহলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুতে পরিণত হয়ে যায়।

প্রবৃত্তির চাহিদার মধ্যে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি নেই

প্রবৃত্তির চাহিদা এমন যে, তার আনুগত্য করতে থাকলে, তার অনুসরণ করতে থাকলে এবং তার কথা মানতে থাকলে কোনো পর্যায়ে গিয়ে তৃপ্তি ও

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৪৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৮৩৩

স্থিরতা লাভ হবে না। মানুষের প্রবৃত্তি কখনো বলবে না যে, আমার সব চাহিদা পূরণ হয়েছে এখন আর কোনো চাহিদা নেই। এটা সারাজীবনে কখনো হবে না। কারণ, কোনো মানুষের সমস্ত চাহিদা ইহজীবনে পুরা হতে পারে না। এর মাধ্যমে কখনোই তৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ হবে না। কোনো মানুষ যদি চায় যে, আমি নফসের সব চাহিদার উপর কাজ করবো, সব বাসনা পুরা করবো তাহলে কখনোই ঐ ব্যক্তির তৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ হবে না। কারণ নফসের বৈশিষ্ট্য হলো, একবার স্বাদ ভোগ করার পর, একটা মজা হাসিল করার পর সাথে সাথে আরেক স্বাদের দিকে অগ্রসর হয়। এজন্য আপনি যদি চান নফসের চাহিদার পিছনে চলে শান্তি অর্জন করবেন তাহলে সারাজীবনে কখনো শান্তি লাভ করতে পারবেন না। পরীক্ষা করে দেখুন।

স্বাদ ও ভোগের কোনো সীমা নেই

বর্তমানে যাদেরকে উন্নত জাতি বলা হয় তারা এ কথাই বলেছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাবে না। যার মনে যা চায় তাকে তা করতে দাও। যে কাজে যার মজা লাগে তাকে তা করতে দাও। তাকে বাধা দিও না। তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করো না, তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। তাই দেখুন, আজ মানুষের ভোগ বিলাসিতায় ও স্বাদ উপভোগে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। না আইনগত বাধা, না ধর্মীয় বাধা, না নীতি-নৈতিকতার বাধা, না সামাজিক বাধা- কোনো প্রকার বাধা নেই। প্রত্যেকে যার যার মর্জি মতো কাজ করছে। কিন্তু তাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে কি? ইহজগত থেকে যেই পরিমাণ স্বাদ উপভোগ করার ইচ্ছা তোমাদের ছিলো সেই ভোগের শেষ গন্তব্য এবং সেই উপভোগের শেষ স্তর তোমাদের লাভ হয়েছে কি, যার পর তোমাদের আর কিছু চাওয়ার নেই? কোনো ব্যক্তিই এ প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' দ্বারা দিবে না। বরং প্রত্যেকেই বলবে যে, আমার আরো লাভ হোক, আমি আরো পেতে চাই, আমি আরো সম্মুখে অগ্রসর হতে চাই। কারণ, এক চাহিদা আরেক চাহিদাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

পাশ্চাত্যে প্রকাশ্যে ব্যভিচারের ঢল

পাশ্চাত্য সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পরে জৈবিক চাহিদা পুরা করতে চাইলে কোনো বাধা নেই। কেউ ঠেকাবে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন এক সময় আসবে, যখন ব্যভিচার এতো ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, দুনিয়াতে সবচে' নেককার ব্যক্তি সে হবে, চৌরাস্তার মোড়ে দুই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে যে বলবে গাছের আড়ালে গিয়ে করো। সে তাদেকে ব্যভিচার করতে নিষেধ করবে না। বলবে না যে, এটা মন্দ কাজ। বরং সে বলবে যে, সবার সম্মুখে না করে গাছের আড়ালে গিয়ে করো। এ ব্যক্তি হবে সবচে' নেককার।[১]

আজ সেই যুগ প্রায় চলে এসেছে। কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া খোলামেলাভাবে ব্যভিচার হচ্ছে।

আমেরিকায় ধর্ষণের আধিক্য কেন

আমেরিকাতে কোনো ব্যক্তি যদি তার জৈবিক চাহিদা পুরা করার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার জন্য সব দরজা উন্মুক্ত। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে এ কাজ করতে সেখানে কোনো বাধা নেই। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছা মতো এ চাহিদা পুরা করতে পারে। এতদসত্ত্বেও ধর্ষণের যতো ঘটনা আমেরিকায় ঘটে পৃথিবীর অন্য কোথাও তা ঘটে না। এর কারণ কী? এর কারণ এই যে, সম্মতিক্রমে ব্যভিচার করে এবং তার স্বাদ ভোগ করে দেখেছে, কিন্তু প্রশান্তি লাভ হয়নি। তাই জোরপূর্বক ব্যভিচার করার আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে, যাতে করে ধর্ষণের স্বাদও উপভোগ করতে পারে। তাই মানুষের এ চাহিদা কোনো পর্যায়ে গিয়ে ক্ষ্যান্ত হয় না, বরং আরো অগ্রসর হতে থাকে। এ কামনার অন্ত নেই।

এ পিপাসা নিবারিত হওয়ার নয়

আপনারা 'গো-ক্ষুধা' নামে এক ব্যাধির কথা শুনেছেন। সেই ব্যাধির বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে কেবলই ক্ষুধা লেগে থাকে। যা মন চায় খাও, যতো মন চায় খাও, কিন্তু ক্ষুধা মেটে না। এমন আরেকটি ব্যাধি রয়েছে যাকে 'ইসতিসকা' বলে। এ রোগে মানুষের কেবলই পিপাসা লেগে থাকে। কলসের পর কলস পান করলেও এমনকি কুপের সব পানি পান করলেও পিপাসা নিবারিত হয় না। মানুষের কামনা-বাসনার অবস্থাও একই। তা যদি নিয়ন্ত্রণ

---

১. কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৮৮৮৬, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩৪৫, তারীখে দামেশক, খণ্ড-৬৪, পৃষ্ঠা-২৬৮

করা না হয়, আয়ত্তে রাখা না হয়, শরীয়ত ও নীতি চরিত্রের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা না হয় তাহলে 'ইসতিসকা' রোগীর ন্যায় ভোগ-উপভোগের কোনো পর্যায়ে গিয়েই স্থিরতা লাভ হয় না। এ কামনা শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

সামান্য কষ্ট সহ্য করুন

এ কারণে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, প্রবৃত্তির কামনার অনুগামী হয়ো না, তার পিছনে পড়ো না। কারণ, তা তোমাকে ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষেপ করবে। তাকে সামান্য নিয়ন্ত্রণে রাখো, তাকে শরীয়তের যৌক্তিক সীমার মধ্যে রাখো। তাকে সীমার মধ্যে রাখতে গেলে প্রথম প্রথম প্রবৃত্তি তোমাকে কষ্ট দিবে, উত্ত্যক্ত করবে, ব্যথা হবে, বেদনা হবে। একটি কাজ করতে মনে চাহিদা জাগছে কিন্তু আপনি তাকে থামিয়ে রাখছেন। উদাহরণস্বরূপ, মন চাচ্ছে টিভি দেখবে, টিভির খারাপ খারাপ ফিল্ম দেখবে। এখন যে ব্যক্তি এতে অভ্যস্থ তাকে যদি বলা হয় যে, এটা দেখো না, প্রবৃত্তির এ চাহিদা অনুপাতে কাজ করো না। এখন সে যদি তা না দেখে চোখকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে প্রথম প্রথম তার কষ্ট হবে, খারাপ লাগবে। কারণ সে দেখতে অভ্যস্থ। না দেখলে শান্তি পায় না, মজা পায় না।

প্রবৃত্তি দুর্বলের জন্য সিংহের ন্যায়

আল্লাহ তা'আলা প্রবৃত্তির মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যও রেখেছেন যে, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি একবার দৃঢ়তা দেখায় যে, যতো কষ্টই হোক, আত্মা ফেটে চৌচির হোক তবুও এ কাজ আমি করবো না, তাহলে প্রবৃত্তির চাহিদা আপনা-আপনি শিথিল হতে আরম্ভ করবে। নফস ও শয়তান দুর্বলের জন্য সিংহের মতো সবল। যে ব্যক্তি তার সামনে ভেজা বিড়াল হয়ে থাকবে, তার চাহিদা অনুপাতে চলবে, প্রবৃত্তি তার উপর প্রবল হবে এবং আধিপত্য বিস্তার করবে। আর যে ব্যক্তি একবার পোক্ত সংকল্প করে তার সামনে অটল হয়ে দাঁড়াবে এবং সিদ্ধান্ত নিবে যে, যতো চাহিদাই সৃষ্টি হোক, আত্মা যতো ক্লীষ্টই হোক, এ কাজ করবো না, তখন প্রবৃত্তি নরম হয়ে যাবে। এ কাজ না করার ফলে প্রথম দিন যে পরিমাণ কষ্ট হয়েছিলো, দ্বিতীয় দিন তার চেয়ে কম কষ্ট হবে, তৃতীয় দিন আরো কম কষ্ট হবে। ক্রমান্বয়ে একদিন এ কষ্ট মোটেই থাকবে না। প্রবৃত্তি এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রবৃত্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়

আল্লামা বুসীরী রহ. অনেক বড়ো বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর রচিত 'কাসীদায়ে বুরদাহ' অত্যধিক প্রসিদ্ধ। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে প্রশস্তিমূলক একটি কাসিদা। তাতে তিনি বিরল বিস্ময়কর এক প্রজ্ঞাপূর্ণ শের বলেছেন,

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى

حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

অর্থাৎ, মানব-প্রবৃত্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়, যা দুধ পান করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাকে দুধ ছাড়াতে চেষ্টা করলে সে কাঁদবে, চিৎকার করবে, হৈ চৈ করবে। এখন মা-বাবা যদি চিন্তা করে যে, দুধ ছাড়াতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই তাকে ছেড়ে দাও, সে দুধ পান করতে থাকুক। তাহলে সে যুবক হয়ে যাবে কিন্তু দুধ ছাড়ানো যাবে না। কারণ, তুমি তার কষ্ট, চিৎকার ও আহাজারিতে ভয় পেয়ে গেছো। যার ফলে দুধ ছাড়াতে পারোনি। এখন যদি তার সামনে রুটি এনে দেওয়া হয় তাহলে সে বলবে আমি তো রুটি খাবো না। আমি তো দুধই পান করবো। কিন্তু দুনিয়াতে এমন কোন মা-বাবা পাওয়া যাবে না, যে বলবে যে, দুধ ছাড়াতে যেহেতু বাচ্চার কষ্ট হচ্ছে তাই দুধ ছাড়াবো না। মা-বাবা জানে দুধ ছাড়ালে কাঁদবে, চিৎকার করবে, রাতে ঘুম আসবে না, নিজেও জেগে থাকবে, আমাদেরকেও জাগ্রত রাখবে, কিন্তু তার পরেও দুধ ছাড়ায়। কারণ তারা জানে এতেই সন্তানের কল্যাণ। আর যদি তাকে দুধ ছাড়ানো না হয় তাহলে সারা জীবনেও সে রুটি খাওয়ার উপযুক্ত হবে না।

প্রবৃত্তির গোনাহের স্বাদ লেগেছে

আল্লামা বুসীরী রহ. বলেন, মানুষের প্রবৃত্তিও শিশুর ন্যায়। তার মুখে গোনাহের স্বাদ লেগে আছে, মজা লেগে আছে। তুমি যদি তাকে এভাবেই ছেড়ে দাও যে, সে গোনাহ করতে থাকুক। গোনাহ ছাড়ালে কষ্ট হবে। নিষিদ্ধ জায়গায় দৃষ্টি পড়ে, চোখ সরাতে খুব কষ্ট হয়। জিহ্বা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মিথ্যা বলা ছাড়ালে খুব কষ্ট হবে, যন্ত্রণা হবে। প্রবৃত্তি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঘুষ নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুদ খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আরো অনেক গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ রক্ষা করুন।

এসব অভ্যাস ছাড়াতে প্রবৃত্তির কষ্ট হচ্ছে। নফসের এই কষ্টে ঘাবড়ে গিয়ে এবং ভয় পেয়ে যদি হাত গুটিয়ে বসে যায় তাহলে এর ফল এই হবে যে, সারা জীবনেও গোনাহ ছুটবে না এবং শান্তি ও স্থিরতা লাভ হবে না।

আল্লাহর যিকিরে শান্তি রয়েছে

মনে রাখবেন, আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা নেই। সারা পৃথিবীর সমস্ত উপাদান ও উপকরণ একত্রে করেও শান্তি লাভ হচ্ছে না, স্থিরতা লাভ হচ্ছে না। আমি এই মাত্র আপনাদের সামনে পশ্চিমা সমাজের দৃষ্টান্ত দিয়েছি যে, সেখানে টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি, উন্নত মানের শিক্ষাব্যবস্থা, ভোগ-উপভোগের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা ভোগ করো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হচ্ছে। কেন? কারণ, অন্তরে প্রশান্তি নেই। কেন নেই? কারণ, গোনাহের মধ্যে প্রশান্তি খুঁজে ফিরছে। মনে রাখবেন! গোনাহ, নাফরমানি ও অবাধ্যতার মধ্যে শান্তি নেই। শান্তি তো কেবল এক জিনিসের মধ্যেই, আর তা হলো-

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'আল্লাহর স্মরণে শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে।'[১]

এজন্য নাফরমানি করতে থাকবে আর শান্তি লাভ হবে এটা আত্মপ্রবঞ্চনা। মনে রাখবেন সারা জীবনেও তা লাভ হবে না। ছটফট করতে করতে ইহজগত ত্যাগ করবে, কিন্তু গোনাহের কাজ না ছাড়লে শান্তির গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা শান্তি তাদেরকে দান করেন যাদের অন্তরে তাঁর মহব্বত রয়েছে, যাদের অন্তরে তাঁর স্মরণ রয়েছে, যাদের আত্মা তাঁর যিকিরে পল্লবিত। তাদের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি দেখুন। বাহ্যিকভাবে তারা দুরাবস্থাগ্রস্থ, অভাবের মধ্যে আছে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতার নেয়ামত রয়েছে। তাই জাগতিক প্রশান্তি লাভ করতে চাইলেও নাফরমানি ও গোনাহের কাজ ছাড়তে হবে। গোনাহের কাজ ছাড়ার জন্য কিছুটা মুজাহাদা করতে হবে। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কিছুটা দৃঢ়তা দেখাতে হবে।

---

১. সূরা রা'দ ২৮

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না

একই সাথে আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদাও করেছেন-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যেসব লোক আমার জন্য চেষ্টা করে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পৌছাবো।'[১]

যে সব লোক আমার পথে মেহনত-মুজাহাদা করে, পরিবেশ, সমাজ, প্রবৃত্তি, শয়তান ও কামনা-বাসনার চাহিদা ত্যাগ করে আমার বিধান মতো চলতে চায় তাদেরকে

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পৌছাবো।'[২]

হযরত থানভী রহ.-এর তরজমা করেছেন- 'আমি তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবো।' এমন নয় যে, দূর থেকে দেখিয়ে দিলো 'এটা পথ'। বরং বলেছেন- আমি তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবো। কিন্তু পা তো একটু বাড়াতে হবে। ইচ্ছা তো করতে হবে। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে একটু শক্ত অবস্থান তো নিতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবে। এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

মুজাহাদা এরই নাম যে, একবার দৃঢ় সংকল্প করবে- এ কাজ আমি করবো না। আত্মা চৌচির হবে, কামনা-বাসনা পদদলিত হবে, মন-মগজে প্রলয় ঘটবে, কিন্তু গোনাহের এ কাজ আমি করবো না। যেদিন প্রবৃত্তির সামনে অটল হয়ে দাঁড়ালো আল্লাহ তা'আলা বলেন সেদিন থেকে আমার প্রিয় হয়ে গেলো। এখন আমি নিজে তার হাত ধরে আমার পথে নিয়ে যাবো।

এখন তো এ আত্মাকে তোমার উপযুক্ত বানাতেই হবে

এজন্য ইসলাহের পথে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হলো 'মুজাহাদা'। মুজাহাদা করার সংকল্প করতে হবে। আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব রহ. এই শের পাঠ করতেন,

---

১. সূরা আনকাবুত ৬৯
২. সূরা আনকাবুত ৬৯

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

'অন্তরে যেসব বাসনা জাগছে
তা ধ্বংস হোক, তা খুন হোক,
কিন্তু আমি তো এখন সংকল্প করেছি
আমার এ আত্মাকে তোমার উপযুক্ত বানাতেই হবে।'

এখন এ অন্তরে মহান আল্লাহর নূর অবতীর্ণ হবে। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে বদ্ধমূল হবে। এখন আর এসব গোনাহ হবে না। তাহলে দেখবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কী পরিমাণ রহমত অবতীর্ণ হয় এবং মানুষ এ পথে অগ্রসর হয়।

মনে রাখবেন! প্রথম প্রথম এ কাজ করতে খুব কষ্ট হবে। মন কিছু একটা চাচ্ছে আল্লাহর খাতিরে তা ত্যাগ করতে খুব কষ্ট হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এ কষ্টের মধ্যেই স্বাদ উপলব্ধি হয়, মজা লাগে। যখন এ চিন্তা জাগে যে, আমি প্রবৃত্তিকে নিষ্পেষিত করছি, কামনা-বাসনাকে খুন করছি, আর তা করছি আমার মালিক ও খালিক আল্লাহর জন্য; এর মধ্যে যে স্বাদ আর মজা রয়েছে, আপনি এখন তা চিন্তাও করতে পারবেন না।

এ কষ্ট মা কেন সহ্য করে?

মায়ের প্রতি লক্ষ্য করুন! প্রচণ্ড শীতের সময় রাতের বেলায় লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। পাশে শুয়ে আছে শিশু সন্তান। এমতাবস্থায় শিশুটি পেশাব করলো, তখন মন চায় যে, এই গরম বিছানা ছেড়ে কোথাও যাবো না। প্রচণ্ড শীতের মৌসুম। গরম বিছানা ছেড়ে যাওয়া বড়ো মুশকিল। কিন্তু মা চিন্তা করে যে, আমি যদি না যাই তাহলে বাচ্চা ভেজা কাপড়ের মধ্যে পড়ে থাকবে, ফলে তার জ্বর হতে পারে, স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। সে বেচারী মনের চাহিদার বিরুদ্ধে তীব্র শীতের মধ্যে বাইরে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা তার কাপড় ধুচ্ছে, তার কাপড় পরিবর্তন করে দিচ্ছে। এটা সামান্য কোনো কষ্ট নয়। কিন্তু মা এই কষ্ট সহ্য করছে। কেন করছে? কারণ তার শিশুর সুস্থতা ও আরাম তার দৃষ্টিতে রয়েছে। যার ফলে সে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও নফসের চাহিদাকে পদদলিত করে এসব কাজ করছে।

ভালোবাসা কষ্টকে বিলুপ্ত করে দেয়

যে মহিলার কোনো সন্তান নেই। সে বলে ভাই আমার চিকিৎসা করাও যাতে সন্তান হয়। এর জন্য দুআ করাতে থাকে। মানুষের কাছে আবেদন করে, আল্লাহর কাছে দু'আ করো আমাকে যেন তিনি সন্তান দান করেন। তার জন্য তাবিজ-কবজ আরো কতো কিছু করে থাকে। অন্য এক মহিলা যদি তাকে বলে যে, আরে তুমি কোন ধান্ধায় পড়ে আছো? সন্তান হলে তো অনেক কষ্ট করতে হবে। শীতের রাতে উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কাপড় ধুতে হবে। তখন মহিলা উত্তর দেয়, আমার এক সন্তানের জন্য হাজার শীতের রাত কতাওবান। কারণ এ সন্তানের মূল্য ও তার গুরুত্বের অনুভূতি তার অন্তরে রয়েছে। এ কারণে ঐ মায়ের জন্য সব কষ্ট শান্তিতে পরিণত হয়েছে। মা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে সন্তান দিন, এর অর্থ তো এই যে, সন্তানের যতো দায়িত্ব রয়েছে, যতো কষ্ট রয়েছে তা আমাকে দান করুন। কিন্তু সে সব কষ্ট তার দৃষ্টিতে কোনো কষ্টই নয়, বরং তা শান্তি। যে মা শীতের রাতে উঠে কাপড় ধুচ্ছে, সহজাতভাবে তার অবশ্যই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সে প্রশান্তি লাভ করছে। সে চিন্তা করছে যে, আমি আমার সন্তানের মঙ্গলের জন্য এসব করছি। অন্তরে এ প্রশান্তি যখন জাগে তখন নিজের কামনা-বাসনা নিষ্পেষিত করতেও স্বাদ উপভোগ হয়। এ বিষয়টিই মাওলানা রুমী রহ. এভাবে উপস্থাপন করেছেন,

از محبت تلخہا شیریں شود

অর্থাৎ, ভালোবাসা সৃষ্টি হলে প্রচণ্ড তিতা জিনিসও মিষ্টি মনে হয়।

যে সব কাজ ছিলো কষ্টের, ভালোবাসার সুবাদে তার মধ্যে স্বাদ উপভোগ হতে আরম্ভ করে। তার মধ্যে মজা চলে আসে যে, ভালোবাসার খাতিরে আমি এসব কাজ করছি।

মাওলার মহব্বত যেন লাইলির মহব্বত থেকে কম না হয়

মাওলানা রুমী রহ. মসনবী শরীফে মহব্বত সংক্রান্ত বিস্ময়কর সব ঘটনা লিখেছেন। লাইলি-মজনুর ঘটনা লিখেছেন যে, মজনু লাইলির জন্য কীভাবে পাগল হলো। দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করলো। দুধের নহর প্রবাহিত করার সংকল্প নিয়ে বের হলো। কেউ যদি তাকে বলে, তুমি অনেক কষ্টের কাজ করছো, এটা বাদ দাও। উত্তরে সে বলে, যার খাতিরে এসব কাজ করছি, যার ভালোবাসায় এসব কষ্ট স্বীকার করছি, তার জন্য হাজার কষ্ট-ক্লেশ

নিবেদিত। আমার তো নহর খুদতেই ভালো লাগছে। কারণ, আমার প্রিয়ার জন্য আমি এ কাজ করছি। মাওলানা রুমী রহ. বলেন,

عشق مولی کے کم از لیلی بود   گوئے گشتن بہر اواولی بود

'মাওলার প্রকৃত প্রেম লাইলির প্রেমের চেয়ে
কি করে কম হতে পারে?
মাওলার প্রেমে বলি হওয়া অধিকতর উত্তম।'

ভালোবাসার খাতিরে মানুষ যখন কষ্ট করে, তখন তাতে বড়ো স্বাদ উপলব্ধি হয়।

বেতন-ভাতার ভালোবাসা

একজন মানুষ চাকরি করে। ভোর-বিহানে উঠতে হয়। তীব্র শীতের মধ্যে গরম বিছানায় শুয়ে আছে। অফিসে যাওয়ার সময় হয়েছে। বিছানা ছেড়ে সে চলে যায়। মন চায় গরম বিছানায় পড়ে থাকি। কিন্তু ঘর-বাড়ি ছেড়ে, পরিবার-পরিজন ছেড়ে অফিসে চলে যায়। সারাদিন কষ্ট করে অনেক রাতে ঘরে ফেরে। এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা ভোরে নিজের সন্তানদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে যায় এবং রাতে ফিরে এসে ঘুমন্ত অবস্থায় পায়। এ ব্যক্তি চাকুরির খাতিরে এতো কষ্ট করছে। এখন যদি কেউ তাকে বলে যে, আরে ভাই! চাকরি করতে গিয়ে তো তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। আসো আমি তোমাকে চাকরিমুক্ত করে দেই। সে উত্তর দিবে, না ভাই, না! অনেক কষ্টে এ চাকরি লাভ হয়েছে। এটা মুক্ত করো না। ভোর-বিহানে উঠে যাওয়ার মধ্যেই সে মজা পাচ্ছে। পরিবার-পরিজন ছেড়ে যাওয়ার মধ্যেই সে মজা পাচ্ছে। কেন? কারণ, মাসের শেষে সে যেই বেতন পায়, তার ভালোবাসায় এসব কষ্ট সুস্বাদু হয়ে গেছে। কোনো সময় চাকরি চলে গেলে সে কাঁদতে থাকে। হায়! ঐ দিন কোথায় গেলো, যখন কাক ডাকা ভোরে উঠে যেতাম? বিভিন্ন জনকে ধরে ধরে সুপারিশ করায় যে, আমাকে চাকরিতে পুনরায় বহাল করা হোক। কোনো জিনিসের ভালোবাসা অন্তরে গেঁথে গেলে সে পথের সব কষ্ট সহজ ও সুস্বাদু হয়ে যায় এবং তাতেই আনন্দ বোধ হয়।

এমনিভাবে গোনাহ ছাড়তে অবশ্যই কষ্ট রয়েছে। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। কিন্তু একবার যখন অবিচল সংকল্প করবে এবং সে মতে আমল আরম্ভ করবে,

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হবে। তখন ইনশা আল্লাহ এই কষ্টে স্বাদ অনুভব হবে এবং আল্লাহর হুকুম মানতে মজা লাগবে।

নফসকে ইবাদতের স্বাদে পরিচিত করুন

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই ছাহেব (কু.সি.) একবার বিস্ময়কর এক কথা বলেন। মানুষের নফস স্বাদ চায়। স্বাদ ও ভোগ-বিলাসিতা নফসের খাদ্য। কিন্তু স্বাদের নির্দিষ্ট কোনো রূপ তার কাম্য নয় যে, এ ধরনের স্বাদ চাই, আর এ ধরনের স্বাদ চাই না। তার কেবল স্বাদ চাই। এখন তোমরা তাকে খারাপ স্বাদে অভ্যস্থ করেছো, খারাপ ভোগ-উপভোগে অভ্যস্ত করেছে। একবার তাকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও ইতাআতের স্বাদে পরিচিত করো। আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুপাতে জীবন যাপনের স্বাদে অভ্যস্ত করো। তাহলে এই নফস্ তাতেই মজা ও স্বাদ উপভোগ করতে থাকবে।

আমি তো রাত-দিন আত্মহারা হয়ে থাকতে চাই

গালেবের একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। আল্লাহ ভালো জানেন, মানুষ এর কী অর্থ গ্রহণ করে থাকে। আমাদের হযরত তো এর খুব চমৎকার অর্থ বের করেছেন। কবিতাটি হলো,

مے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو

اک گونہ بے خودی دن رات چاہئے

'মদের স্বাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই,
আমি তো মদ পান করে রাত-দিন
আত্মহারা হয়ে থাকতে চাই'

তোমরা আমাকে মদে অভ্যস্থ করেছো, আর তাতে আমি আত্মহারা হতে পেরেছি। মদের স্বাদ উপলব্ধি হচ্ছে। যদি তোমরা আমাকে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর যিকির ও তাঁর আনুগত্যে অভ্যস্থ বানাতে, তাহলে আমি আল্লাহর যিকিরে আত্মহারা হওয়ার স্বাদ লাভ করতাম এবং তাতেই আনন্দ বোধ করতাম। এটা তোমাদেরই ভুল যে, তোমরা আমাকে এগুলোর পরিবর্তে মদে অভ্যস্থ করেছো।

নফসকে নিষ্পেষিত করতে ভালো লাগবে

এমনিভাবে মুজাহাদা ও সাধনা প্রথমে তো খুব মুশকিল মনে হয় যে, বড়ো কঠিন সবক দেওয়া হচ্ছে। নফসের বিরোধিতা করো, নফসের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধাচরণ করো। নফস গীবত করতে চাচ্ছে, মজলিসের মধ্যে গীবত চলছেও। তাতে অংশ নিতে খুব মন চাচ্ছে। তখন তাকে সংযত করা যে, এ কাজ কোরো না, এটা খুব কষ্টসাধ্য মনে হয়। কিন্তু মনে রাখবেন, দূর থেকেই এটা কষ্টকর মনে হয়। মানুষ যখন পোক্ত সংকল্প করে যে, এ কাজ করবো না, তখন আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে সাহায্যও লাভ হয়। তুমি যে এই স্বাদ ও কামনা-বাসনাকে নিষ্পেষিত করলে, এতে যে স্বাদ লাভ হবে, ইনশা আল্লাহ, ছুম্মা ইনশা আল্লাহ, এর স্বাদ গীবতের স্বাদের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

ঈমানের মধুরতা লাভ করুন

এক ব্যক্তির অন্তরে কুদৃষ্টি করার চাহিদা পয়দা হলো- আর এমন কে আছে যার অন্তরে এ চাহিদা সৃষ্টি হয় না?- মনের মধ্যে খুব ছটফট করছে, তাকে দেখবোই। কিন্তু আপনি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নজরের হেফাজত করলেন, কুদৃষ্টি দিলেন না। খুব কষ্ট হলো। আত্মা চৌচির হলো। এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের এমন মধুরতা দান করবেন যে, তার তুলনায় কুদৃষ্টির স্বাদ তুচ্ছ। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা, যা হাদীস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে।[১]

এই ওয়াদা শুধুমাত্র কুদৃষ্টির গোনাহের সাথে নির্ধারিত নয়, বরং যাবতীয় গোনাহ ছাড়ার ব্যাপারেই এই ওয়াদা রয়েছে। যেমন গীবত করতে খুব মজা লাগছে। কিন্তু একবার আপনি মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করে গীবত করতে করতে থেমে গেলেন, আল্লাহর ভয়ে গীবতের শব্দ মুখে আসতে আসতে সংযম অবলম্বন করলেন, তখন দেখবেন কেমন স্বাদ উপভোগ হয়। মানুষ যখন গোনাহের স্বাদের পরিবর্তে এই স্বাদে অভ্যস্ত হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বত এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

তাসাওউফের সারকথা

হযরত হাকীমুল উম্মত (কু.সি.) বড়ো চমৎকার কথা বলেছেন, যা সবার মনে রাখার মতো। তিনি বলেন,

---

১. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৪

'যেই সামান্য বিষয় তাসাওউফের সার, তা হলো, আল্লাহর কোনো হুকুম পালনে যখন অলসতা লাগে, যেমন, নামাযের সময় হয়েছে, কিন্তু নামাযে যেতে অলসতা লাগছে, তখন অলসতার মোকাবেলা করে ঐ হুকুমটি পালন করবে। আর যখন কোনো গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে অলসতা লাগে, তখন ঐ অলসতার মোকাবেলা করে ঐ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।'

তারপর হযরত থানভী রহ. বলেন,

'ব্যস! এর দ্বারাই তা'আল্লুক মা'আল্লাহ সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারাই তা'আল্লুক মা'আল্লাহতে উন্নতি ঘটে। যার এই গুণ লাভ হলো, তার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।'

প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার উপর করাত চালিয়ে এবং হাতুড়ি মেরে যখন তাকে পিষে ফেলবে, তখন তা আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর ক্ষেত্রে পরিণত হবে।

মন তো ভাঙ্গার জন্যই

আমাদের ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (কু.সি.) একটা দৃষ্টান্ত দিতেন। এখন তো সে যুগ চলে গেছে, আগের যুগে ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন, তারা বিভিন্ন জিনিসের চূর্ণ তৈরি করতেন। স্বর্ণের চূর্ণ, রূপার চূর্ণ, এক প্রকার বিষের চূর্ণ আরো বিভিন্ন প্রকারের চূর্ণ তৈরি করতেন। সে সব চূর্ণ তৈরির জন্য তারা স্বর্ণকে আগুনে পোড়াতেন। এতো বেশি পোড়াতেন যে, স্বর্ণ ছাইয়ে পরিণত হতো এবং বলতেন যে, স্বর্ণকে যতো বেশি পোড়ানো হবে তার শক্তি ততো বৃদ্ধি পাবে। আগুনে জ্বালিয়ে স্বর্ণের চূর্ণ তৈরি করা হলে এবং তার সামান্য একটু কেউ খেলে তার শক্তি অনেক বেশি বেড়ে যায়। আগুনে জ্বালিয়ে নিষ্পেষিত করে স্বর্ণকে ছাইয়ে পরিণত করা হলে এই চূর্ণ তৈরি হয়।

আমাদের ওয়ালেদ মাজেদ (কু.সি.) বলতেন যে, এভাবে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে যখন নিষ্পেষিত করবে, দলিত-মথিত করবে, পিষে ছাই বানাবে তখন এই চূর্ণ তৈরি হবে। তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কের শক্তি সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর দর্পণ হবে। আত্মাকে যতো বেশি চূর্ণ করবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তা ততো বেশি প্রিয় হবে।

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئنہ ہے وہ آئنہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئنہ ساز میں

'তোমার আয়েনাকে তুমি যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখো না,
কারণ, তোমার এ আয়েনা এমন যে,
তা যতো চূর্ণ হবে, নির্মাতার কাছে ততো প্রিয় হবে।'

অর্থাৎ, তুমি আত্মা নামক আয়েনার উপর যতো আঘাত হানবে, ততো বেশি তা আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে। ভাঙ্গার জন্যই তিনি এটা নির্মাণ করেছেন। তার খাতিরে এর কামনা-বাসনাকে নিষ্পেষিত করতে হবে। যখন তা নিষ্পেষিত হবে, তখন তা অসাধারণ হবে।

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই ছাহেব (কু.সি.) কতো চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন যে,

یہ کہہ کے کوزہ گر نے پیالہ پٹک دیا
اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

'কারিগর এ কথা বলে পিয়ালা ছুড়ে মারলেন যে,
এটা ভেঙ্গে অন্য কিছু বানাবো।'

'অন্য কিছু বানাবো' অর্থ, তার মন মতো বানিয়ে নিবেন। এজন্য এ কথা মনে করবে না যে, মনের কামনা-বাসনা নিষ্পেষিত করায় যে আঘাত লাগছে এবং যে কষ্ট হচ্ছে তা বেকার যাচ্ছে, বরং এরপর যখন এ আত্মা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার পাত্র হবে, আল্লাহ তা'আলার যিকির ও স্মরণের মহল হবে, তখন তার যে মধুরতা লাভ হবে, আল্লার কসম! তার তুলনায় গোনাহের এ সমস্ত স্বাদ ছাই-মাটিতে পরিণত হবে। এগুলোর কোনো মূল্য নেই! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই দৌলত নসীব করুন। এর জন্য প্রথম প্রথম সামান্য মেহেনত করতে হবে এবং কষ্ট স্বীকার করতে হবে। আর এরই নাম হলো 'মুজাহাদা'। এ বিষয়টিই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

'প্রকৃত মুজাহিদ সে-ই, যে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করে।'[১]

অর্থাৎ, নিজের নফসের কামনা-বাসনাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিষ্পেষিত করে।

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৪৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৮৩৩

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমাদেরকে প্রবৃত্তির চাহিদার ক্রীড়নক হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং প্রবৃত্তির চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আত্মার ব্যাধি ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'খুব ভালো করে মনে রেখো! মানব দেহের ভিতর একটি গোশতের টুকরো রয়েছে, তা ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায় আর তা খারাপ হলে পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়। ভালো করে শোনো! সেই গোশতের টুকরা যার কারণে পুরো দেহ ভালো থাকে বা খারাপ হয়ে যায় তা হলো মানুষের আত্মা।'[১]

'আখলাক' তথা নীতি-চরিত্রের সংশোধন এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তা গড়ে তোলা তেমনই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ, যেমন জরুরী ও

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৬-৯৬, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯১, জুমাবার আসরের নামাজের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে বাইহাকী কুবরা, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৫, হাদীস নং ১০১৮০, সহীহ ইবনে হিব্বান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩৩, হাদীস নং ২৯৭, আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৮, ইতহাফুল খুবারাতুল মুহারা বিযাওয়াইদিল মাসানিদিল আশারাহ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৪, মুসতাখরাজে আবি আওয়ানা, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৪৩, হাদীস নং ৪৪৪৩, আযযুহদুল কাবীর, বাইহাকী কৃত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৮, হাদীস নং ৮৭২, আল আরবাউন, ফাসাবী কৃত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩, হাদীস নং ৩৮

গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সম্পাদন করা। বরং গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে যে, ইবাদত মু'আমালাত ও মু'আশারাতের কোনো বিধানই ততোক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ পন্থায় বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত 'আখলাক' তথা নীতি-চরিত্র পরিশুদ্ধ না হবে। 'আখলাক' পরিশুদ্ধ না হলে কতক সময় নামায রোযাও বেকার হয়ে যায়। শুধু বেকার নয় বরং উল্টা আপদ হয়ে যায়। এ কারণেই নীতি-চরিত্র পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান মতো তা গড়ে তোলা আমলী যিন্দেগীর ভিত্তি। এ ভিত্তি না থাকলে আমলের ইমারত দাঁড়াতে পারে না।

'আখলাকে'র স্বরূপ ও গুরুত্ব

সাধারণত সমাজে আখলাক বলা হয় হাসিমুখে কারো সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং নরমভাবে কথা বলাকে। কেউ এরূপ করলে তার সম্পর্কে বলা হয় যে, সে খুব সদাচারী। তার আখলাক খুব ভালো। কিন্তু যেই আখলাকের কথা আমি বলছি এবং দ্বীন ও শরীয়ত আমাদের থেকে যেই আখলাক দাবী করে তার অর্থ ও তাৎপর্য অনেক বিস্তৃত। শুধু মানুষের সাথে হাসিমুখে দেখা করা আখলাক নয়, এটা আখলাকের একটা পরিণতি। মূলত আখলাক হলো মানুষের আত্মা ও আত্মার একটি গুণ। মানুষের অভ্যন্তরে নানা ধরনের আবেগ, চিন্তা ও কামনা-বাসনা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এগুলোকে আখলাক বলে। এগুলোকে পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে শরীয়তে অনেক জোর দেওয়া হয়েছে।

আত্মার গুরুত্ব

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্যে মানুষ কাকে বলে তা জানা জরুরী। মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ের নাম। শুধু দেহের নাম মানুষ নয়, বরং আত্মাবিশিষ্ট দেহের নাম মানুষ। ধরুন, এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে। তাতে তার বাহ্যিক দেহের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে? চোখ, নাক, কান, জিহ্বা যথাপূর্ব রয়েছে। মুখমণ্ডল পূর্বের ন্যায় রয়েছে। হাত-পা পূর্বের ন্যায় রয়েছে। সারা দেহ যেমন ছিলো, তেমনই রয়েছে। কিন্তু কি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে? পার্থক্য এই সৃষ্টি হয়েছে যে, পূর্বে এই দেহের মধ্যে আত্মা ছিলো। এখন তা বের হয়ে গেছে। আত্মা বের হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। লাশে পরিণত হয়ে যায়। জড়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

দ্রুত দাফন করো

আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে যে মানুষ অন্যদের প্রিয় ছিলো, সম্মানিত ছিলো, ভালোবাসার পাত্র ছিলো, জায়গা সম্পত্তির মালিক ছিলো, পরিবার-পরিজনের দেখা-শোনা করতো, বন্ধু-বান্ধবের আত্মাঙ্গ ছিলো, কিন্তু যেই তার দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গেলো, সেই না জায়গা-সম্পত্তি তার থাকলো, না স্ত্রীর স্বামী থাকলো এবং না পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক থাকলো। যেসব লোক তাকে মহব্বত করতো, ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতো, নিজের কাছে রাখতে চাইতো, এখন তারা অতি দ্রুত তাকে দাফন করার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। কেউ যদি বলে ভাই! এ লোক তো তোমাদের প্রিয় ছিলো তাকে ঘরে রেখে দাও, তাহলে কেউই এর জন্য প্রস্তুত হবে না। বেশির চেয়ে বেশি এক-দুই দিন রাখবে। এরচে' বেশি রাখলে বরফ ইত্যাদি লাগিয়ে হয়তো এক সপ্তাহ রাখবে। এর অধিক কেউ রাখবে না। এখন সকলেই তাকে দ্রুত সমাহিত করার চিন্তা করবে। যারা তাকে ভালোবাসতো, দিন-রাত তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো, তার ইশারায় উঠতো বসতো, কিন্তু আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পর তারাই এখন তাকে সমাহিত করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। সন্তান নিজ হাতে পিতাকে কবরে রাখতে চায়। দ্রুত তাকে দাফন করতে চায়।

জনৈক ব্যক্তি ঘটনা শুনিয়েছে যে, একবার পত্রিকায় এসেছে, এক ব্যক্তি অচেতন হয়ে গেছিলো। মরে গেছে মনে করে মানুষ তাকে দাফন করে। চেতনা ফিরে এলে সে কোনো উপায়ে কবর থেকে বের হয়ে বাড়িতে চলে আসে। দরজায় করাঘাত করলে বাপ ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'কে?' সে তার নাম বললে বাপ ঘর থেকে লাঠি নিয়ে বের হয়ে তাকে এই মনে করে আঘাত করতে থাকে যে, তার ভূত কোত্থেকে এলো? বেচারা আগে তো মরেনি। এবার লাঠির আঘাতে সে মরে গেলো।

এই বিরাট বিপ্লব কি করে ঘটলো যে, পুরো দেহ আগের মতো থাকা সত্ত্বেও কেউ তাকে ঘরে রাখতে প্রস্তুত নয়। পার্থক্য তো এই হয়েছে যে, তার দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গেছে। বোঝা গেলো, মানব দেহের মধ্যে আসল জিনিস হলো তার রূহ। দেহে রূহ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মানুষ মানুষ থাকে। রূহ বের হয়ে গেলে সে আর মানুষ থাকে না। লাশ হয়ে যায়। তার সাথে কারো সম্পর্ক থাকে না। সবাই দ্রুত তাকে কবরস্ত করার চিন্তায় থাকে।

আধ্যাত্মিক রোগসমূহ

মানব দেহের যেমন অনেকগুলো গুণ রয়েছে, কখনো দেহ সুস্থ থাকে সুন্দর থাকে, শক্তিশালী থাকে, আবার কখনো দুর্বল, জীর্ণ, অসুস্থ ও অসুন্দর হয়ে যায়। তেমনিভাবে মানবাত্মারও কিছু গুণ রয়েছে। কখনো আত্মা শক্তিশালী থাকে আর কখনো দুর্বল হয়ে যায়। কখনো ভালো গুণের অধিকারী হয় আর কখনো খারাপ গুণের অধিকারী হয়। মানব দেহ যেমন রোগাক্রান্ত হয়- কখনো জ্বর হয়, কখনো পেট খারাপ হয়, কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, কখনো দাস্ত হয়; তেমনিভাবে মানবআত্মারও অনেক রোগ হয়ে থাকে। আত্মার রোগ কি? কখনো তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়, কখনো হিংসা প্রতিপালিত হয়, কখনো বিদ্বেষ জন্মায়, কখনো অকৃতজ্ঞতা সৃষ্টি হয়; এ সবই আত্মার ব্যাধি।

আত্মার সৌন্দর্য

মানব দেহের যেমন সৌন্দর্য রয়েছে, মানুষ বলে তার চেহারা খুব সুন্দর, তার নয়নযুগল অপরূপ, তার দেহ অতিসুন্দর; তেমনই আত্মারও কিছু সৌন্দর্য রয়েছে, তারও কিছু রূপ রয়েছে। আত্মার সৌন্দর্য কি? আত্মার সৌন্দর্য হলো, মানুষের মধ্যে বিনয় থাকবে, সবর ও শোকর থাকবে, ইখলাস থাকবে এবং আত্মশ্লাঘা থাকবে না, মানুষকে দেখানোর প্রবৃত্তি থাকবে না। এগুলো হলো আত্মার রূপ-সৌন্দর্য।

দৈহিক ইবাদত

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন অনেকগুলো বিধান দিয়েছেন, যেগুলোর সম্পর্ক আমাদের বাহ্যিক দেহের সঙ্গে। যেমন নামায। নামায কিভাবে পড়া হয়? কখনো দাঁড়ায়, কখনো রূকু করে, কখনো সেজদা করে, কখনো সালাম ফেরায়; এসমস্ত কাজ দেহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। রোযা কিভাবে রাখে? নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত খুৎ-পিপাসায় থাকে; এটাও দৈহিক একটা ইবাদত। সম্পদের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ অভাবীদেরকে দেওয়া ফরয করা হয়েছে, যাকে যাকাত বলা হয়; এটাও হাত দ্বারা দেওয়া হয়। হজ্ব-ও একটি দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত। হজ্বের মধ্যে পরিশ্রম করতে হয়, সফর করতে হয়, বিশেষ বিশেষ রোকন পালন করতে হয়। এ সব কাজ শরীরের মাধ্যমে করা হয়। এজন্য এটাও একটি দৈহিক ইবাদত।

বিনয় আত্মার কাজ

আল্লাহ তা'আলা যেমন উপরোক্ত ইবাদতসমূহের সম্পর্ক করেছেন আমাদের দেহের সঙ্গে, তেমনি আমাদের রূহ ও আত্মার সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো কাজকেও ফরয করেছেন। যেমন হুকুম দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষকে বিনয় অবলম্বন করতে হবে। বিনয় দেহের কাজ নয়, আত্মার কাজ। ভিতরের কাজ। আত্মার কাজ। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে এ গুণ অর্জন করার হুকুম দিয়েছেন।

অনেক অশিক্ষিত মানুষ কোনো মেহমান এলে তাকে আদর-যত্ন করা এবং খানা খাওয়ানোকে বিনয় মনে করে। বিনয়ের অর্থ এটা নয়। যারা শিক্ষিত মানুষ তারা অন্যের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করাকে মনে করে বিনয়। আবার কেউ কেউ মনে করে, মাথা নত করে এবং সীনা নোয়ায়ে যে মানুষ অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়, সে খুব বিনয়ী মানুষ। নরম মেযাজের মানুষ।

খুব ভালো করে বুঝুন যে, দেহের সঙ্গে বিনয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। বিনয়ের সম্পর্ক তো হলো আত্মার সঙ্গে। নিজের মনে নিজেকে মূল্যহীন মনে করা, তুচ্ছ মনে করা, ক্ষমতাহীন মনে করা এবং নিজেকে অসহায় ও অক্ষম মনে করাকে বলা হয় বিনয়। আল্লাহ তা'আলা এরই নির্দেশ দিয়েছেন।

ইখলাস আত্মার একটি অবস্থার নাম

আল্লাহ তা'আলা ইখলাসের হুকুম দিয়েছেন। নিজের মধ্যে ইখলাস পয়দা করবে। ইবাদতের মধ্যে ইখলাস পয়দা করবে। যে কোনো কাজ করবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবে, এটা হলো ইখলাস। মুখে প্রকাশ করলেই ইখলাস হয় না। ইখলাস তো আত্মার একটা অবস্থার নাম। একটা অভ্যন্তরীণ গুণ। আমাদেরকে এটা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শোকর আত্মার কাজ

আল্লাহ তা'আলা শোকরের হুকুম দিয়েছেন। যখন কোনো নেয়ামত লাভ হবে তখন আল্লাহর শোকর আদায় করবে। এই শোকরও আত্মার কাজ। হৃদয়ের কাজ। যতো বেশি শোকর আদায় করবে, রূহ ততো বেশি শক্তিশালী হবে।

সবরের হাকীকত

আল্লাহ তা'আলা সবর তথা ধৈর্য ধারণের হুকুম দিয়েছেন। অপ্রিয় কোনো অবস্থা দেখা দিলে মনে করবে যে এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। যা কিছু হয়েছে আল্লাহর হিকমত অনুপাতেই হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা মতোই হয়েছে। আমার যতোই খারাপ লাগুক না কেন, এর মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার মাসলাহাত রয়েছে। প্রত্যেক অপ্রিয় ঘটনার সময় মানুষ এ কথা চিন্তা করবে, অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত করবে; একে সবর ও ধৈর্য বলে।

আধ্যাত্মিক গুণ অর্জন করা ফরয

আল্লাহ তা'আলা এমন অনেক বিধান দিয়েছেন, যেগুলোর সম্পর্ক আমাদের রূহ ও আত্মার সঙ্গে। মনে রাখবেন! সবর করা তেমনি ফরয, যেমন ফরয নামায পড়া। শোকর করা তেমনি ফরয, যেমন ফরয রোযা রাখা। ইখলাস তেমনি ফরয, যেমন ফরয যাকাত দেওয়া। এগুলোও আমাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত ফরয।

আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ হারাম

বাহ্যিক এবং দৈহিকভাবে অনেক কাজকে গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, ঘুষ নেয়া, সুদ খাওয়া, মদ পান করা, ডাকাতি করা এসব গোনাহের কাজ। এগুলো আমাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের অঙ্গ দ্বারা এ সব সংঘটিত হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অনেক অভ্যন্তরীণ কাজকেও গোনাহ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন অহংকার একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাধি। যা হাত পা দ্বারা সম্পাদিত হয় না। এটা মানুষের আধ্যাত্মিক একটি রোগ। আল্লাহ তা'আলা একে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। মদ পান করা যেমন হারাম, সুদ খাওয়া যেমন হারাম এবং ব্যভিচার করা যেমন হারাম, এটাও ঠিক একই রকম হারাম। এমনিভাবে হিংসাও একটি অভ্যন্তরীণ রোগ। একেও আল্লাহ তা'আলা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এটাও তেমনি হারাম, যেমন পূর্বোল্লিখিত গোনাহসমূহ হারাম।

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধানও দিয়েছেন। কিছু গুণ অর্জন করার হুকুম দিয়েছেন। কিছু চরিত্র থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত গুণ অর্জন করার হুকুম

দিয়েছেন সেগুলো নিজের ভিতরে সৃষ্টি করলে এবং যে সমস্ত দোষ থেকে বাঁচার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো থেকে নিজের অভ্যন্তরকে মুক্ত করলে তখন বলা হবে যে, তার আখলাক তথা নীতি-চরিত্র পরিশুদ্ধ হয়েছে। আখলাক এসমস্ত অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আত্মিক গুণের নাম, যেগুলোর উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। যে সমস্ত ভালো গুণ অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে সেগুলোকে 'আখলাকে ফাযেলা' বা উত্তম চরিত্র এবং যে সমস্ত খারাপ দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে সেগুলোকে 'আখলাকে রাযীলা' বা মন্দ চরিত্র বলা হয়।

আশা করি এ বিষয়টি বুঝে এসেছে যে, আখলাকের অর্থ পরস্পরে ভালোভাবে কথা বলা বা হাসিমুখে মিলিত হওয়া নয়, বরং এটা তার একটি পরিণতি। যখন মানুষের আখলাক পরিশুদ্ধ হয় তখন অন্য সকলের সঙ্গে তার আচরণ উত্তম হয়। কিন্তু মৌলিকভাবে একে আখলাক বলা হয় না। আখলাকের হাকীকত হলো, মানুষের অভ্যন্তর পরিশুদ্ধ হওয়া, উত্তম গুণাবলী লাভ হওয়া, মন্দ চরিত্র দূর হওয়া এবং মানবাত্মাকে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ঢেলে সাজানো।

ক্রোধের স্বরূপ

আখলাক পরিশুদ্ধ হয় কীভাবে? একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধ মানুষের অভ্যন্তরীণ একটি চরিত্র, যা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। তারপর অনেক সময় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের হাত ও পায়ের মাধ্যমে আর অনেক সময় প্রকাশ পায় জিহ্বার মাধ্যমে। ক্রোধের সৃষ্টি হলে এবং মানুষ ক্রোধের কাছে পরাভূত হলে মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায়, রগ টান টান হয়ে যায়, জিহ্বা নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে উলট-পালট বকতে আরম্ভ করে, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকে; এগুলো ক্রোধের পরিণতি। কিন্তু প্রকৃত ক্রোধ সেই অবস্থার নাম, যা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। এই ক্রোধ অসংখ্য আধ্যাত্মিক রোগের মূল। এর কারণে অনেক গোনাহ সংঘটিত হয় এবং অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

ক্রোধের উদ্রেক না হওয়া একটি রোগ

মানুষের মধ্যে যদি ক্রোধ একেবারেই না থাকে, কেউ যতো কিছুই করুক না কেন তার ক্রোধের উদ্রেকই হয় না; এটাও একটা ব্যাধি। আল্লাহ

তা'আলা মানুষকে এ উদ্দেশ্যে ক্রোধ দিয়েছেন, যেন মানুষ নিজের জানের, মানের ও দ্বীনের উপর থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। কেউ পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রাণ হরণ করতে চাচ্ছে এরপরও যদি কারো ক্রোধের উদ্রেক না হয়; তাহলেও এটাও একটা রোগ। নাউযুবিল্লাহ। কেউ রাসূলের শানে গোস্তাখি করছে, এক ব্যক্তির তখনও ক্রোধ আসছে না; তার অর্থ হলো, সে অসুস্থ। এমন ক্ষেত্রে ক্রোধ আসা উচিত ছিলো, কিন্তু আসছে না, তাহলে এটা একটা ব্যাধি।

ক্রোধের মধ্যেও ভারসাম্য কাম্য

ক্রোধ যদি ভারসাম্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তাহলে এটাও ব্যাধি। অন্যের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি ক্রোধের উদ্রেক হয়, তাহলে এ পরিমাণ ক্রোধ তো ঠিক আছে। কিন্তু যদি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক ক্রোধ হয়, যেমন একটা থাপ্পড় মারলেই কাজ হয়ে যেতো কিন্তু সে ক্রোধের শিকার হয়ে অবিরাম মেরেই চলছে তাহলে এই ক্রোধ সীমাতিরিক্ত ও গোনাহ। বিধায় ক্রোধ কম হলেও তা আধ্যাত্মিক ব্যাধি এবং বেশি হলেও আধ্যাত্মিক ব্যাধি। ক্রোধ সীমার মধ্যে থাকতে হবে। প্রয়োজনের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যাবে না। বিনা প্রয়োজনে ক্রোধ সৃষ্টি হলেও তা প্রয়োগ করা যাবে না।

হযরত আলী রাযি. ও ক্রোধ

হযরত আলী রাযি.-এর ঘটনা আছে যে, এক ইহুদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবিপূর্ণ কোনো কথা বললে হযরত আলী রাযি. ক্রোধান্বিত হন। তিনি ঐ ইহুদিকে ধরাশায়ি করে তার বুকের উপর উঠে বসেন। ইহুদি যখন দেখলো আর কোনো উপায় নেই তখন সে মাটিতে শোয়া অবস্থায়ই হযরত আলী রাযি.-এর চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে। এবার তো সে আরো বেশি গোস্তাখি করলো, ফলে তাকে আরো বেশি মারা উচিত ছিলো, কিন্তু তিনি বললেন- সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখি করেছিলো বলে আমি তাকে শাস্তি দিয়েছিলাম। তখন আমার ক্রোধ আমার নিজের জন্য ছিলো না, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা রক্ষার্থে ছিলো, এজন্য আমি তার উপর উঠে বসি। কিন্তু যখন সে আমাকে থুথু নিক্ষেপ করে তখন আমার অন্তরে নিজের জন্য

ক্রোধের সৃষ্টি হয়, নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা অন্তরে জাগে, তখন আমার স্মরণ হয় যে, নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা ভালো নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এই যে, তিনি কখনই নিজের জন্য কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। এজন্য আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। এটা হলো ক্রোধের ভারসাম্য। প্রথমে ক্রোধের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিলো, তাই ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তার উপর আমলও করেছেন। দ্বিতীয়টি ক্রোধের সঠিক ক্ষেত্র ছিলো না তাই তার উপর আমল করেননি। তিনি ইহুদিকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

ভারসাম্য প্রয়োজন

মানবাত্মার সমস্ত আখলাকের এই অবস্থা। সত্তাগতভাবে সেগুলো খারাপ নয়। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকলে তা ঠিক আছে। যদি ভারসাম্যের চেয়ে কমে যায় তাহলেও তা ব্যাধি, আর যদি বেড়ে যায় তাহলেও তা ব্যাধি। আত্মশুদ্ধির অর্থ হলো, আধ্যাত্মিক চরিত্রকে ভারসাম্যের মধ্যে রাখা। কম বা বেশি হতে না দেওয়া।

আত্মার গুরুত্ব

এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'খুব ভালো করে মনে রেখো! মানব দেহের ভিতর একটি গোশতের টুকরো রয়েছে, তা ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায় আর তা খারাপ হলে পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়। ভালো করে শোনো! সেই গোশতের টুকরা যার কারণে পুরো দেহ ভালো থাকে বা খারাপ হয়ে যায় তা হলো মানুষের আত্মা।'

কিন্তু এর দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গোশতের টুকরা উদ্দেশ্য নয়। হৃৎপিণ্ড ফাড়া হলে তার মধ্যে এসব ব্যাধি দৃষ্টিগোচর হবে না। না অহংকার দৃষ্টি গোচর হবে, না হিংসা, না বিদ্বেষ। ডাক্তারের কাছে গেলে সে আত্মার বাহ্যিক রোগসমূহ পরীক্ষা করে বলবে তার স্পন্দন ঠিক আছে কি না। শিরা উপশিরা

ঠিক মতো কাজ করছে কি না। রক্তের সরবরাহ ঠিক মতো হচ্ছে কি না। ডাক্তারী পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতি কেবল আত্মার বাহ্যিক আমলের রূপরেখা তুলে ধরে।

এগুলো অদৃশ্য ব্যাধি

কিন্তু মানবাত্মার সাথে সম্পৃক্ত এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো দেখা যায় না, চোখে পড়ে না। সেগুলোর কথাই আমি উপরে উল্লেখ করলাম যে, অন্তরে শোকর আছে কি না, হিংসা আছে কি না, বিদ্বেষ আছে কি না, সবর ও শোকর আছে কি না, এসব জিনিস বাহ্যিক রোগের ডাক্তার দেখে বলতে পারবে না। এমন কোনো যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে বলা যাবে যে, তার মধ্যে এসব আধ্যাত্মিক ব্যাধি আছে।

সুফিয়ায়ে কেরাম আত্মার ডাক্তার

আধ্যাত্মিক রোগের ডাক্তার, রোগনির্ণয়কারী ও চিকিৎসা প্রদানকারী অন্য এক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের নামই হলো 'সূফিয়ায়ে কেরাম'। যাঁরা নীতিবিদ্যায় পারদর্শী এবং আধ্যাত্মিক রোগ নির্ণয়কারী ও চিকিৎসা প্রদানকারী। এটি স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র। স্বতন্ত্র একটি বিদ্যা। এই শাস্ত্র এমনভাবেই পড়া হয় ও পড়ানো হয়, যেমন ডাক্তারী বিদ্যা পড়া হয় ও পড়ানো হয়।

অনেক বাহ্যিক ব্যাধি এমন রয়েছে যেগুলো মানুষ নিজেই বুঝতে পারে। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এবং শরীর ব্যাথা করলে মানুষ বুঝতে পারে যে, আমার জ্বর হয়েছে। এমনিতে বুঝতে না পারলে থার্মোমিটার দিয়ে মাপলে বুঝতে পারে এবং ধরা পড়ে। আর যদি এমন কোনো রোগ হয়, যা নিজে বুঝতে পারে না এবং বাড়ির লোকেরাও যন্ত্র দিয়ে ধরতে পারে না, তাহলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার বলে দেয় যে, অমুক রোগ হয়েছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ অনেক সময় রোগী নিজেও বুঝতে পারে না যে, আমার মধ্যে এই রোগ রয়েছে। এমন কোনো যন্ত্রও মানুষের কাছে নেই, যার দ্বারা জানতে পারবে যে, আমার অহংকারের তাপমাত্রা এতো। বাহ্যিক রোগের ডাক্তারের কাছে গেলে সেও বলতে পারবে না যে, তার মধ্যে এই ব্যাধি রয়েছে। অহংকার আছে কি না, তা নির্ণয় করার জন্য কোনো আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

বিনয়, নাকি বিনয়ের নামে লৌকিকতা?

বিনয়ের মর্ম আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, নিজেকে নিজে গুরুত্বহীন মনে করা হলো বিনয়। একে বিনম্রতাও বলা হয়। এবার শুনুন, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (কু.সি.) বলেন, অনেক সময় মানুষ বলে যে, আমি তো অকর্মণ্য, মূল্যহীন, মূর্খ, বড়ো পাপী, অধম, আমার কোনোই গুরুত্ব নেই, এতে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, এ বেচারা খুবই বিনয়ী। নিজেকে মূল্যহীন, অকর্মণ্য, অধম, মূর্খ ও গোনাহগার মনে করছে।

বাহ্যিকভাবে এটাকে বিনয় মনে হয়। কিন্তু হযরত বলেন, অনেক সময় এমন হয় যে, যে ব্যক্তি এসব কথা বলছে প্রকৃতপক্ষে সে বিনয়ী নয়। তার মধ্যে বরং দুটি আধ্যাত্মিক ব্যাধি রয়েছে। এক. অহংকার; আরেক বিনয়ের লৌকিকতা। অর্থাৎ, সে যে বলছে আমি মূল্যহীন, মূর্খ, তা খাঁটি মনে বলছে না, বরং এ জন্য বলছে, যাতে মানুষ তাকে বিনয়ী মনে করে এবং বলে যে, সে তো খুব বিনম্র।

হযরত বলেন, যে ব্যক্তি বলছে যে, আমি বড়ো গোনাহগার, জাহেল, অকর্মণ্য ও অধম তাকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি এই যে, তখন যদি অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে বলে যে, নিঃসন্দেহে আপনি অধম, অকর্মণ্য, পাপী, মূর্খ এবং গুরুত্বহীন, তখন দেখো তার অন্তরে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়? সে কি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে বলে যে, আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। আমার ধারণায় প্রায় শতভাগ লোকের ক্ষেত্রে এমন হবে যে, অন্য ব্যক্তি যদি বলে নিঃসন্দেহে আপনি এমন, তাহলে মনে খুব খারাপ লাগবে। মনে হবে যে, সে আমাকে অধম, অকর্মণ্য ও মূর্খ বলে হেয় করলো।

এতে বোঝা গেলো যে, সে শুধু মৌখিকভাবে বলেছিলো যে, আমি অধম, অকর্মণ্য, মূর্খ। তার অন্তরে এ কথা ছিলো না। বরং উদ্দেশ্য ছিলো, যখন আমি মুখে বলবো যে, আমি মূর্খ, অকর্মণ্য, অধম তখন মানুষ বলবে যে, হযরত এটা তো আপনার বিনয়। আপনি তো আসলে অনেক বড়ো আলেম, জ্ঞানী, গুণী, মুত্তাকী ও পরহেযগার। এটা বলানোর জন্য এসব কিছু বলছে এবং দেখাচ্ছে যে, আমি বড়ো বিনয়ী। প্রকৃতপক্ষে আত্মা অহংকার ও লৌকিকতা দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু বাহ্যিকভাবে দেখাচ্ছে যে, আমি খুব বিনয়ী।

আপনারা চিন্তা করে দেখুন! এসব কথা খাঁটি মনে বলা হচ্ছে, নাকি ভিতরে রোগ ভরা, তা কে ধরতে পারবে? এটা তো সেই ধরতে পারবে, যে আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক ও দক্ষ। এ জন্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়, কারণ অনেক সময় মানুষ নিজের আধ্যাত্মিক ব্যাধি ধরতে পারে না।

অন্যের জুতা সোজা করা

এক ব্যক্তি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (কু.সি.)-এর মজলিসে আসা যাওয়া করতো। একদিন ওয়ালেদ ছাহেব দেখলেন, নিজের মর্জি মতো সে মজলিসে আগমনকারীদের জুতা সোজা করতে আরম্ভ করেছে। এরপর থেকে প্রতিবার সে এসে প্রথমে মজলিসে আগমনকারীদের জুতা সোজা করতো তারপর মজলিসে বসতো। ওয়ালেদ ছাহেব কয়েকবার এ কাজ করতে দেখে একদিন তাকে নিষেধ করে বললেন যে, তুমি এ কাজ করবে না। তারপর বললেন, আসল কথা এই যে, এ বেচারা মনে করেছে, আমার ভিতর অহংকার রয়েছে এবং নিজের মন মতো চিকিৎসা নির্ধারণ করেছে যে, আমি মানুষের জুতা সোজা করবো তাহলে আমার অহংকার দূর হয়ে যাবে। ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, এই চিকিৎসার মাধ্যমে উপকার না হয়ে উল্টা ক্ষতি হতো। অহংকার ও আত্মশ্লাঘা বৃদ্ধি পেতো। কারণ, জুতা সোজা করার ফলে তার মন-মগজে এ কথা জাগতো যে, আমি নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছি। আমি তো বিনয়ের চূড়ান্ত করেছি যে, মানুষের জুতা সোজা করতে আরম্ভ করেছি। এতে আত্মশ্লাঘা আরো বৃদ্ধি পেতো। এজন্য তাকে নিষেধ করে দিয়েছি যে, এটা তোমার কাজ নয়। তার জন্য অন্য চিকিৎসা নির্ধারণ করেছি।

এবার বলুন, বাহ্যিকভাবে যে ব্যক্তি অন্যের জুতা সোজা করছে তাকে বিনয়ী মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝতে পেরেছেন যে, এ কাজ মূলত অহংকার সৃষ্টি করছে। বিনয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্য নফসের মধ্যে এতো সূক্ষ্ম রহস্য থাকে যে, কোনো আধ্যাত্মিক রোগ সম্পর্কে দক্ষ ব্যক্তির শরণাপন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিজের থেকে তা উপলব্ধি করতে পারে না। তিনি বলে দিবেন যে, তোমার এ কাজ আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্ধারিত সীমার মধ্যে হচ্ছে কি হচ্ছে না। তিনিই বলতে পারেন যে, এই সীমা পর্যন্ত ঠিক আছে, আর এর বাইরে ঠিক নেই।

তাসাওউফ কি?

এ কারণেই কোনো লোক যখন কোনো পীর সাহেবের কাছে যায়, তার হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত হয়, তিনি কিছু ওযীফা দেন, কিছু আমল শিখিয়ে দেন যে, সকালে এটা পড়বে, সন্ধ্যায় এটা পড়বে, জিকির করবে; আজ এর নাম হয়েছে তাসাওউফ। এখানেই শেষ। না আত্মশুদ্ধির চিন্তা, না আখলাক পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব, না উত্তম গুণাবলী অর্জন করার আগ্রহ, আর না মন্দ

চরিত্র বিলুপ্ত করার চেষ্টা; এসবের কিছুই নেই, বসে বসে কেবল ওযীফা পাঠ করছে। অনেক সময় এই ওযীফা পাঠ করা আধ্যাত্মিক রোগকে আরো মারাত্মক বানিয়ে দেয়।

ওযীফা ও আমলের হাকীকত

ওযীফা, যিকির ও আমলের দৃষ্টান্ত শক্তিবর্ধক জিনিসের ন্যায়। শক্তিবর্ধক জিনিসের মূলনীতি এই যে, অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় শক্তিবর্ধক জিনিস খেলে তার শক্তি বৃদ্ধি না পেয়ে উল্টো রোগ শক্তিশালী হতে থাকে। অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্তরে যদি তাকাব্বুর ভরা থাকে, উজুব ভরা থাকে আর বসে বসে ওযীফা পাঠ করে, যিকির করে তাহলে অনেক সময় এর ফলে ইসলাহের পরিবর্তে তাকাব্বুর আরো বেড়ে যায়। এজন্য বলা হয় যে, যখনই কোনো ওযীফা পাঠ করবে বা যিকির করবে, কোনো শাইখের দিকনির্দেশনায় করবে। কারণ শাইখ জানেন যে, এর চে' বেশি যিকির দিলে তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হবে। এজন্য তিনি থামিয়ে দেন যে, এখন অধিক যিকিরের প্রয়োজন নেই। হযরত হাকীমুল উম্মাত (কু.সি.) চিকিৎসা স্বরূপ অনেক মানুষের ওযীফা ও যিকির বন্ধ করে দিয়েছেন। যখন দেখেছেন যে, তার জন্য এ ওযীফা ক্ষতির কারণ হচ্ছে তখন তা ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

মুজাহাদার আসল উদ্দেশ্য

কিন্তু আজকাল তাসাওউফ ও পীর মুরীদির পুরো জোর আমল ওযীফার উপর। অমুক সময় এই যিকির করবে, অমুক সময় এই যিকির করবে এখানেই শেষ। তারা শুধু যিকিরের পিছনে লেগে আছে। ভিতরে যতো ব্যাধি উদ্বেলিত হোক না কেন সে দিকে লক্ষ নেই। আগের জামানায় সূফীয়ায়ে কেরাম আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ হিসেবে মুরীদের ইসলাহের ফিকির করতেন। এরজন্য মুজাহাদা করাতেন, সাধনা করাতেন, ঘষা মাজা করাতেন। এর ফলে মানুষ পরিশুদ্ধ হতো, যোগ্য হতো।

শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর রহ.-এর নাতীর ঘটনা

হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. খুব উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। আমাদের বুযুর্গদের শাজারার মধ্যে তাঁর অবস্থান অনেক উঁচুতে। তাঁর একজন নাতী ছিলেন। শাইখ জীবিত থাকতে নাতীর মধ্যে আত্মশুদ্ধির

চিন্তা জাগেনি। সারা দুনিয়ার মানুষ এসে দাদার থেকে ফয়েয লাভ করতো কিন্তু তিনি সাহেবযাদা হওয়ার চিন্তায় নিমজ্জিত ছিলেন। নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য দাদার শরণাপন্ন হননি। শাইখের ইন্তেকাল হলে তার আফসোস হয় যে, হায় আল্লাহ! আমি তো চরম বঞ্চিত হলাম। কতো দূর-দূরান্তের মানুষ এসে ফয়েয লাভ করলো আর আমি ঘরে থেকেও কিছু লাভ করতে পারলাম না! বাতির নীচে অন্ধকার। আফসোস জাগলে চিন্তা করতে লাগলেন যে, এখন কি করি? ক্ষতিপূরণ কি করে হতে পারে? মনে হলো, আমার দাদার থেকে যেসব লোক আত্মশুদ্ধির এই দৌলত লাভ করেছেন তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনের শরণাপন্ন হই। দাদার খলিফাদের মধ্য উঁচু স্তরের বুযুর্গ কে তা খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন। জানতে পারলেন যে, বলখে উঁচু স্তরের একজন বুযুর্গ আছেন। কোথায় গাঙ্গুহ, আর কোথায় বলখ! যখন ঘরে এই দৌলত ছিলো, সবসময় তার শরণাপন্ন হতে পারতো, তখন কিছু অর্জন করেনি। অবশেষে বলখের এই দীর্ঘ কষ্টকর পথ সফর করতে হলো। সত্যিকারের অন্বেষণ ছিলো এজন্য তিনি সফরে বের হলেন।

শাইখের নাতীর ইস্তিকবাল

বলখে অবস্থান রত শাইখের খলীফা যখন জানতে পারলেন যে, আমার শাইখের নাতী আসছে তখন তিনি নিজের শহর থেকে বাইরে বের হয়ে অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে তাকে স্বাগত জানালেন। সসম্মানে বাড়ীতে নিয়ে আসলেন। জাঁকজমকপূর্ণ খাবার তৈরী করালেন। উঁচু স্তরের দাওয়াতের আয়োজন করলেন। ভালো মানের থাকার ব্যবস্থা করলেন। গালিচা বিছিয়ে দিলেন। আরো কতো কিছু যে করলেন তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এক-দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বললেন যে, হযরত আপনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করেছেন, অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেছেন। কিন্তু আমি তো এসেছি অন্য এক উদ্দেশ্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি সেই উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, আমার উদ্দেশ্য হলো আপনি আমাদের বাড়ি থেকে যেই দৌলত নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশ আমাকেও দিন। এজন্য এসেছি। শাইখ বললেন, আচ্ছা! ঐ দৌলত নিতে এসেছো? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। শাইখ বললেন, ঐ দৌলত যদি নিতে এসে থাকো তাহলে এই গালিচা, এই সম্মান, খানা-পিনার এই ব্যবস্থা সব বন্ধ করে দাও। উন্নত মানের থাকার ব্যবস্থা ত্যাগ করো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

এখন আমি কি করবো? শাইখ বললেন, আমাদের মসজিদের পাশে একটি হাম্মাম রয়েছে। সেখানে ওযুকারীদের জন্য পানি গরম করো। এটাই তোমার কাজ। বাইয়াত নয়, ওযীফা নয়, যিকির নয়, মামুলাত নয়, অন্য কিছুও নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, থাকবো কোথায়? শাইখ বললেন, রাতে যখন ঘুমাতে হয় তখন ঐ হাম্মামের কাছেই ঘুমিয়ে পড়বে। কোথায় এতো সম্মান ও শুভেচ্ছা, গালিচা বিছানো হচ্ছে, খানা পাকানো হচ্ছে, দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আর এখন হাম্মামে আগুন জ্বালানোর কাজে নিয়োজিত!

এখনও ত্রুটি রয়েছে

আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে যখন কিছু দিন পার হয়ে গেলো, তখন শাইখ একদিন মেথরকে নির্দেশ দিলেন যে, হাম্মামের কাছে এক ব্যক্তি বসা আছে, ময়লার টুকরি নিয়ে তার নিকট দিয়ে যাবে। এমনভাবে যাবে যাতে ময়লার গন্ধ তার নাকে লাগে। সে টুকরি নিয়ে হাম্মামের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো। সে তো ছিলো সাহেবজাদা, নওয়াবজাদার মতো জীবন কাটিয়েছে, কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো এবং বললো, তোর এতো বড় সাহস! এই ময়লার টুকরি নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যাস! গাঙ্গুহ্ হলে দেখিয়ে দিতাম! শাইখ মেথরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যখন টুকরি নিয়ে গেলে তখন কি হলো? সে বললো, সে তো অনেক রাগ হয়েছে এবং বলেছে- গাঙ্গুহ হলে তোমাকে শক্ত শাস্তি দিতাম। তিনি বললেন, ওহ্হো! এখনো তো অনেক ত্রুটি আছে। এখনো চাউল গলেনি।

আরো কিছু দিন অতিবাহিত হলে শাইখ মেথরকে বললেন, এখন টুকরি নিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করবে, যেন টুকরি তার শরীরের সাথে লেগে যায় তারপর আমাকে বলবে কি হলো? সে তাই করলো। শাইখ জানতে চাইলেন কি হলো? সে বললো, যখন আমি টুকরি নিয়ে তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করি এবং তার শরীরের সাথে টুকরির ঘষা লাগে, তখন সে অত্যন্ত কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় কিন্তু মুখে কিছু বলেনি। শাইখ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। উপকার হচ্ছে।

এখন দিলের ভুত ভেঙ্গেছে

তার কিছুদিন পর শাইখ বললেন, এবার এমনভাবে অতিক্রম করবে যে, টুকরি পড়ে গিয়ে অল্প ময়লা তার উপরেও যেন পড়ে। তারপর সে কি বলে

তা আমাকে বলবে। সে তাই করলো। শাইখ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি অবস্থা? সে বললো, এবার তো অবাক করার মতো ঘটনা ঘটেছে। আমি টুকরি ফেললে তার উপরও ময়লা পড়লো এবং আমিও পড়ে গেলাম। তখন সে তার নিজের কাপড়ের ব্যাপারে কোনো চিন্তা না করে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে, ব্যথা লাগেনি তো? শাইখ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শোকর। অন্তরে যে ভুত ছিলো তা বের হয়ে গেছে।

এবার তাকে ডেকে দায়িত্ব পরিবর্তন করে দিলেন। বললেন, এখন আর তোমাকে হাম্মামের কাজ করতে হবে না। এখন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমি কখনো কখনো শিকার করতে যাই। তখন আমার শিকারী কুত্তার শিকল ধরে আমার সাথে যাবে। এখন কিছুটা উঁচু স্তর লাভ হলো। শাইখের সঙ্গে সোহবত ও সাহচর্যের মর্যাদা লাভ হলো। তবে কুকুরের শিকল ধরে সাথে চলার নির্দেশ দেওয়া হলো। শিকার করার সময় কুকুর কোনো শিকার দেখলে সেদিকে দৌড় দেয়। শাইখ হুকুম করেছেন শিকল ছাড়বে না। এজন্য তিনি শিকল ছাড়েন না। কুকুর জোরে দৌড়াচ্ছিলো, কিন্তু তিনি শিকল ছাড়ছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে যান। কুকুরের পিছনে পিছনে মাটিতে ছেচড়িয়ে চলছিলেন। শরীরের কয়েক জায়গা যখম হয়ে যায়। তিনি রক্তাক্ত হয়ে যান।

সেই দৌলত আপনাকে দেওয়া হলো

রাতের বেলা শাইখ নিজের শাইখ হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-কে স্বপ্ন দেখলেন। তিনি বললেন, মিয়াঁ আমি তো তোমার দ্বারা এতো পরিশ্রম করাইনি। তখন তিনি সতর্ক হলেন। তাকে কাছে ডাকলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনি যেই দৌলত নিতে এসেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেই দৌলত আপনাদের ঘরে দান করেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তার পুরোটা আপনাকে ন্যস্ত করেছি। দাদার উত্তরাধীকার আপনার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দয়ায় এখন আপনি নিশ্চিন্তে দেশে ফিরে যান।

ইসলাহের আসল উদ্দেশ্য

এ ঘটনা শোনানোর মূল উদ্দেশ্য হলো, সূফীয়ায়ে কেরামের আসল কাজ ছিলো আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা। কেবল ওযীফা, যিকির, তাসবীহ ও

মা'মুলাত বলে দেয়া নয়। যিকির ওযীফা তাসবীহ ও মা'মুলাত হলো শক্তিবর্ধক খাবারের মতো। ইসলাহের সহযোগিতার জন্য এগুলো করানো হতো। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিলো আধ্যাত্মিক রোগ দূর করা। আত্মা থেকে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, আত্মশ্লাঘা, কপটতা, প্রদর্শন প্রবৃত্তি, পদলিপ্সা, দুনিয়ার মোহ ইত্যাদি বের করা। আত্মাকে এসব থেকে মুক্ত করা। আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা। আল্লাহর প্রতি আশা জাগ্রত করা। তাওয়াক্কুল, ইস্তিকামাত, ইখলাস ও আল্লাহর জন্য বিনয় সৃষ্টি করা তাসাউফের আসল উদ্দেশ্য।

আত্মশুদ্ধি জরুরী কেন?

মানুষ মনে করে যে, তাসাওউফ শরীয়ত থেকে ভিন্ন কোনো জিনিস। ভালো করে বুঝুন যে, এটা শরীয়তেরই একটা অংশ। মানুষের বাহ্যিক কাজ-কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যতো বিধান রয়েছে তার সমষ্টির নাম শরীয়ত। আর অভ্যন্তরীণ আমল-আখলাক সম্পৃক্ত বিধানসমূহের সমষ্টির নাম তরীকত ও তাসাওউফ। আত্মার গুরুত্ব এ জন্য বেশি যে, এটা ঠিক না হলে বাহ্যিক আমলও বেকার হয়ে যায়। মনে করুন আমলের মধ্যে ইখলাস নেই। ইখলাস অর্থ কি? ইখলাস অর্থ হলো সব কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তালাশ করা। মানুষ যে কোনো কাজ করবে কেবল আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য করবে। এটা হলো ইখলাস। ইখলাস একটি অভ্যন্তরীণ আমল। কোনো ব্যক্তি যদি ইখলাস ছাড়া নামায পড়ে, এজন্য নামায পড়ে যে, মানুষ আমাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে করবে, ইবাদতগুজার মনে করবে, তার বাহ্যিক আমল তো ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু ভিতরে ইখলাসের প্রাণ নেই এজন্য তার বাহ্যিক এ আমল বেকার। বরং গুনাহের কারণ হবে। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلّٰى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

'যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়লো সে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলো।'[১]

সে যেন আল্লাহর সঙ্গে মাখলুককে শরীক করলো। আল্লাহর পরিবর্তে মাখলুককে খুশি করতে চায়। এজন্য বাহ্যিক আমলকে ঠিক করার জন্যও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি জরুরী। এটা না হলে বাহ্যিক আমলও বেকার হয়ে যাবে।

---

১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ১৬৫১৭

নিজের জন্য আধ্যাত্মিক চিকিৎসক খুঁজে নিন

আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন যে, মানুষ যেহেতু এসব রোগের চিকিৎসা নিজে করতে পারে না, এজন্য কোনো আধ্যাত্মিক চিকিৎসক খুঁজে নিতে হবে। এই চিকিৎসককে পীর বলুন, শাইখ বলুন বা ওস্তাদ বলুন, কিন্তু আসলে তিনি আধ্যাত্মিক রোগের ডাক্তার। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করা পর্যন্ত মানুষ এসব আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত থাকবে। পরিণতিতে তার আমল খারাপ হতে থাকবে।

সামনে যেই অধ্যায় শুরু হচ্ছে এটা তার সামান্য পরিচয়। আখলাকের যতো শাখা রয়েছে তার একেকটির বর্ণনা সামনে আসবে। ভালো আখলাক অর্জনের জন্য কি করতে হবে এবং মন্দ আখলাক দূর করার জন্য কি করতে হবে- তার বিবরণ আসবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে বিষয়টি বোঝার এবং সে অনুপাতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দিল থেকে দুনিয়া বের করে দিন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

'হে লোক সকল নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য তাই তোমাদেরকে যেন দুনিয়ার এ জীবন ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর বিষয়ে তোমাদেরকে যেন ঐ (শয়তান) ধোঁকায় ফেলতে না পারে যে বড়ো ধোঁকাবাজ।'[১]

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জন করা জরুরী। এ ছাড়া দ্বীন-দুনিয়া কোনোটাই পরিশুদ্ধ হতে পারে না। মূলত দুনিয়ার পরিশুদ্ধি দ্বীনের পরিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। এটা শয়তানের ধোঁকা যে, দ্বীন ছাড়াও দুনিয়া উৎকৃষ্ঠ, প্রশান্তিময়, আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক হতে পারে। দুনিয়ার আসবাব-সামগ্রী ও উপায়-উপকরণ লাভ হওয়া ভিন্ন জিনিস, আর প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি, আরাম ও আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ হওয়া ভিন্ন জিনিস। দুনিয়ার

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯ ?????, ১৯শে অক্টোবর ১৯৯২ খৃষ্টাব্দ, শুক্রবার আসরের নামাযের পর বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা ফাতের, আয়াত-৫

উপায়-উপকরণ ও আসবাব-সামগ্রী দ্বীন ছাড়াও লাভ হতে পারে, টাকার স্তূপ হতে পারে, বাংলো তৈরী হতে পারে, কারখানা দাঁড়িয়ে যেতে পারে, গাড়ি লাভ হতে পারে, কিন্তু মনের প্রশান্তি দ্বীন ছাড়া লাভ হতে পারে না। এ কারণেই দুনিয়ার প্রকৃত শান্তিও কেবল সেসব আল্লাহর ওলী লাভ করে থাকেন, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ তা'আলার বিধানের অনুগামী করেন। এজন্য নিজের আত্মিক চরিত্র সংশোধন করা ছাড়া দ্বীন-দুনিয়া কোনোটাই সঠিক হতে পারে না। আত্মিক চরিত্রাবলির মধ্যে থেকে বিগত জুমায় দু'টি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো আল্লাহর ভয় আরেকটি হলো তার রহমতের আশা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এগুলো অর্জন করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

'যুহদে'র হাকীকত

আজকেও অত্যন্ত মৌলিক একটি আখলাকের বর্ণনা হবে, যাকে 'যুহদ' বলা হয়। আপনারা এ শব্দ অনেকবার শুনে থাকবেন যে, অমুক ব্যক্তি বড়ো আবেদ, যাহেদ। যার মধ্যে 'যুহদ' রয়েছে তাকে 'যাহেদ' বলে। 'যুহদ' একটি আত্মিক গুণ। যা প্রত্যেক মুসলমানের অর্জন করা জরুরী। যুহদের অর্থ দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়া, দুনিয়ার মহব্বত থেকে আত্মা মুক্ত হওয়া, দুনিয়ার মধ্যে দিল আটকে না থাকা, দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে এভাবে গেঁথে না দেওয়া যে, সবসময় তারই ধ্যান, তারই চিন্তা, তারই কল্পনা এবং তারই জন্য দৌড় ঝাপ চলছে, এর নাম হলো 'যুহদ'।

দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গোনাহের মূল

প্রত্যেক মুসলমানের এই গুণ অর্জন করা এ জন্য জরুরী যে, দুনিয়ার ভালোবাসা যদি আত্মাকে আচ্ছন্ন করে নেয় তাহলে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অন্তরে আসতে পারে না। যখন আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অন্তরে থাকে না তখন মানুষের ভালোবাসা ভুল পথে গমন করে। এ কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

'দুনিয়ার ভালোবাসা সব গোনাহের মূল।'[১]

মানুষ যদি সমস্ত অন্যায় অপরাধের স্বরূপ নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সব কিছুর মধ্যে দুনিয়ার ভালোবাসা কার্যকর দেখতে পাবে। চোর চুরি করছে কেন? দুনিয়ার ভালোবাসার কারণে। কেউ অপকর্ম করছে, তো কেন করছে? দুনিয়ার স্বাদের ভালোবাসা অন্তরে জমে আছে, তাই করছে। মদ্যপ দুনিয়ার স্বাদের পিছনে পড়ার কারণে মদ পান করছে। যে কোনো গোনাহের বিষয়ে চিন্তা করবেন তার পিছনে দুনিয়ার ভালোবাসা কার্যকর দেখতে পাবেন। দুনিয়ার ভালোবাসা যখন আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখন আল্লাহর মহব্বত কি করে সেখানে প্রবেশ করবে?

হযরত আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা

আত্মাকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে বানিয়েছেন যে, তার মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা কেবল একজনেরই থাকতে পারে। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক লোকের সঙ্গেই সম্পর্ক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা হবে একজনেরই। একজনের মহব্বত সৃষ্টি হলে অন্যদের মহব্বত ঐ পর্যায়ের আর আসতে পারে না। একারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সম্পর্কে বলেছেন-

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

'আমি যদি দুনিয়াতে কাউকে প্রিয় বানাতাম তাহলে আবু বকর রাযি.-কে প্রিয় বানাতাম।'[২]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর সঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পরিমাণ সম্পর্ক ছিলো যে, দুনিয়াতে আর কারো সঙ্গেই এমন সম্পর্ক ছিলো না। এমনকি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন-

---

১. কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৪, হাদীস নং ৬১১৪, জামেউল আহাদীস, খণ্ড-৪১, পৃষ্ঠা-৩২৫, হাদীস নং ৪৫০৩০, জামেউল উলূমি ওয়াল হিকাম, খণ্ড-৩১, পৃষ্ঠা-৩৪, আদদুররুল মুনাসসারা, খণ্ড-১, পৃঃ ৯, জামেউল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৪২০, হাদীস নং ২৬০৩, আদদুররুল মানসূর, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৮৮

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৮৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩৯০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৯০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৩৯৯

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীর রাযি.-এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি আয়না রাখা হলো আর সেই আয়নার মধ্যে তার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হলো তখন বলা হবে যে, ইনি হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আয়নার মধ্যে যেই প্রতিবিম্ব রয়েছে তিনি হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মাকাম এতো উর্ধ্বে ছিলো। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, তাকে আমি আমার প্রিয় বানাচ্ছি। বরং বলেছেন, যদি আমি কাউকে প্রিয় বানাতাম তাহলে তাকে বানাতাম। কিন্তু আমার প্রকৃত প্রিয় তো আল্লাহ তা'আলা। তিনি যখন প্রিয় হয়েছেন তখন অন্য কারো সঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসার জন্য অন্তরে জায়গা নেই। হ্যাঁ অন্যের সাথে সম্পর্ক হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে। যেমন স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক, সন্তানের সাথে সম্পর্ক, মায়ের সাথে সম্পর্ক, বাপের সাথে সম্পর্ক, ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক, বোনের সাথে সম্পর্ক, কিন্তু এ সমস্ত সম্পর্ক অন্তরে আল্লাহ তা'আলার যেই ভালোবাসার রয়েছে, তার অনুগামী হয়ে থাকে।

আত্মা একজনের ভালোবাসাই ধারণ করতে পারে

অন্তরে প্রকৃত ভালোবাসা হয় আল্লাহর হবে, না হয় দুনিয়ার হবে। উভয় ভালোবাসা এক সঙ্গে একত্রিত হতে পারে না। এ কারণে মাওলানা রূমী রহ. বলেন-

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں

ایں خیال است و محال است و جنوں

অর্থাৎ, দুনিয়ার ভালোবাসাও অন্তরে থাকবে আবার আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসাও অন্তরে থাকবে এ উভয়টা একত্রিত হতে পারে না। এ নিছক কল্পনা, অসম্ভব, পাগলামী। এজন্য অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত যদি ছেয়ে যায় তাহলে আল্লাহর মহব্বত আসবে না। আল্লাহর মহব্বত যখন থাকবে না তখন দ্বীনের সমস্ত কাজ নিষ্প্রাণ ও মূল্যহীন হবে। তা আদায় করতে পেরেশানী, জটিলতা ও কষ্ট মনে হবে। প্রকৃত অর্থে তখন দ্বীনের কাজ সম্পাদিত হতে পারবে না। তখন পদে পদে মানুষ হোঁচট খাবে। এজন্য অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতকে জায়গা না দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এরই নাম 'যুহদ'। আর 'যুহদ' অর্জন করা জরুরী।

দুনিয়াতে আছি, কিন্তু দুনিয়া-অন্বেষী নই

তবে ভালোভাবে অনুধাবন করুন যে, বিষয়টি অনেক কঠিন। কারণ, দুনিয়া ছাড়া চলাও সম্ভব নয়। দুনিয়াতে থাকতে হবে। ক্ষুধা লাগলে আহার করতে হবে। পিপাসা লাগলে পানি পান করতে হবে। মাথা গোঁজার জন্যে ঘরের প্রয়োজন রয়েছে। জীবন ধারণের জন্যে জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে যে, মানুষের সাথে এতো সব বিষয় জড়িত থাকা সত্ত্বেও, দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করেও এবং দুনিয়ার প্রয়োজনসমূহ পূরা করেও অন্তরে দুনিয়া আসবে না, তা কি করে সম্ভব? এমতাবস্থায় কি করে আত্মা দুনিয়াবিমুখ হবে? এতদুভয় বিষয় একত্রিত হওয়া তো কঠিন মনে হয়। নবীগণ এবং তাদের ওয়ারিশগণ এ বিষয়টি শিক্ষা দিয়ে থাকেন যে, তোমরা দুনিয়াতে থেকেও কীভাবে দুনিয়ার মহব্বতকে অন্তরে জায়গা দিবে না। একজন প্রকৃত মুসলিম দুনিয়ার মধ্যে অবস্থানও করবে, মানুষের সাথে সম্পর্কও রাখবে, তাদের হকও আদায় করবে, একই সাথে দুনিয়ার মহব্বত থেকেও বেঁচে থাকবে। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব রহ. বলেন,

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں

'দুনিয়াতে রয়েছি, কিন্তু দুনিয়ার অন্বেষী নই,
বাজার অতিক্রম করছি, কিন্তু খরিদ্দার নই।'

এ অবস্থা কি করে সৃষ্টি হয় যে, মানুষ দুনিয়ার মধ্যে থাকবে, দুনিয়ার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে, দুনিয়াকে ব্যবহার করবে, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে আসবে না?

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

এ বিষয়টিই হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী রহ. একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। বড়ো চমৎকার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেন, দুনিয়া ছাড়া মানুষ চলতে পারবে না। দুনিয়ায় বসবাস করতে পার্থিব অসংখ্য প্রয়োজন মানুষের রয়েছে। মানুষের দৃষ্টান্ত নৌকার ন্যায়, আর দুনিয়ার দৃষ্টান্ত পানির ন্যায়। পানি ছাড়া নৌকা চলতে পারে না। কেউ যদি স্থলভাগে নৌকা চালাতে চায় নৌকা চলবে না। তেমনিভাবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দুনিয়া

প্রয়োজন। বেঁচে থাকতে হলে পয়সা লাগবে, খাদ্য লাগবে, পানি লাগবে, বাড়ি লাগবে, কাপড় লাগবে এসব কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে। আর এ সব কিছুই দুনিয়া। কিন্তু পানি নৌকার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী যতক্ষণ পর্যন্ত তা নৌকার নীচে, ডানে বামে এবং সামনে পিছনে থাকে। পানি তখন নৌকাকে চলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই পানিই যদি নৌকার ভিতরে ঢুকে পড়ে তাহলে তা নৌকাকে ডুবিয়ে দেয়, ধ্বংস করে।

তেমনিভাবে এ সমস্ত উপকরণ এবং দুনিয়ার এ সমস্ত সাজ সরঞ্জাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চর্তুদিকে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ভয় নেই। এ সমস্ত সামগ্রী তোমাদের জীবনের নৌকাকে পরিচালিত করবে। কিন্তু যেদিন দুনিয়ার এসব সাজ সরঞ্জাম তোমাদের আত্মার নৌকায় প্রবেশ করবে সেদিন তোমাদেরকে ডুবিয়ে দিবে। মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

آب اندر زیر کشتی پشتی است

آب در کشتی ہلاک کشتی است

অর্থাৎ, পানি যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকার চর্তুদিকে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা নৌকাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু ঐ পানি যদি নৌকার ভিতরে প্রবেশ করে তখন তা নৌকাকে ডুবিয়ে দেয়।

দুই ভালোবাসা একত্রিত হতে পারে না

দুনিয়া তোমার চর্তুপার্শ্বে থাকবে কিন্তু তার ভালোবাসা তোমার অন্তরে প্রবেশ করবে না, এরই নাম 'যুহদ'। কারণ দুনিয়ার মহব্বত যদি তোমার অন্তরে প্রবেশ করে তাহলে আল্লাহর মহব্বতের জন্য অন্তরে জায়গা থাকবে না। আল্লাহর মহব্বত দুনিয়ার মহব্বতের সাথে একত্রিত হতে পারে না। আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (কু.সি.) একটি শের শোনাতেন। সম্ভবত হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী রহ.-এর শাইখ হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ রহ.-এর শের বলে তিনি উল্লেখ করতেন। এ শেরের মাকামও তাঁর পর্যায়েরই। তিনি বলেন,

بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال

کب سماوے اس میں حب ذوالجلال

অর্থাৎ, ধন-দৌলত ও পদ-পদবীর ভালোবাসায় যখন আত্মা পরিপূর্ণ, তখন তাতে আল্লাহর মহব্বতের জায়গা কি করে হবে?

এজন্য এই দুনিয়ার ভালোবাসা আত্মা থেকে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াকে বের করে দেওয়া জরুরী নয়, দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা জরুরী নয়, দুনিয়ার ভালোবাসা বের করা জরুরী। দুনিয়া যদি থাকে আর তার ভালোবাসা না থাকে সেই দুনিয়া ক্ষতিকর নয়।

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত টয়লেটের মতো

সাধারণত এ বিষয়টি বুঝে আসে না যে, একদিকে মানুষ এ দুনিয়াকে জরুরীও মনে করবে, তাকে গুরুত্বপূর্ণও মনে করবে, কিন্তু তার ভালোবাসা অন্তরে থাকবে না, তা কি করে সম্ভব! বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝুন। আপনি যখন কোনো বাড়ি বানান, সেই বাড়ির বিভিন্ন অংশ থাকে। একটি কামরা থাকে ঘুমানোর, একটি থাকে সাক্ষাতের, একটি খানা খাওয়ার ইত্যাদি। সে বাড়িতেই আপনি একটি টয়লেটও বানান। টয়লেট ছাড়া বাড়ি অসম্পূর্ণ। একটি জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি রয়েছে, তার কামরা সুন্দর, বেড রুম খুব উন্নত মানের, ড্রইং রুমও উন্নত মানের, ডাইনিং রুমও উন্নত মানের, পুরো ঘরে অনেক দামী দামী ফার্নিচার সাজানো রয়েছে, কিন্তু তাতে টয়লেট নেই, বলুন! সে বাড়ি কি পরিপূর্ণ, না অসম্পূর্ণ? বলা বাহুল্য যে, সে বাড়িটি অসম্পূর্ণ। টয়লেট ছাড়া কোনো বাড়ি পরিপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু বলুন, এমন কোনো মানুষ আছে কি, যার আত্মা সব সময় টয়লেটের সাথে সংযুক্ত থাকবে? তার মন-মস্তিষ্কে সব সময় এ চিন্তা বিরাজ করবে যে, কখন আমি টয়লেটে যাবো, কখন তাতে বসবো, কিভাবে বসবো, কতক্ষণ বসবো, কখন বের হয়ে আসবো? বলা বাহুল্য যে, কোনো মানুষই নিজের মন-মস্তিষ্কে টয়লেটকে এভাবে চাপিয়ে দিবে না। কখনই নিজের অন্তরে তাকে জায়গা দিবে না। যদিও সে জানে টয়লেট জরুরী জিনিস। এটা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সব সময় সে এ চিন্তায় থাকবে না যে, আমি টয়লেটকে কি করে সাজাবো, কিভাবে আরামদায়ক বানাবো। কারণ, টয়লেটের ভালোবাসা অন্তরে নেই।

দুনিয়ার জীবন যেন ধোঁকায় না ফেলে

দ্বীনের শিক্ষা মূলত এই যে, এ সমস্ত ধন সম্পদ ও সাজ সরঞ্জামও জরুরী এবং এমনই জরুরী যেমন টয়লেট জরুরী। কিন্তু তার চিন্তা, তার

ভালোবাসা ও তার কল্পনা যেন মন মগজকে আচ্ছন্ন করে না রাখে। এটা হলো দুনিয়ার হাকীকত। এজন্য বুযুর্গগণ বলেছেন, দুনিয়ার হাকীকত সব সময় স্মরণ রাখবে। আমি যেই আয়াত আপনাদের সামনে এখন তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

'হে লোক সকল! নিশ্চিত বিশ্বাস করো যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তাই দুনিয়ার এ জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর বিষয়ে তোমাদেরকে সেই (শয়তানও) যেন ধোঁকায় না ফেলতে পারে, যে বড় প্রতারক।'[১]

হে লোক সকল! আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর ওয়াদা কি? সেই ওয়াদা হলো একদিন তুমি মরবে। তার সামনে তোমাকে উপস্থিত হতে হবে। তোমাকে সমস্ত আমলের জওয়াব দিতে হবে। এজন্য দুনিয়ার জীবন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। আর সেই ধোঁকাবাজ অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে। শরীয়তের শিক্ষা হলো দুনিয়াতে অবস্থান করো কিন্তু তার দ্বারা ধোঁকা খেয়ো না। কারণ এটা পরীক্ষার জায়গা। এখানে এমন অনেক দৃশ্য রয়েছে, যা মানুষের আত্মাকে আকৃষ্ট করে। মোহগ্রস্থ করে। তাই মনোহরী এসব দৃশ্যের ভালোবাসাকে অন্তরে জায়গা দিও না। দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা হলেও কোনো সমস্যা নেই, যদি তার সঙ্গে আত্মা যুক্ত না হয়।

শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর ঘটনা

আল্লাহর কতক বান্দা এমন আছেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কতক সূক্ষ্ম শক্তিকে তাদের কাছে পাঠিয়ে থাকেন। এসব সূক্ষ্ম শক্তিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য থাকে এ বান্দাকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে বের করে নিজের মহব্বতের দিকে নিয়ে আসা। হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ঘটনা আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (কু.সি.) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. ইউনানী ঔষধ ও আতরের অনেক বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। এ কারণেই তাকে 'আত্তার' বলা হয়। তার ঔষধ ও

---

১. সূরা ফাতের, আয়াত-৫

আতরের অনেক বড়ো দোকান ছিলো। সুবিস্তৃত কারবার ছিলো। তখন তিনি একজন সাধারণ কিসিমের দুনিয়াদার ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন তিনি দোকানে বসা ছিলেন। দোকান ঔষধ ও আতরের শিশি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। এমন সময় একজন মাজযুব ধরনের দরবেশ ও মালং কিসিমের মানুষ দোকানে এলেন। তিনি দোকানের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোকানের ভিতরে দাঁড়িয়ে পুরো দোকান কখনো উপর থেকে নিচের দিকে দেখছিলেন, কখনো ডান থেকে বাম দিকে দেখছিলেন। কখনো ঔষধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কখনো এক শিশি দেখছিলেন, কখনো অন্য শিশি দেখছিলেন। এভাবে যখন অনেক সময় পার হয়ে গেলো তখন শাইখ ফরীদ উদ্দীন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখছো? কোন জিনিস তালাশ করছো? ঐ দরবেশ উত্তর দিলেন, এমনিই শিশিগুলো দেখছি। শাইখ ফরীদ উদ্দীন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কিছু কেনার ইচ্ছা আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন, না আমার কিছু কেনার ইচ্ছা নেই। এমনিতেই দেখছি। তারপর আবার আলমারীতে সংরক্ষিত শিশিগুলোর দিকে দেখছিলেন। বার বার দেখছিলেন। শাইখ ফরীদ উদ্দীন আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই তুমি দেখছোটা কি? তখন ঐ দরবেশ বললেন, আমি আসলে দেখছি, আপনি যখন মরা যাবেন তখন আপনার জান কীভাবে বের হবে? কারণ, আপনি এখানে এতগুলো শিশি রেখেছেন, আপনার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসবে তখন আপনার রূহ কখনো এই শিশির মধ্যে প্রবেশ করবে, কখনো ঐ শিশির মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন সে বের হওয়ার রাস্তা কোথায় পাবে?

বলা বাহুল্য যে, শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. তখন একজন দুনিয়াদার ব্যবসায়ী ছিলেন। এসব কথা শুনে তার রাগ হলো। তিনি বললেন, তুমি আমার জানের চিন্তা করছো তোমার জান কীভাবে বের হবে? তোমার জান যেভাবে বের হবে, আমারটাও সেভাবে বের হবে। ঐ দরবেশ উত্তর দিলেন, আমার জান বের হতে তো কোনো পেরেশানী নেই। কারণ আমার কাছে তো কিছু নেই। আমার কাছে ব্যবসা, দোকান, শিশি, সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নেই। আমার জান তো এভাবে বের হয়ে যাবে। একথা বলে ঐ দরবেশ দোকানের বাইরে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন। কালিমায়ে শাহাদাত আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন এবং তার রূহ উড়ে গেলো।

এ ঘটনা দেখা মাত্র হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর অন্তরে বড়ো আঘাত লাগলো। তিনি চিন্তা করলেন, বাস্তবকই তো আমি রাত-দিন

দুনিয়ার কারবার নিয়েই নিমগ্ন রয়েছি এবং এতেই ব্যস্ত রয়েছি। আল্লাহ তা'আলার দিকে কোনো মনযোগ নেই। আর আল্লাহর এ বান্দা কতো সহজে আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। যাই হোক, ইনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গাইবী লতীফা ছিলেন, যিনি তার হেদায়েতের কারণ হলেন। সেদিনই তিনি নিজের সব কায়কারবার অন্যদের হাতে ন্যস্ত করলেন। আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করলেন। আল্লাহর পথে অবিচল থেকে এতো বড়ো শাইখ হলেন যে, তিনি দুনিয়াবাসীর হেদায়েতের উপকরণ হলেন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.-এর ঘটনা

শাইখ ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. এক অঞ্চলের বাদশাহ ছিলেন। রাতে দেখলেন তার মহলের ছাদের উপর এক ব্যক্তি বিচরণ করছে। তিনি মনে করলেন হয়তো কোনো চোর হবে, চুরি করার ইচ্ছায় এসেছে। ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কোথেকে এলে? কি করছো এখানে? সে বললো, আমার একটি উট হারিয়ে গেছে, সেই উট তালাশ করছি। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. বললেন, তোমার মাথা ঠিক আছে কি? মহলের ছাদের উপর উট কোথায়? তোমার উট যদি হারিয়ে যেয়ে থাকে তাহলে বন জঙ্গলে গিয়ে খোঁজো। মহলের ছাদের উপর উট খোঁজা তো আহাম্মকী। তুমি তো আহাম্মক মানুষ দেখছি! লোকটি বললো, মহলের ছাদের উপর যদি উট পাওয়া না যায় তাহলে মহলের মধ্যে আল্লাহকেও পাওয়া যাবে না। আমি যদি আহাম্মক হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমার চেয়ে বড়ো আহাম্মক। মহলের মধ্যে থেকে আল্লাহকে তালাশ করা এর চে' বড়ো আহাম্মকী। এ কথা বলা মাত্র তার অন্তরে মারাত্মক আঘাত লাগলো। বাদশাহী ছেড়ে বের হয়ে গেলেন। ইনিও আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী লতীফা ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করুন

আমাদের মতো মানুষদের জন্য এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করা তো ঠিক নয় যে, তারা যেমন সবকিছু ছেড়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য বের হয়ে পড়েছেন আমরাও তেমনি বের হয়ে যাবো। আমাদের মতো দুর্বল মানুষদের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা সমীচীন নয়। তবে এ ঘটনা থেকে যে বিষয় শিক্ষা নেওয়া উচিত তা হলো, মানুষের আত্মা যদি দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের

মধ্যে এবং দুনিয়ার আরাম আয়েশের মধ্যে আটকা থাকে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুনিয়া উপার্জনের দৌড়-ঝাঁপে মগ্ন থাকে, এমন অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত আসতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত যখন অন্তরে আসে তখন মানুষের কাছে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম থাকে ঠিক, কিন্তু সেগুলোর সাথে আত্মা আটকা থাকে না।

আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. ও দুনিয়ার মহব্বত

আল্লাহ তা'আলা আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী ছাহেব (কু.সি.)-এর ব্যক্তি সত্তার মধ্যে আমাদেরকে শরীয়ত ও তরীকতের অসংখ্য নমুনা দেখিয়েছেন। আমরা যদি তাকে না দেখতাম তাহলে আমাদের বুঝে আসতো না যে, সুন্নাতের বাস্তব জীবন কেমন হয়ে থাকে? তিনি দুনিয়াতে থেকে সব কাজ করেছেন। দরস্-তাদরীস করেছেন, ফতওয়া লিখেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, ওয়ায ও তাবলীগ করেছেন, পীর মুরীদি করেছেন, একই সাথে পরিবার পরিজনের হক আদায় এবং জীবিকার ব্যবস্থার জন্যে ব্যবসাও করেছেন। কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও আমি দেখেছি তার অন্তরে সরীষা দানার পরিমাণ দুনিয়ার মহব্বত প্রবেশ করেনি।

ঐ বাগান আমার আত্মা থেকে বের হয়ে গেছে

আমার ওয়ালেদ মাজেদের বাগান বানানোর খুব শখ ছিলো। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে দেওবন্দেই খুব আগ্রহের সাথে একটি বাগান তৈরী করেন। দারুল উলূম দেওবন্দের চাকরির সময় বেতন কম এবং পোষ্য বেশি ছিলো। ঐ বেতন দিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত হতো। কিন্তু তা থেকেই অতি কষ্টে কিছু ব্যবস্থা করে আমের বাগান লাগান। এ বাগানে প্রথম যখন ফল আসে ঐ বছরই পাকিস্তান হওয়ার ঘোষণা হয়। তিনি হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। হিজরত করে পাকিস্তানে আসেন। ঐ বাগান এবং বাড়ি হিন্দুরা দখল করে নেয়। পরবর্তীতে অনেক বার হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের মুখে এ বাক্য শুনেছি যে, যেদিন আমি ঐ বাড়ি ও বাগান থেকে পা বের করেছি, সেদিন থেকে ঐ বাগান ও বাড়ি আমার আত্মা থেকে বের হয়ে গেছে। ভুলেও আমার অন্তরে কখনো চিন্তা জাগেনি যে, আমি কেমন বাগান বানিয়েছিলাম এবং কেমন ঘর তৈরী করেছিলাম। এর কারণ এই ছিলো যে, এসব কাজ তিনি অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিলো পোষ্যদের হক আদায় করা। এগুলোর সাথে তার আত্মা আটকা ছিলো না।

দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে চলে আসে

সারাজীবন হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের এ নিয়ম দেখেছি যে, যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিসের ব্যাপারে বিনা কারণে তার সাথে ঝগড়া করতো তখনই হযরত ওয়ালেদ ছাহেব হকের উপর থাকা সত্ত্বেও বলতেন, আরে ভাই! ঝগড়া বাদ দাও, এটা নিয়ে যাও। নিজের হক ছেড়ে দিতেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শোনাতেন,

وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘর দেওয়ানোর দায়িত্ব নিচ্ছি, যে সত্যের উপর থেকেও ঝগড়া পরিহার করবে।'[১]

হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে সারাজীবন এ হাদীসের উপর আমল করতে দেখেছি। অনেক সময় আমাদের মনে হতো, তিনি হকের উপর আছেন, অটল থাকলে তিনি নিজের হক পেয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি হক ছেড়ে দিয়ে চলে আসতেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াও দান করেন। এমন লোকদের কাছে দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে আসে, যেমন হাদীস শরীফে এসেছে,

أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একবার এ দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দুনিয়াকে অপমানিত করে দেন। দুনিয়া তার পায়ের উপরে এসে আছড়ে পড়ে। কিন্তু তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে না।[২]

দুনিয়া ছায়ার ন্যায়

জনৈক ব্যক্তি দুনিয়ার বড়ো চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, দুনিয়ার দৃষ্টান্ত মানুষের ছায়ার ন্যায়। কেউ যদি নিজের ছায়ার পশ্চাদ গমন করতে চায় এবং তাকে ধরতে চায় তাহলে তার ফল এই হবে যে, সে তার ছায়ার পিছনে যতো দৌড়াবে তার ছায়া আরো সম্মুখে দৌড়াতে থাকবে। কখনই তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু মানুষ যদি তার ছায়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯১৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৫০

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০৯৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২০৬০৮, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২৩১

নিয়ে বিপরীত দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করে তাহলে ছায়া তার পিছনে পিছনে আসবে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকেও এমনই বানিয়েছেন। দুনিয়ার অনুসন্ধানী হয়ে এবং তার ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে তার পিছনে পিছনে যদি দৌড়াও তাহলে এ দুনিয়া তোমার আগে আগে দৌড়াবে। কখনই তুমি তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু যেদিন একবার তুমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তখন দেখবে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাকে লাঞ্ছিত করে নিয়ে আসেন। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, দুনিয়া এমন ব্যক্তির কাছে আসে আর সে তাকে লাথি মারে। কিন্তু এ দুনিয়া আবারো তার পায়ের উপরে এসে পড়ে। এর জন্যে একবার খাঁটি অন্তরে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। আর এটা লাভ হয় দুনিয়ার স্বরূপ বুঝলে। দুনিয়ার স্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের হাদীসসমূহে বর্ণনা করেছেন, এসব হাদীস পড়ে দুনিয়ার ভালোবাসা আত্মা থেকে বের করার চিন্তা ও চেষ্টা করা উচিত।

বাহরাইন থেকে সম্পদ এলো

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ

تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

হযরত আমর ইবনে আউফ আনসারী রাযি. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.-কে বাহরাইনের গভর্ণর বানিয়ে পাঠান। তার উপর এ কাজও ন্যস্ত করেন যে, সেখানকার কাফের ও মুশরিকদের উপর যেসব জিযিয়া ও ট্যাক্স অবধারিত রয়েছে সেগুলো তাদের থেকে উসূল করে আনবেন। একবার তিনি বাহরাইন থেকে ট্যাক্স ও জিযিয়া নিয়ে মদীনা তাইয়্যেবায় হাজির হলেন, সেগুলো টাকার আকারেও ছিলো, কাপড়ের আকারেও ছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিযিয়ার মাল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। সুতরাং যখন কিছু আনসারী সাহাবী জানতে পারলেন যে, হযরত আবু উবাইদা রাযি. বাহরাইন থেকে মাল এনেছেন তখন তারা ফজরের নামাযে মসজিদে নববীতে হাজির হলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করে ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। তখন ঐ সাহাবীগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসলেন। মুখে কিছু বললেন না। সামনে আসার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, বাহরাইন থেকে যে মাল এসেছে তা আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। এটা ঐ সময় ছিলো যখন সাহাবায়ে কেরাম চরম অভাব অনটনের মধ্যে ছিলেন। কয়েক বেলা করে উপবাস করতে হতো। পরিধান করার কাপড় ছিলো না। চরম সংকটকাল চলছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে এভাবে সামনে আসতে দেখে মুচকি হাসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এরা সম্পদ বণ্টন করার আবেদন নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তোমরা হয়তো জানতে পেরেছো আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ বাহরাইন থেকে কিছু মাল নিয়ে এসেছে। তারা বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাদেরকে বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদেরকে আনন্দ দানকারী জিনিস তোমরা পাবে। এই সম্পদ তোমরা লাভ করবে।[১]

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭১২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৬১, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৮৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫৯৯

তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের ভয় নেই

কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুভব করলেন, সাহাবায়ে কেরামের এভাবে আসা নিজেদেরকে এ জন্য পেশ করা এবং সম্পদ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করা আবার তাদের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা সৃষ্টি না করে। এজন্য তিনি তাদেরকে সুসংবাদ শোনানোর পর অবিলম্বে বলেন,

فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

আল্লাহর শপথ তোমাদের উপর অভাব অনটনের আশঙ্কা আমি করি না। অর্থাৎ, এ বিষয়ের আশঙ্কা নেই যে, তোমাদের উপর অভাব অনটন অতিবাহিত হবে। তোমরা জীবিকার সঙ্কটে আক্রান্ত হবে। কষ্ট ও পেরেশানীতে আক্রান্ত হবে। কারণ, এখন তো ইনশাআল্লাহ এমন এক জামানা আগমন করবে, যখন মুসলিমদের মধ্যে সচ্ছলতা বিস্তার লাভ করবে।[১]

মূলত উম্মতের অভাব অনটনের পূরোটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বহন করেছেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তিন তিন মাস পর্যন্ত আমাদের ঘরে আগুন জ্বলতো না। তখন শুধু দু'টা জিনিসের সমন্বয়ে আমাদের খাবার ছিলো, খেজুর ও পানি।[২]

দোজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দুই বেলা পেট পুরে রুটি খাননি। গম তো পাওয়াই যেতো না, যবের রুটিরও এ অবস্থা ছিলো। তাই সমস্ত অভাব অনটন তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বহন করে গেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে অভাব-অনটন

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, ঐ সময় আমাদের এ অবস্থা ছিলো যে, একবার আমাদের ঘরে কোথাও থেকে ছিট কাপড় হাদিয়া আসে। এটা নকশা

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭১২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৬১, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৮৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫৯৯

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৮২

করা এক ধরনের সূতী কাপড় ছিলো। খুব বেশি দামী কাপড় ছিলো না। কিন্তু পুরো মদীনার মধ্যে কারো যখন বিবাহ হতো এবং কোনো নারীকে বধূরূপে সাজানো হতো তখন আমার কাছে আবদার নিয়ে আসতো যে, ঐ ছিট কাপড় আমাদেরকে ধার দিন আমাদের বধূকে তা পরাবো। বিবাহের সময় তা বধূদেরকে পরানো হতো। পরবর্তীতে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, বর্তমানে ঐ ধরনের অনেক কাপড় বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ঐ কাপড়ই আজ যদি আমি দাসী-বাঁদীকেও দেই তাহলেও সে নাক ছিটকিয়ে বলে, আমি তো এ কাপড় পরবো না। এতেই অনুমান করুন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কি পরিমাণ অভাব ছিলো, আর এখন কেমন সচ্ছলতা রয়েছে।

এ দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধ্বংস না করে

এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আগামীতে প্রথমত উম্মতের উপর ব্যাপক অভাব অনটন আসবে না। সুতরাং মুসলিমদের পুরো ইতিহাস ঘেটে দেখুন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ব্যাপক অভাব অনটন কখনো আসেনি, বরং স্বচ্ছলতার যুগ এসেছে। তিনি বলেছেন, মুসলিমদের উপর অভাব অনটন আসলেও সে কারণে আমি ক্ষতির আশঙ্কা করি না, বেশির চে' বেশি পার্থিব কষ্ট হবে, কিন্তু সে কারণে গোমরাহী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আশঙ্কা রয়েছে যে, তোমাদের উপর এভাবে দুনিয়ার প্রসার ঘটানো হবে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ঘটানো হয়েছে। তোমাদের চর্তুদিকে দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম ও ধন-দৌলতের স্তুপ লেগে থাকবে তখন তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে। একে অপরের থেকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে। চিন্তা করবে অমুকের যেমন বাংলো আছে আমারও যেন তেমন হয়। অমুকের যেমন গাড়ি আছে, আমারও যেন তেমন থাকে। অমুকের যেমন কাপড় আছে, আমারও যেন তেমন হয়। বরং তার চেয়ে আগে বাড়ার কামনা হবে। পরিণতি এই হবে যে, এ দুনিয়া তোমাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করবে, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে।

যখন তোমাদের পায়ের নিচে গালিচা বিছানো থাকবে

এক বর্ণনায় এসেছে যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে

যখন তোমাদের পায়ের নীচে গালিচা বিছানো থাকবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথায় সাহাবায়ে কেরাম বড়ো বিস্মিত হলেন। গালিচা তো দূরের কথা আমাদের তো বসার জন্য খেজুর পাতার চাটাইও জোটে না। খালি বিছানায় শুইতে হয়। আমাদের জন্য গালিচার তো প্রশ্নই আসে না। তাই তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট গালিচা কোত্থেকে আসবে?

উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّهَا سَتَكُونُ

আজ যদিও তোমাদের কাছে গালিচা নেই, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন তোমাদের নিকট গালিচা থাকবে।[১]

এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের অভাবের ভয় আমি করছি না, হ্যাঁ, আমি ঐ সময়ের ভয় করছি যখন তোমাদের পায়ের নীচে গালিচা বিছানো থাকবে, দুনিয়াবি সাজ সরঞ্জামের ছড়াছড়ি হবে, তোমাদের চর্তুদিকে দুনিয়া ছড়িয়ে থাকবে, তখন আবার তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে না যাও। তখন তোমাদের উপর দুনিয়া প্রবল হয়ে না যায়।

জান্নাতের রুমাল এর চেয়ে উত্তম

হাদীস শরীফে আছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শাম দেশ থেকে রেশমী কাপড় আসে। এমন কাপড় সাহাবায়ে কেরাম ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম উঠে হাত লাগিয়ে দেখতে আরম্ভ করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম কাপড়টি এভাবে দেখছেন তখন তিনি ইরশাদ করলেন,

لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا

এ কাপড় দেখে তোমরা কি অবাক হচ্ছো? তোমাদের কি এ কাপড় খুব পছন্দ হয়েছে? আরে সাদ ইবনে মু'য়াজ রাযি.-কে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে যে রুমাল দান করেছেন তা এ কাপড় থেকে অনেক উত্তম।[১]

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৬৪, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৩৩৩৩

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিলম্বে সাহাবায়ে কেরামের মনযোগ দুনিয়া থেকে সরিয়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত করলেন। দুনিয়ার মহব্বত যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং তোমরা আখেরাতের নেয়ামতের ব্যাপারে গাফেল না হয়ে পড়ো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদে পদে সাহাবায়ে কেরামের মন-মগজে এ বিষয়টি গেঁথে দিয়েছেন যে, এ দুনিয়া মুল্যহীন, ক্ষণস্থায়ী এবং দুনিয়ার স্বাদ ও নেয়ামত ধ্বংসশীল। দুনিয়া মন লাগানোর জিনিস নয়।

সারা পৃথিবী মশার পাখার সমানও নয়

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً

আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দুনিয়ার মূল্য যদি মশার একটি পাখার সমানও হতো তাহলে কোনো কাফেরকে দুনিয়ার এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।[২]

তোমরা দেখছো যে, দুনিয়ার দৌলত কাফেররা খুব লাভ করছে, তারা খুব ভোগ বিলাসে আছে, অথচ তারা আল্লাহর নাফরমানী করছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে তা সত্ত্বেও তারা দুনিয়া লাভ করছে, এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই। মশার একটি পাখার সমানও সারা পৃথিবীর দাম নেই। দুনিয়ার মূল্য যদি মশার একটি ডানার সমানও হতো তাহলে কাফেরদেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পথ চলছিলেন। পথে তিনি একটি কান কাটা ছাগলের মৃত বাচ্চা পড়ে থাকতে দেখলেন। যা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। তিনি ঐ কান কাটা, মরা বকরীর বাচ্চার দিকে ইশারা করে সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই মরা বাচ্চাটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০১০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫১৪, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৮২, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৭৭৬

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২৪২, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪১০০

করবে? সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ এই বাচ্চা যদি জীবিতও হতো তবুও কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে প্রস্তুত হতো না। আর এখন তো এটা মরা। এই লাশ নিয়ে আমরা কি করবো? এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই পুরো দুনিয়া এবং তার ধন দৌলত আল্লাহ তা'আলার নিকট এরচে' অধিক মূল্যহীন ও নগণ্য, যেই পরিমাণ মূল্যহীন ও নগণ্য তোমাদের নিকট বকরীর এই মরা বাচ্চা।[১]

সারা পৃথিবী তাদের দাসে পরিণত হয়

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে একথা গেঁথে দেন যে, দুনিয়ার সঙ্গে মন লাগিও না। দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হয়ো না। প্রয়োজনের সময় দুনিয়াকে ব্যবহার করো কিন্তু তাকে ভালোবেসো না। এটাই কারণ যে, যখন সাহাবায়ে কেরামের দিল থেকে দুনিয়া বের হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়াকে তাদের গোলাম বানিয়ে দেন। কিসরা তাদের পদতলে স্তুপিকৃত হয়। কায়সার তাদের পদতলে আছড়ে পড়ে। তারা তাদের ধন দৌলতের দিকে চোখ তুলেও দেখেননি।

শামের গভর্ণর হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.

হযরত ওমর রাযি.-এর যামানায় হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.-কে শামের গভর্ণর বানানো হয়। কারণ, শামের বেশির ভাগ অঞ্চল তিনি জয় করেন। তখন শাম ছিলো অনেক বড়ো অঞ্চল। সেই শাম এখন চার দেশে বিভক্ত- সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন। তখন এই চার দেশ মিলে ইসলামী সামরাজ্যের একটি প্রদেশ ছিলো। আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ ছিলেন তার গভর্ণর। শাম প্রদেশটি ছিলো অত্যন্ত উর্বর। ধন-দৌলতের ছড়াছড়ি ছিলো। রোমানদের অত্যন্ত পছন্দনীয় ও কাঙ্খিত অঞ্চল ছিলো। হযরত ওমর রাযি. মদীনা মুনাওওয়ারায় বসে পুরো আলমে ইসলাম পরিচালনা করছিলেন। একবার তিনি পরিদর্শনের জন্য শামে সফরে বের হন। শাম সফরকালে একবার হযরত ওমর রাযি. বললেন, হে আবু উবাইদা! আমার মন চাচ্ছে আমি আমার ভাইয়ের ঘর দেখি যেখানে তুমি থাকো।

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৫৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪৪০২

হযরত ওমর রাযি. চিন্তা করেছিলেন যে, আবু উবাইদা এতো বড়ো প্রদেশের গভর্ণর হয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণ ধন দৌলত রয়েছে। এজন্য তার বাড়ি দেখা উচিত। সে কতো কিছু সঞ্চয় করেছে।

শামের গভর্ণরের বাসস্থান

হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি. উত্তর দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমার ঘর দেখে কি করবেন? কারণ আমার ঘর দেখে অশ্রু বর্ষণ করা ছাড়া আপনার আর কোনো লাভ হবে না। হযরত ওমর ফারুক রাযি. পীড়াপীড়ি করলেন, আমি দেখতে চাই। হযরত আবু উবাইদা রাযি. আমীরুল মু'মিনীনকে নিয়ে গেলেন। শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে শহরের বসতী এলাকা শেষ হলে হযরত ওমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? হযরত আবু উবাইদা উত্তর দিলেন, এখন তো কাছে চলে এসেছি। দুনিয়ার মাল আসবাবে ভরা জাঁকজমকপূর্ণ দামেশক নগরী অতিক্রম করে শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে খেজুরের পাতার তৈরী একটি ঝুপড়ি দেখালেন এবং বললেন, আমীরুল মু'মিনীন আমি এর মধ্যে বসবাস করি। হযরত ওমর ফারুক রাযি. ভিতরে প্রবেশ করে চর্তুদিকে দৃষ্টি বুলালেন। একটি জায়নামায ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখতে পেলেন না। হযরত ওমর ফারুক রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু উবাইদা! তুমি এর মধ্যে থাকো? এখানে তো কোনো সাজ-সরঞ্জাম, কোনো পাত্র এবং পানাহার ও ঘুমানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে তুমি কিভাবে থাকো?

তিনি উত্তর দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই এখানে আছে। এই যে জায়নামায আছে, এর উপর নামায পড়ি। রাতের বেলা এর উপর ঘুমাই। তারপর চালের দিকে হাত বাড়িয়ে একটি পাত্র বের করলেন, যা দেখা যাচ্ছিলো না। পাত্রটি দেখিয়ে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এই যে পাত্র রয়েছে। হযরত ওমর ফারুক রাযি. দেখলেন, পাত্রের মধ্যে পানি ভরা রয়েছে। তার মধ্যে শুকনা রুটির টুকরা ভিজানো রয়েছে। হযরত আবু উবাইদা রাযি. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি রাতদিন সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকি, খানার আয়োজন করার অবসর পাই না। এক মহিলা আমার জন্য দুই-তিন দিনের রুটি এক বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। আমি এই পাত্রের মধ্যে রুটিগুলো রেখে দেই। রুটি

যখন শুকিয়ে যায় তখন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখি, রাতে ঘুমানোর সময় খেয়ে নেই।[1]

বাজার দিয়ে অতিক্রম করেছি, কিন্তু খরিদ্দার নই

এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। হযরত আবু উবাইদা রাযি. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আমার বাড়ি দেখার পর চোখের পানি ফেলা ছাড়া আপনার আর কিছু লাভ হবে না। হযরত ওমর ফারুক রাযি. বললেন, হে আবু উবাইদা! দুনিয়ার এই প্রাচুর্য্য আমাদের সকলকে পাল্টে দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর কসম তুমি তেমনই আছো যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় ছিলে। দুনিয়া তোমার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। মূলত এঁরাই ছিলেন এই পংক্তির বাস্তব নমুনা-

بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں

বাজার দিয়ে অতিক্রম করছি, কিন্তু খরিদ্দার নই।'

সারা পৃথিবী চোখের সামনে, তার মনোলোভা বস্তুসামগ্রী চোখের সামনে, দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণ চোখের সামনে, দুনিয়ার ছড়াছড়ির মধ্যে লালিত অন্যান্য লোক চোখের সামনে, কিন্তু এগুলোর কোনো কিছুই তার চোখে ধরে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত আত্মাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সারা দুনিয়ার ঝলমলানি ধোঁকা দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সদা সর্বদা মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হযরত মাজযুব রহ.-এর ভাষায়-

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے
تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

'চাঁদ উদিত হলে
তারকারা সব অস্ত গেলো,
পরিপূর্ণ আসরের মধ্যে তখন
একমাত্র তোমাকেই
আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।'

---

১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭

এসকল সাহাবায়ে কেরামের পদতলে দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে আসে। তাঁরা দুনিয়ার ভালোবাসাকে অন্তরে জায়গা দেননি। মূলত এটা ছিলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াতের প্রভাব। তিনি বার বার সাহাবায়ে কেরামকে দুনিয়ার হাকীকতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি দুনিয়ার নশ্বরতা, আখেরাতের অবিনশ্বরতা এবং চিরস্থায়ী নেয়ামত ও আযাবের- যার বর্ণনা দ্বারা কুরআন ও হাদীস পরিপূর্ণ- সে দিকে তাঁদেরকে মনযোগী করেছেন।

একদিন মরতে হবে

মানুষ একটু চিন্তা করে দেখুক, এ দুনিয়া কয় দিনের! একদিন, দুই দিন, তিন দিন। কার জানা আছে কয়দিন সে দুনিয়ায় থাকবে? তার কি নিশ্চিত জানা আছে, আগামী ঘণ্টা বরং আগামী মুহূর্ত জীবিত থাকবো? বড়ো থেকে বড়ো বিজ্ঞানী, বড়ো থেকে বড়ো দার্শনিক, বড়ো থেকে বড়ো ক্ষমতাধর ব্যক্তি বলতে পারে না যে, কতো দিন সে দুনিয়ায় থাকবে? কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহে লেগে আছে। দিনরাত দুনিয়ার পিছনে দৌড়-ঝাঁপ করছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ধান্দায় দৌড়াচ্ছে। কিন্তু যেদিন ডাক আসবে সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে। কিছুই সঙ্গে যাবে না।

দুনিয়া ধোঁকার সামগ্রী

এজন্য কুরআনের আয়াত

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

'দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।'[১]

বলছে যে, দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী। এর পিছনে এমনভাবে মগ্ন হয়ো না যে তা তোমাকে গাফেল করে দেয়। এ দুনিয়াতে জীবন কাটাবে ঠিক, কিন্তু ধোঁকা খাবে না। এ কথা যদি অন্তরে বসে যায় তারপর তোমার কুঠি-বাংলো হোক, মিলকারখানা হোক, দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম হোক, ধন-দৌলত হোক এবং ব্যাংক ব্যালেন্স হোক কোনো সমস্যা নেই। অন্তরে যদি এগুলোর ভালোবাসা না থাকে তাহলে তুমি যাহেদ, তুমি দুনিয়াবিরাগী। আলহামদুলিল্লাহ তখন তোমার যুহদের নেয়ামত লাভ হয়েছে।

---

১. সূরা আর হাদীদ, আয়াত-২০

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে কামালো না তো কিছুই, থাকলো হত-দরিদ্র, কিন্তু অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ভরা। তার যুহদের নেয়ামত লাভ হয়নি। তাকে যাহেদ বলা হবে না। কারণ দুনিয়ার প্রেম ও ভালোবাসায় সে আক্রান্ত। এমন ব্যক্তি সবচেয়ে ক্ষতির মধ্যে আছে।

যুহদ কিভাবে লাভ হবে?

এখন প্রশ্ন জাগে যে, এই গুণ কিভাবে অর্জন হবে। এটা অর্জন হওয়ার উপায় হলো, কুরআন ও হাদীসের এসব কথা নিয়ে গভীরভাবে মানুষ চিন্তা করবে। মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর বিষয়ে মুরাকাবা করবে। আখেরাতের নেয়ামতসমূহ এবং আখেরাতের আযাবের কথা চিন্তা করবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ধ্যান করবে। এজন্য প্রতিদিন পাঁচ-দশ মিনিট বের করবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে দুনিয়ার ভালোবাসা আত্মা থেকে দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দুনিয়ার হাকীকত বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ধনলিপ্সা ও পদলিপ্সা আধ্যাত্মিক ব্যাধি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ اَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ

হাদীসটি হযরত কাআব বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, যার ভাবার্থ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে যদি ছাগল পালের ভিতর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তা ঐ ছাগল পালের এ পরিমাণ ক্ষতি করবে না ধনলিপ্সা ও পদলিপ্সা মানুষের দ্বীনের যে পরিমাণ ক্ষতি করে।[১]

প্রথম জিনিস হলো ধনলিপ্সা বা সম্পদের ভালোবাসা। বেশিরভাগ মানুষ এ সম্পর্কে অবগত। দ্বিতীয় জিনিস হলো মর্যাদার ভালোবাসা। যার মধ্যে দুটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত। একটাকে সাধারণত পদলিপ্সা বলা হয়। আর

---

* ইসলাহী মাওয়াইয, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪-৬৫, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২৯৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫২২৪, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২৬১৪

দ্বিতীয়টাকে প্রদর্শন প্রবৃত্তি ও যশ-খ্যাতি বলা হয়। এ দু'টি প্রায় কাছাকাছি, তবে এতদুভয়ের মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

পদলিপ্সার তাৎপর্য

পদলিপ্সার অর্থ হলো মানুষের অন্তরে এই কামনা ও লালসা থাকা যে, মানুষের উপর আমার প্রভাব বিস্তার হোক। প্রভাবশালী পদ ও মাসনাদ লাভ হোক। যাতে মানুষ আমাকে সম্মান করে, আমাকে নেতা বলে মান্য করে। মানুষ আমার কথা মানুক, মানুষের উপর আমার প্রভাব সৃষ্টি হোক এই জিনিসের বাসনাকেই পদলিপ্সা বলে।

যশ-খ্যাতি ও সুনাম কামনা

মানুষ আমাকে বড়ো মনে করুক, আমার সবকিছু পছন্দ করুক, এটাকে সুনাম কামনা বলুন বা প্রদর্শন প্রবৃত্তি এটাও পদলিপ্সার একটি অংশ। এই হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, পদলিপ্সা পদ-পদবীর মাধ্যমে হোক বা প্রশংসা কামানোর মাধ্যমে হোক, এটা মানুষের দ্বীনকে বরবাদ করে যেমন ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগল পালকে বরবাদ করে। বরং এ জিনিস তার চেয়ে বেশি বরবাদ করে। এ বিষয় দুটি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এগুলো খুব নাযুক অবস্থা। এ থেকে বাঁচা তেমনই জরুরী যেমন মদ পান ও শুয়রের মাংস খাওয়া থেকে বাঁচা জরুরী। পদলিপ্সার প্রথম অংশ অর্থাৎ বড়ো পদ-পদবী ও আসন লাভ করার চিন্তা-চেষ্টা করা, যাতে মানুষের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা যায়, ভীতি বিস্তার করা যায় এগুলো নাজায়েয ও হারাম।

এক প্রকারের পদমর্যাদা লাভ করা শরীয়তেও কাঙ্খিত

পদমর্যাদার একটি অংশ শরীয়তেও কাম্য ও জায়েয। অর্থাৎ, মানুষের অন্তরে এতটুকু প্রভাব বিস্তার হওয়া যার ফলে অন্যের দেওয়া কষ্ট ও ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। কোনো মানুষ যদি একেবারেই মর্যাদাহীন ও গুরুত্বহীন হয়, যার ফলে অন্যের দেওয়া কষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তাহলে এতটুকু মর্যাদা লাভ করা যার দ্বারা মানুষ নিজেকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে, এটা শুধু জায়েয তাই নয় বরং জরুরী। উদাহরণস্বরূপ, একজন মানুষের কারো চোখে তার কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই। কেউ

এসে তাকে প্রহার করলো, কেউ তার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিলো, কেউ তার জানের উপর আক্রমণ করলো, এখন কারো কাছে গিয়ে সে অভিযোগ করলে কেউ তার কথা শোনে না, থানায় গেলে পুলিশ রিপোর্ট লেখে না। বর্তমান যুগের এ পৃথিবী এমন গুরুত্বহীন মানুষকে মেরে ফেলবে। এজন্য এ পরিমাণ মর্যাদা যার দ্বারা কষ্ট দূর করা যায়, এটা জায়েয ও জরুরী। এতটুকু মর্যাদা যদি কেউ কামনা করে তাহলে শরীয়তে তা নিষেধ নয়।

প্রয়োজনাতিরিক্ত মর্যাদা কামনা করা

কিন্তু কেউ যদি এ জন্য মর্যাদা কামনা করে যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করবে। পদ-পদবী লাভ হলে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, নিজের সুবিধা ভোগ করবে, এটা পদলিপ্সা যা হারাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে পদলিপ্সা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সরকারের যত পদ ও পদবী আছে কেউ যদি তা না চাইতেই পায় এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমার মধ্যে তা ব্যবহার করে তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নেয়ামত। ইনশাআল্লাহ তাকে সাহায্য করা হবে। কিন্তু কেউ যদি এই পদের জন্য দৌড়াতে থাকে, মানুষের মাধ্যমে সুপারিশ করায়, আবেদন করায়, তাহলে হাদীস শরীফে এসেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার হাতে ন্যস্ত করেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হয় না।[১]

এজন্য শরীয়তের হুকুমও এই যে, মানুষ কোনো পদ পদবী, মন্ত্রিত্ব ও শাসন ক্ষমতা সেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। তবে যদি জাতীয় স্বার্থের জন্য ভীষণ প্রয়োজন দেখা দেয়, সে ভিন্ন কথা।

ভীষণ প্রয়োজন কি?

পদ কামনার জন্য ভীষণ প্রয়োজন এই যে, আমি যদি আগ বেড়ে গ্রহণ না করি তাহলে জালেম ব্যক্তিরা তা হস্তগত করে মানুষের ক্ষতি করবে।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬১৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪০১, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১২৪৬, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৫২৮৯, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৩০০

যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন। বাদশাহ যখন তাকে কাছে ডেকে নিলো এবং নৈকট্য দান করলো তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজে মিসরের বাদশাহকে বললেন,

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

আপনি আমাকে সরকারি কোষাগারের দায়িত্ব দিন যাতে আমি ঠিকভাবে তা রক্ষণাবেক্ষণ করি।[১]

কারণ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম জানতেন যে, আমি যদি এগিয়ে না যাই তাহলে কিছু মানুষ অন্যের হক আত্মসাৎ করবে। মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করবে। এজন্য মানুষকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি এই পদ চেয়ে নেন। এটি একটি ব্যতিক্রমী অবস্থা। কোথাও এ অবস্থা দেখা দিলে তখন পদ চেয়ে নেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু মৌলিক বিধান এই যে, নিজে অগ্রসর হয়ে পদ কামনা করবে না।

ওয়ায ও বক্তব্য দানে সতর্কতা

আলেমগণ একথাও বলেছেন যে, নিজে অগ্রসর হয়ে বক্তা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ এমন করলে বরকত হয় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ

ওয়ায হয় সে বলবে যে দ্বীনি বিষয়ে আমীর ও নেতা। আল্লাহ তা'আলা তাকে নেতৃত্বের পদ দান করেছেন বা ওয়ায করা তার হক যাকে আমীরের পক্ষ থেকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।[২]

উদাহরণস্বরূপ, কোনো আল্লাহওয়ালা কাউকে ওয়ায করার জন্য বসিয়ে দিলেন যে, তুমি এই খেদমত করো তাহলে তার জন্য ওয়ায করা জায়েয। এর বাইরে যে ওয়ায করবে তার সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে হলো 'মুখতাল' তথা প্রদর্শক। মানুষকে দেখাচ্ছে, নিজেকে নিজে বড়ো মনে করে ওয়ায করছে। কতক লোক কেউ বলা ছাড়া নিজে নিজে দাঁড়িয়ে যায় তাদের ওয়ায নসহিতের মধ্যে বরকত নেই। উল্টা তারা অহংকারে লিপ্ত হয়। এজন্য বুযুর্গগণ বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত-৫৫

২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৮০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৩৫৮, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২৬৬০

আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ কোনো পদে না বাসিয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের থেকে ঐ পদে বসবে না।

মাকবুল বক্তার জন্য সতর্কতা

আমাদের অবস্থা তো এমন যে, ওয়ায করতে আরম্ভ করলাম, কিছু লোক জমা হয়ে গেলো, তারা সম্মান করে কথা শুনতে আরম্ভ করলো তখন এই চিন্তা জাগে যে, এতগুলো লোক যখন আমার কথা শুনছে তাহলে আমার মধ্যে কিছুনা কিছু অবশ্যই আছে। এর ফলে মানুষের নফস খারাপ হয়ে যায়, মানুষ অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

নফসের খারাবীর বিস্ময়কর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (কু.সি.) এর দৃষ্টান্ত দিয়ে একটি ঘটনা লিখেছেন। আরব দেশে একজন বিখ্যাত লোভী ব্যক্তি ছিলো তার নাম আশ'আব। একবার সে কোথাও যাচ্ছিলো। পথে কিছু মানুষকে পাত্র বানাতে দেখলো। সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা এতো ছোট ছাট থাল কেন বানাচ্ছো। বড়ো বড়ো থাল বানাও। লোকেরা তাকে বললো, আমরা ছোট থাল বানাই বা বড়ো, তাতে তোমার কি? সে বললো, হতে পারে তোমরা যেই থাল বানাচ্ছো তা এমন কোনো ব্যক্তির নিকট যাবে যে ঐ থালে করে আমার জন্য উপঢৌকন নিয়ে আসবে। এজন্য তোমরা বড়ো থাল বানাও।

তার লোভ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, সে অনেক সময় বাইরে যেতো, শিশুদেরকে খেলতে দেখে মিথ্যা বানিয়ে বলতো যে, তোমরা এখানে কি করছো? অমুক জায়গায় যাও সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছে। শিশুদের যেহেতু মিষ্টির প্রতি আকর্ষণ থাকে তাই তারা খেলা ছেড়ে সেদিকে দৌড়ায়। সব শিশু যখন দৌড়াতে আরম্ভ করে তখন সে নিজেও তাদের পিছনে দৌড়াতে আরম্ভ করে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, তুমি দৌড়াচ্ছো কেন? সে বললো, হতে পারে সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছে।[১]

একটি ভুল চিন্তা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলতেন, কিছু লোক অনেক সময় নিজের পরহেযগারী, বুযুর্গী ও জ্ঞান গরীমা দ্বারা

১. নাফহাতুল আরব, পৃঃ ১৫

মানুষকে নিজেই ধোঁকা দেয়। তারপর যখন কিছু লোক তার দিকে আকৃষ্ট হয় তখন চিন্তা করে যে, এতো মানুষ আমার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে অবশ্যই কোনো বিষয় আছে যে কারণে তারা আমার পিছনে ছুটছে। এই চিন্তা ভুল। অনেক সময় তা মানুষকে অহংকারে লিপ্ত করে।

'আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা নিশ্চয়ই একটি বড়ো কাজ। কিন্তু তার ফায়দা তখনই লাভ হয় যখন মানুষ এ কাজ মানুষের প্রশংসা কুড়ানো, খ্যাতি লাভ বা পরহেযগার নাম অর্জনের জন্য না করে, বরং কেবল আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি ও তার রেযামন্দীর উদ্দেশ্যে করে।

শাইখের তত্ত্বাবধানে কাজ করুন

এজন্য এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও নাজুক কাজ। কোনো বুযুর্গ কোনো আসনে না বসালে বা কারো নিয়মতান্ত্রিক তত্ত্বাবধান না থাকলে অনেক সময় মানুষ পদলিপ্সার শিকার হয়ে যায়। এজন্যই বুযুর্গগণ বলেছেন, কাজ করার পূর্বে এবং কাজ করার সময়ও কোনো আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক রাখো, যাতে করে নফস পদলিপ্সার ব্যাধি থেকে হেফাযতে থাকে।

শাইখ আবুল হাসান নূরী রহ.-এর ইখলাস

শাইখ আবুল হাসান নূরী রহ. অনেক উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন সমুদ্র তীরে নৌকা থেকে কিছু মটকা নামানো হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেলো, এগুলো মদের মটকা, যা দেশের শাসকের জন্য অন্য দেশ থেকে আনা হয়েছে। এখন একটি বড়ো জাহাজে বোঝাই করে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শাইখ আবুল হাসান নূরী রহ. খুব কষ্ট পেলেন। মুসলিম দেশের একজন বাদশাহ মদের মটকা আনাচ্ছে। তার মধ্যে মন্দ কাজে নিষেধ করার জযবা জাগলো। তিনি ঐ বিশটা মটকা একটা একটা করে ভাঙ্গতে আরম্ভ করলেন। উনিশটা মটকা ভাঙ্গলেন। বিশতম মটকা ভাঙ্গার জন্য যখন হাত উঠালেন তখন হঠাৎ অন্তরে একটি চিন্তা জাগার ফলে সেটি রেখে চলে আসলেন। বাদশাহর নিকট খবর পৌছলো যে, অমুক ব্যক্তি উনিশটা মটকা ভেঙ্গে ফেলেছে। বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালো। জিজ্ঞাসা করলো, এটা আপনি কি করলেন? তিনি বললেন, মূলত কুরআনে কারীমে

আল্লাহ পাক বলেছেন, নেক কাজের নির্দেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং এর ফলে যে কষ্ট আসে তাতে ধৈর্য ধারণ করো। যখন আমি দেখলাম এ মন্দ কাজ আপনার পর্যন্ত পৌছবে তারপর মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে তখন সেগুলো ভাঙ্গতে চাইলাম। কিন্তু যখন চিন্তা জাগলো যে, তুমি অনেক বড়ো বাহাদুর, বাদশাহর জেল-জুলুমকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার হুকুম বাস্তবায়ন করছো। মানুষ যখন জানতে পারবে যে, আবুল হাসান বাদশাহর মটকা ভেঙ্গে দিয়েছে তখন মানুষের মধ্যে খুব খ্যাতি হবে। যখন আমার এ চিন্তা জাগলো তখন মটকা ভাঙ্গা আর আল্লাহর জন্য হতো না, বরং মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য হতো। এ পর্যন্ত যতোগুলো মটকা ভেঙ্গেছিলাম সেগুলো ছিলো আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য। শেষ মটকাটি যদি ভাঙ্গতাম তাহলে তা হতো মানুষকে দেখানোর জন্য এবং নিজের নফসের খাতিরে। এজন্য সেটা রেখে চলে আসি।

বাদশাহের উপর শাইখ আবুল হাসান রহ.-এর ইখলাসের প্রভাব

বর্ণনায় এসেছে, বাদশাহের উপর শাইখ আবুল হাসান রহ.-এর এমন প্রভাব পড়লো যে, বাদশাহ তার হাতে বাইয়াত হলেন এবং বিশেষভাবে তাকে দায়িত্ব দিলেন যে, আপনি শহরের তত্ত্বাবধান করবেন, যতো গোনাহের কাজ দেখবেন সেগুলো বিলুপ্ত করবেন। মোটকথা, কাউকে নেক কাজের কথা বলা এবং গোনাহের কাজ থেকে বাধা দেওয়া তখন প্রশংসার যোগ্য, যখন তার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু না হয়। এ কাজই যদি নাম, যশ, খ্যাতি ও পরহেযগার উপাধী লাভের জন্য হয় তাহলে সব মেহনত বেকার হয়ে যাবে, উল্টা গোনাহগার হবে।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ঘটনা

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব (কু.সি.) হযরত থানভী রহ.-এর উস্তাদ ছিলেন। উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। হযরত থানভী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া শেষ করে কানপুরের মাদরাসায় পড়াতে আরম্ভ করেন। কানপুরের লোকদের মধ্যে বিদআত খুব জোরেশোরে চালু ছিলো। মানুষের মনোযোগ কুরআন হাদীসের দিকে কম, মানতেক ও ফালসাফার দিকে বেশি ছিলো। পক্ষান্তরে উলামায়ে দেওবন্দের কুরআন

সুন্নাহর দিকে মনোযোগ ছিলো বেশী। এজন্য তারা উলামায়ে দেওবন্দকে ছোট মনে করতো। হযরত থানভী রহ. একবার চিন্তা করলেন, আমি হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ.-কে কানপুর আনবো। তার দ্বারা এখানে ওয়ায করাবো। যাতে মানুষ দ্বীনের হাকীকত জানতে পারে এবং এটাও জানতে পারে যে, উলামায়ে দেওবন্দ সব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং জলসা করা হলো। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে দাওয়াত দেওয়া হলো। সমাবেশ চলাকালে হযরত থানভী রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে ইঙ্গিতে বলেছিলেন যে, হযরত অমুক মাসআলার বিষয়ে একটু বিশেষভাবে বর্ণনা করবেন। কারণ, এখানে ঐ বিষয়ে অনেক ভুল বুঝাবুঝি ছড়িয়ে আছে। মাসআলার সম্পর্ক ছিলো মানতেক ও ফালসাফার সঙ্গে। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. যখন বয়ান আরম্ভ করেন তখন ঐ সব লোক সেখানে এসে পৌছেনি যাদেরকে ওয়ায শোনানো উদ্দেশ্য ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই তারা সেখানে এসে পৌছে। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. ঐ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। সে সম্পর্কে খুব উচ্চাঙ্গের আলোচনা তুলে ধরলেন। বয়ান চলছিলো হঠাৎ শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন, আমি আর আলোচনা করতে ক্ষমা চাচ্ছি এবং وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে বসে পড়লেন। হযরত থানভী রহ. বলেন, আমি খুব বিচলিত হলাম, যখন আলোচনার মূল সময় এসেছে তখন হযরত বসে পড়লেন। আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন তো আলোচনার মুল সময় ছিলো কিন্তু আপনি আলোচনা শেষ করে দিলেন? হযরত বললেন, মূলত আমার চিন্তা জাগে যে, আমি তাদের সামনে নিজের ইলম জাহির করছি। তখন যদি আমি আলোচনা অব্যাহত রাখতাম তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার জন্য হতো না, বরং তা নিজের যোগ্যতা দেখানো ও ইলম প্রকাশ করার জন্য হতো। এমন ওয়ায বৃথা, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয় বরং নিজের ইলম জাহির করা উদ্দেশ্য হয়।

এটা কোনো মামুলি বিষয় নয় যে, মানুষ সমাবেশে আলোচনা করতে করতে একথা চিন্তা করে বসে পড়বে যে, এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলছিলাম তা ছিলো আল্লাহর জন্য কিন্তু এখন যা বলবো তা নিজের ইলম জাহিরের জন্য হবে। মূলত পদলিপ্সা থেকে বাঁচার জন্য এমনটি করতে হয়। যে কোনো পদ ও পদবী নিজের প্রভাব সৃষ্টির জন্য অর্জন করা খারাপ। তবে মানুষের আরামের জন্য পদ হাসিল করার অনুমতি রয়েছে।

সকল বুযুর্গ বিনয়ের ফলে আল্লাহর ওলী হয়েছেন

কতক সময় না চাইতেও আপনা আপনি পদ-পদবী ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয়। এগুলো সাধারণত ঐ সব আল্লাহ ওয়ালাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যারা বিনয়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে মেটাতে থাকেন। আর দুনিয়া তাদের পায়ের উপর এসে আছড়ে পড়ে। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

'আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।'[1]

যতো বুযুর্গ ও আল্লাহর ওলী আছেন তারা নিজেরা তো চান আমার সম্পর্কে কেউ না জানুক। গুমনাম হয়ে থাকি। কিন্তু তাদের থেকে যেই সৌরভ ছড়ায় তা মানুষকে পাগলপারা আকর্ষণ করে। তারা তাদের চর্তুদিকে প্রাচীর খাড়া করেন কিন্তু মানুষ তাদের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সুগন্ধি দান করেন যা না চাইতেই লাভ হয়েছে এবং তা আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নেয়ামত।

বৈধ পদের ভুল ব্যবহার

কিন্তু জায়েয পদ্ধতিতে এবং না চাইতেই যেই পদমর্যাদা লাভ হয় তা ব্যবহারে মারাত্মক ভুল ও গাফলতী হয়ে থাকে। যার দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। ফলে মানুষ তাতে আক্রান্ত হয়ে যায়। বিষয়টি বোঝা দরকার। অনেক সময় নিজের ব্যক্তিত্ব ও পদের প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ করে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করানো হয় যা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয।

চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা সংগ্রহ করা

উদাহরণ স্বরূপ, কোনো নেক কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহের জন্য প্রভাবশালী দু-চারজন লোককে সাথে নেওয়া হলো। তাদের মাধ্যমে মানুষ

---

১. আততারগীব ওয়াততারহীব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫১, হাদীস নং ৪৩৯৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ও মামবাউল ফাওয়াইদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০৪, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪১, হাদীস নং ৬৩৪৯, আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খণ্ডঃ১, পৃষ্ঠা-১৯১, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭৬, হাদীস নং ৮১৪০, মুসাননাফে ইবনে আবী শাইবা, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭৯, জামেউল আহাদীস, খণ্ড-৩৩, পৃষ্ঠা-২৯১, হাদীস নং ৩৬২৮১

থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হলো যাতে করে তাদের কারণে চাঁদা দিতে অস্বীকার না করে। প্রভাবশালী লোক সাথে না থাকলে তাদের অন্তরে চাঁদা দেওয়ার ইচ্ছা হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিংবা কম পরিমাণে দিতে পারে। কিন্তু প্রভাবশালী কোনো মানুষের দ্বারা চাপ প্রয়োগ করার ফলে চাঁদা দিতে অস্বীকার করতে পারলো না। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির প্রভাবের ভিত্তিতে সে চাঁদা দিয়েছে, অন্যথায় মন থেকে চাঁদা দিতে সে রাজী ছিলো না। এমনটি করা পদমর্যাদার অপব্যবহার। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ

'কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া হালাল নয়।'[১]

খুশি মনের অনুমতি ছাড়া মহর মাফ হয় না

কুরআনে কারীমেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কোনো মহিলা যখন মহর মাফ করে দেয় তখন শুধু মৌখিক মাফ যথেষ্ট নয়, স্ত্রী যদি আত্মা থেকে মাফ করে দেয় তবেই মহর মাফ হবে। বিষয়টি কুরআন মাজীদে এভাবে উল্লেখ আছে,

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

'হ্যাঁ, যদি তারা তা থেকে কিছু অংশ খুশি মনে ছেড়ে দেয় তাহলে সানন্দে তা ভোগ করো।'[২]

অর্থাৎ, স্ত্রীরা যদি খুশি মনে তোমাদেরকে কিছু দেয় তাহলে জায়েয অন্যথায় জায়েয নয়।

মহর মাফ নেওয়া একটি মন্দ প্রচলন

সাধারণত মানুষের মধ্যে এই প্রচলন হয়ে গেছে যে, সারাজীবন এক সঙ্গে থাকে কিন্তু না কখনো মহর দেওয়ার কথা চিন্তায় আসে না তার ইচ্ছা করে। যখন অন্তীম শয্যায় শায়িত তখন স্ত্রীকে বলে যে, তোমার মহর আমার দায়িত্বে রয়ে গেছে তা মাফ করে দাও। এখন এমন সময় ঐ বেচারীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কি বের হবে যে, আমি মাফ করে দিলাম। অথচ কুরআন

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯৭৭৪
২. সূরা নিসা, আয়াত-৪

বলে এরূপ মাফ ধর্তব্য নয়। খুশি মনে যেটা মাফ করবে সেটা কেবল ধর্তব্য। পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাধ্য হয়ে মাফ করে দেওয়া ধর্তব্য নয়। চাঁদার বিষয়টিও এমন। অবস্থা ও ব্যক্তির চাপে চাঁদা দিলে তা হালাল নয়। এটা ব্যক্তিত্বের অপব্যবহার।

চাঁদার একটি জায়েয পদ্ধতি

এক ব্যক্তি চাঁদা দিতে চায় কিন্তু আপনি গেলে সে আস্থা পোষণ করতে পারে না যে, এই লোক চাঁদা সঠিক খাতে ব্যয় করবে। এজন্য আপনি এমন এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে গেলেন যার কারণে চাঁদাদাতার আস্থা জন্মালো যে, চাঁদা সংগ্রহকারী অনির্ভরযোগ্য নয় তাহলে এ পদ্ধতি জায়েয। কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে যদি এজন্য সাথে নিয়ে যাওয়া হয় যে, চাঁদাদাতা চাপে ও প্রভাবে পড়ে কিছু না কিছু দিবেই তাহলে এটা হারাম এবং পদের অপব্যবহার।

সুপারিশের অর্থ

এমনিভাবে বর্তমানে সুপারিশেরও খুব প্রচলন ঘটেছে। বড়ো কোনো মানুষের মাধ্যমে এজন্য সুপারিশ করানো হয়, যেন অন্য ব্যক্তি এর প্রভাবের চাপে অবশ্যই কাজটি করে দেয়। এটাও পদ-মর্যাদার অবৈধ ব্যবহার। সুপারিশের অর্থ এটা নয় যে, কারো উপর চাপ সৃষ্টি করে কাজ করাবে। সুপারিশের অর্থ হলো, মনোযোগ আকৃষ্ট করা ও পরামর্শ দেওয়া। যেমন এক ব্যক্তি কারো নামে সুপারিশ করে লিখলো যে, একে অমুক জায়গায় নিয়োগ দিন। এখন যার নামে চিঠি লেখা হয়েছে সে চিন্তা করে যে, এতো বড়ো মানুষের সুপারিশ কি করে ফেরত দেই। অথচ যার পক্ষে সুপারিশ করা হচ্ছে সে এ পদের যোগ্য নয়। আজকাল আমার নিকট অনেক মানুষ এসে বলে যে, অমুক ব্যক্তির নামে জোরালো ভাষায় সুপারিশ লিখে দিন। অথচ জোরালো ভাষায় সুপারিশ লেখাই জায়েয নেই। সুপারিশের অর্থ হলো, কাউকে এ কথা লিখবে যে, আমার ধারণায় অমুক ব্যক্তি মুখাপেক্ষীও এবং এর যোগ্যও। আপনার অবস্থার অনুকূল এবং আপনার কল্যাণ সম্মত হলে তার কাজটি করে দিন। আমি এর পক্ষে সুপারিশ করছি। তারপর যদি সে সুপারিশ কবুল না করে তাহলে অন্তরে কোনো চাপ সৃষ্টি হওয়া যাবে না। কিন্তু জোরালো ভাষায় এভাবে লেখা যে, যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো

মূল্যে আপনাকে এ কাজ করে দিতে হবে। এই সুপারিশ নাজায়েয ও হারাম। এমনিভাবে অন্য কারো উপর নিজের ব্যক্তিত্ব, ধন-সম্পদ ও পদ-পদবীর চাপ সৃষ্টি করাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে নয় বরং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে দ্বীনের তা'লীমের উপর আমল করা জরুরী। এ সব বিষয় বিস্মৃত হওয়ার ফলেই আজ অমাদের সমাজ বিকৃত হয়ে চলেছে। আমাদের জীবন ধ্বংস হচ্ছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, পদ ও সম্পদের ভালোবাসা মানুষের দ্বীনকে চরমভাবে ধ্বংস করে দেয়, এখন হয়তো তার কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। আমরা পদ-পদবী অর্জন করে যথারীতি তার অপব্যবহার করছি।

পদের অন্যায় ব্যবহার

আমাদের দেশে যে নির্বাচন হয় তাতে প্রত্যেক প্রার্থী এ কথাই বলে যে, আমার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। নিজে নিজের গুণগান গাওয়া এবং অন্যের সমালোচনা করা নির্বাচনের আবশ্যকীয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে। লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা ছাড়া কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে না। লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে যে ব্যক্তি সংসদ সদস্য হলো বা মন্ত্রিত্ব লাভে সক্ষম হলো, সে কি নিজের ব্যয় করা সমস্ত অর্থ আল্লাহর পথে কতাওবানী করলো? না, এটা তো বরং পুরোপুরি বিনিয়োগ। যে পর্যন্ত ব্যয় করা অর্থের দ্বিগুণ চর্তুগুণ উসুল না হবে সে পর্যন্ত তার এ পদ বেকার। যে ব্যক্তি এক কোটি টাকা খরচ করেছে সে দশ কোটি টাকা বানানোর জন্য এসব পদ অর্জন করছে। যদি দশ কোটি টাকা না বানায় তাহলে যেন সংসদ সদস্য হয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে। এর বিপর্যয় কিভাবে সমাজে ছড়িয়ে আছে তা আপনারা লক্ষ করুন। এ বাস্তবতাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষায় বর্ণনা করছেন যে, পদলিপ্সা মানুষের দ্বীনের এতো বড়ো বিপর্যয় ঘটায়, ক্ষুধার্ত বাঘও ছাগল পালের মধ্যে যা ঘটায় না।

প্রশংসাপ্রীতির আপদ

পদলিপ্সার দ্বিতীয় অংশ প্রশংসাপ্রীতি। অর্থাৎ, একথার আগ্রহ যে মানুষ আমার প্রশংসা করবে। এটা এক মারাত্মক ব্যাধি যা পদলিপ্সার ভিত্তি। কোনো ব্যক্তি যতো ছোটই হোক না কেন সে তার প্রশংসা শুনতে চায়। যার ফলে ভালো ভালো নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম ভাইকে হাদিয়া ও উপঢৌকন দেওয়া অনেক বড়ো সওয়াবের কাজ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই উপঢৌকন যদি এজন্য দেওয়া হয় যে, এর মাধ্যমে আমার সুনাম হবে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে তাহলে তার পুরো ছওয়াব বরবাদ হয়ে যাবে, উল্টা গোনাহ হবে।

উপঢৌকনের বিষয়ে একটি ভুল প্রচলন

আমাদের সমাজে সাধারণত আত্মীয়স্বজনের কাছে উপঢৌকন নিয়ে যাওয়ার খুব একটা প্রচলন নেই। কেউ উপঢৌকন দিতে চাইলেও পরামর্শ দেওয়া হয় যে, এখন বাদ দাও অমুক সময় অনুষ্ঠান হবে তখন দিও। তাহলে তোমার উপঢৌকনের নাম হবে, মানুষ প্রশংসা করবে যে, অমুক ব্যক্তি এই উপঢৌকন দিয়েছে। যার অর্থ এই যে, যা কিছু দেওয়া হচ্ছে তা শুধু নাম যশের জন্য এবং মানুষকে দেখানোর জন্য দেওয়া হচ্ছে। অথচ সাধারণ অবস্থায় সরলভাবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং একজন মুসলিমকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে উপঢৌকন দেওয়ায় অনেক ছওয়াব রয়েছে। কিন্ত যদি প্রশংসা পাওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে এতে কোনো লাভ নেই।

প্রশংসাপ্রীতি ভিত্তিহীন

আমার মুর্শিদ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলতেন যে, প্রশংসাপ্রীতি এমন অর্থহীন জিনিস যে এর ভিত্তি অন্যের উপর। অর্থাৎ, প্রশংসা করবে অন্য মানুষ। আর অন্য মানুষ তো নিজের অধীন নয়। অন্য মানুষ প্রশংসা করতেও পারে, নাও করতে পারে। করলেও কতো দিন করবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কাউকে উপঢৌকন দিলেন। সে বললো, আপনি খুবই উদার। দুই তিন বার বলে সে থেমে যাবে। আপনি তাকে বললেন, আপনার প্রশংসা আমার খুব ভালো লেগেছে, আবার একটু বলুন তো সে আবারও প্রশংসা করলো। এতে করে আপনার পুরো ছওয়াব নষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু এ সবকিছু যদি শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য হতো তাহলে অবশ্যই আখেরাতে এর পুরস্কার লাভ হতো। আমার মুর্শিদ একটি কবিতা পাঠ করতেন, যা মনে রাখার মতো। তার উপর আমল করা হলে পদলিপ্সার ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। কবিতাটি এই,

ختم ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے پاس

اک ذراسی بات پہ اے دل پھر کیا اس کے پاس

পদলিপ্সা দুনিয়াতেই যার সবকিছু শেষ হয়ে যায়
এটা তো মৌখিক প্রশংসা মাত্র,
এরপরে তার কাছে আর কি থাকে?

একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তি কয়েকবার প্রশংসা করলো তারপর তার কাছে আর কি থাকলো? এ বিষয়টি যদি চিন্তা করা হয় তাহলে পদলিপ্সা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি প্রশংসা লাভের পরিবর্তে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করে তাহলে সে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর পুরস্কার লাভ করবে। আর একথাও মনে রাখবেন! যখন মানুষের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা হয়, প্রশংসা কুড়ানো না হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও তার প্রশংসা করিয়ে থাকেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনি জীবনে এমন কোনো মানুষ দেখেছেন কি যার কেউ দোষ বর্ণনা করেনি? কেউ না কেউ অবশ্যই দোষ বর্ণনা করে থাকে। এমনকি নবীগণেরও দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসা ও নিন্দাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা পদলিপ্সার অন্তর্ভুক্ত।

আমার ওয়ালেদ ছাহেব বলতেন যে, এমন ব্যক্তির প্রশংসাই গ্রহণযোগ্য, যার প্রশংসার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন আপনি বড়ো কোনো কৃতিত্বের কাজ করলেন, আর একজন মেথর আপনার প্রশংসা করলো তাহলে তার প্রশংসায় আপনার কি আনন্দ লাগবে? আনন্দ লাগবে তো ঐ ব্যক্তির প্রশংসা দ্বারা, যে এ বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানে।

এক নাপিতের ঘটনা

আমার ওয়ালেদ মাজেদ (কু.সি.) একটি ঘটনা শোনাতেন যে, এক নাপিতকে বাদশাহ ক্ষৌরকার্যের জন্য ডেকে পাঠান। নাপিত সেখানে গিয়ে দেখে বাদশাহ ঘুমিয়ে পড়েছে। নাপিত এতো দক্ষতার সাথে চুল কেটে দেয় যে, বাদশাহ বুঝতেই পারে না। সে ঘুমিয়েই থাকে। ঘুম থেকে জেগে দেখে অতি চমৎকারভাবে চুল কাটা হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কিভাবে হয়েছে? এক ব্যক্তি বললো, নাপিত এসেছিলো আপনার ঘুমের অবস্থাতেই সে ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করে দিয়েছে। বাদশাহ বললো, খুব দক্ষ নাপিত

তো! সে এতো নিপুণভাবে কাজ করেছে যে, আমি বুঝতেই পারিনি। তাকে ডাকাও। নাপিত এলে বাদশাহ বললো, আমি তোমার এই দক্ষতার কারণে তোমাকে 'নাপিতরাজ' উপাধীতে ভূষিত করলাম। নাপিত এই খেতাব লাভ করে কোনো প্রকার আনন্দ প্রকাশ করলো না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমাকে এতো বড়ো খেতাব দিলাম আর তুমি কোনো প্রকার আনন্দ প্রকাশ করলে না। নাপিত উত্তর দিলো, বাদশাহ নামদার আপনার দয়া যে, আপনি আমাকে এই খেতাব দিয়েছেন। কিন্তু যদি সব নাপিত মিলে আমাকে এই খেতাব দিতো তাহলে আমি আনন্দিত হতাম। কারণ তারা আমার পেশার লোক। আমার পেশা সম্পর্কে তারা জানে। আপনি তো এই শাস্ত্রের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে অবগত নন। কোনো অদক্ষ লোক খেতাব দিলে সেটা বিশেষ কোনো আনন্দের বিষয় নয়। আনন্দ তো তখন হতো, যখন আমার শাস্ত্রের লোকেরা এই খেতাব দিতো। আমার ওয়ালেদ ছাহেব (কু.সি.) বলতেন, ঐ নাপিত অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত কথা বলেছে। কারণ, যতো মাখলুক আছে, তারা নেক আমলের কদর জানে না। নেক আমলের প্রকৃত কদর তো জানেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি যদি প্রশংসা করেন এবং খুশি হন তাহলে তা খুশির বিষয়, অন্যথায় মানুষের প্রশংসার কোনো মূল্য নেই।

হিন্দি ভাষার একটি প্রবাদ

হিন্দি ভাষার একটি প্রবাদ আছে যে, 'রূপসী তো সে, প্রিয় যাকে চায়'। এই প্রবাদের একটি গল্প আছে। এক মেয়েকে বধূ সাজে সাজানো হচ্ছিলো। যে নারীই তাকে দেখছিলো সেই বলছিলো যে, তোমাকে তো আজ খুব সুন্দর লাগছে! তোমার চুল খুব সুন্দর লাগছে! তোমার চেহারা খুব অপরূপ লাগছে! সব মহিলাই তার প্রশংসা করছিলো। আর সে সবাইকেই একই উত্তর দিচ্ছিলো যে, তোমার প্রশংসায় আমার আনন্দ নেই, যার কাছে যাচ্ছি তিনি যদি প্রশংসা করেন তাহলে আমার আনন্দের বিষয়। কারণ, তুমি তো প্রশংসা করে চলে যাবে। কিন্তু আমার যার সঙ্গে সবসময় থাকতে হবে তিনি যদি প্রশংসা করেন সেটা হবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামায, রোযা, দান ইত্যাদি যেসব নেক আমল করা হচ্ছে মানুষ এর জন্য যতো প্রশংসাই করুক তা মূল্যহীন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা না বলবেন যে, আমার বান্দা আমি তোমার প্রতি খুশি হয়েছি।

সব কাজ আল্লাহর জন্য করবে

এজন্য হযরত থানভী রহ. বলতেন যে, কোনো কাজই মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য করো না, সব কাজ আল্লাহ তা'আলার খাতিরে করো। এর ফলে মানুষের ব্যাপারে সব ধরনের অভিযোগ শেষ হয়ে যাবে। কারণ, আজকাল চিন্তা করে যে, আমি অমুককে এতোগুলো টাকা দিলাম, কিন্তু সে একটি প্রশংসার শব্দও মুখে আনলো না। আমি অমুকের সাথে এতো সহমর্মিতা দেখালাম, কিন্তু ঐ আল্লাহর বান্দা কৃতজ্ঞতামূলক একটা শব্দও উচ্চারণ করলো না। এর ফলে অন্তরে অভিযোগ সৃষ্টি হয়। এসব এজন্য হয় যে, সমবেদনার সময় লক্ষ থাকে আমি তার সঙ্গে সদাচরণ করলে সে আমার প্রশংসা করবে, আমার শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি এটা উদ্দেশ্য না হতো বরং অন্তরে একথা থাকতো যে, আমি তো আল্লাহর জন্য দিচ্ছি। সে শুকরিয়া আদায় করুক বা না করুক, তাহলে অন্তরে কোনো প্রকার অভিযোগ সৃষ্টি হবে না। যদিও তার উচিৎ শুকরিয়া আদায় করা। কারণ, হাদীসের ভাষ্য মতো যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহর শোকর আদায় করে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা হতো তাহলে এ ধরনের অভিযোগ সৃষ্টি হতো না। তাই মানুষের গুরুত্বহীন সন্তুষ্টিকে পরিহার করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির ফিকির করা উচিত।

পদলিপ্সার চিকিৎসা

হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব রহ. পদলিপ্সার এই চিকিৎসা বলতেন যে, যখনই এমন কোনো কাজ করবে, যার সম্পর্কে চিন্তা জাগবে যে, এর ফলে মানুষ আমার প্রশংসা করবে তখন একবার মনে মনে বলো যে, হে আল্লাহ! আমি অমুক কাজটি করতে যাচ্ছি, এতে মানুষ আমার প্রশংসা করবে, সেই প্রশংসার ফলে আমার নফসকে খারাপ হতে দিবেন না। কারণ এ প্রশংসা মূলত আপনার। আপনি তাওফীক দিয়েছেন বলে এটা আমি করতে পারছি। আমি আপনার শোকর আদায় করছি যে, মানুষ আমার প্রশংসা করছে। আপনি তাদের আত্মা থেকে আমার দোষসমূহ লুকিয়ে রেখেছেন এবং গুণ প্রকাশ করেছেন। আপনি যদি তা না করতেন আর আমার ভিতরের অবস্থা সবার সামনে চলে আসতো তাহলে মানুষ আমাকে ঘৃণা করতো। আমার পাশে বসতেও রাজী হতো না। হে আল্লাহ! এটা আপনার সাত্তার গুণের বদৌলতে হয়েছে। আপনি আমার দোষসমূহ ঢেকে দিয়ে আমার একটি

আমলকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যার ফলে মানুষ আমার প্রশংসা করছে। হে আল্লাহ! এ প্রশংসার ফলে আমার নফসকে খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করুন। এমন সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে দু'আ করো তারপর দেখবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই হেফাজত করবেন।

ভালো কোনো কাজ হলে

যখনই ভালো কোনো কাজ হবে তখনই অবিলম্বে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করো যে, হে আল্লাহ! আপনার শোকর যে, এ কাজের তাওফীক আপনি আমাকে দিয়েছেন, অন্যথায় এ কাজের সাধ্য আমার ছিলো না। এ কেবল আপনারই দয়া। এর ফলে আপনি আমার আত্মাকে খারাপ হতে দিবেন না। তবে নিজের নিয়তকে সংশোধনের চেষ্টা থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের ফিকির থাকতে হবে। মানুষের সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা না থাকতে হবে। মানুষের সন্তুষ্টি মূল্যহীন। যখনই মানুষের সন্তুষ্টির কথা চিন্তায় আসবে সাথে সাথে এই চিন্তা করবে যে, সব মানুষ তো ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই তাদের সন্তুষ্টির কোনো মূল্য নেই। আল্লাহর দিকে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। জনৈক কবি বড়ো চমৎকার বলেছেন,

یہ کہاں کا فسانۂ سود و زیاں

جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کہو دل سے جو فرصت عمر ہے کم

جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

এ কিসের লাভ-লোকসানের কাহিনী!
যা গেছে গেছে, যা লাভ হয়েছে হয়েছে।
আত্মাকে বলো, জীবনের সময় কম!
অন্তরে কেবল আল্লাহর স্মরণ গেঁথে নাও!

যে যাই বলুক না কেন, তা নিয়ে চিন্তা করবে না। বরং আল্লাহর দিকে মনযোগী হয়ে তার সন্তুষ্টির ফিকির করবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন নিজ রহমতে এ হাকীকত আমাদের অন্তরে বসিয়ে দেন এবং এর উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অলসতার প্রতিষেধক কর্মতৎপরতা*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা আমার পথে মেহনত মুজাহাদা করে অবশ্য অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করবো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।[১]

বিগত দিনগুলোতে আমি রেঙ্গুন সহ বার্মার আরো কিছু শহরে সফররত ছিলাম। একাধারে দশ-বারো দিন সফরে অতিবাহিত হয়। ধারাবাহিকভাবে বয়ান চলতে থাকে। একেক দিনে কতক সময় চার-পাঁচটি করে বয়ান হয়। এজন্য গলার আওয়াজ বসে গেছে। শরীরে ক্লান্তি বিরাজ করছে। আকর্ষিকভাবে কাল পুনরায় মক্কা-মদীনার সফর রয়েছে। এজন্য অলসতা লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো গত জুমায় যেহেতু বয়ান বাদ পড়েছে তো আরেকটি জুমাও বাদ থাক। কিন্তু আমার শাইখ হযরত ডা. ছাহেব (কু.সি.)-এর একটি কথা স্মরণ হলো। একবার তিনি বলেন,

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৪-১১৫, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা আনকাবূত, আয়াত-৬৯

'যখন নিয়মিত কোনো আমল পুরা করতে অলসতা লাগে তখনই হলো মানুষের পরীক্ষার সময়। তখন হয় সে অলসতার সামনে আত্মসমর্পণ করবে, নফসের কথা মেনে নিবে তাহলে এর পরিণতি এই হবে যে, আজ একটি আমল ছেড়ে দিলো তো কাল নফস আরেকটি আমল ছাড়াবে। এভাবে ধীরে ধীরে মন অলসতার অনুগামী হয়ে যাবে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

আরেকটি পথ হলো সাহসিকতার সাথে অলসতার মুকাবিলা করে ঐ কাজ করা। কষ্ট স্বীকার করে মেহনত করে জোর জবরদস্তি ঐ কাজ করা। তাহলে এই কষ্ট ও মোকাবেলার বরকতে আল্লাহ তা'আলা আগামীতেও মামুলাত পুরা করার তাওফীক দান করবেন।

তাসাওউফের সারকথা দুটি বিষয়

আমাদের হযরত এমন ক্ষেত্রে হযরত থানভী রহ.-এর একটি মালফূয শোনাতেন। মূলত এই মালফূযটি স্মরণ রাখার মতো বরং অন্তরে অঙ্কন করে রাখার মতো। হযরত থানভী রহ. বলতেন,

'সেই সামান্য বিষয়টি তাসাওউফের সারকথা তা হলো, যখন কোনো ইবাদত করতে অলসতা লাগবে তখন অলসতার মোকাবিলা করে ঐ ইবাদত করবে। আর যখন কোনো গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হবে তখন ঐ চাহিদার মোকাবেলা করে সেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। এ বিষয়টি যখন অর্জিত হবে তখন আর অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকবে না। এর দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এর দ্বারাই তা শক্তিশালী হবে এবং এর দ্বারাই তা উন্নত হবে।'

মোটকথা, অলসতা দূর করার রাস্তা একটি অর্থাৎ, সাহস করে তার মোকাবেলা করা। মানুষ মনে করে যে, শাইখ কোনো ব্যবস্থাপত্র দিবেন যা ধুয়ে পান করলে সব অলসতা দূর হয়ে যাবে। সব কাজ ঠিক মতো হতে থাকবে। মনে রাখবেন! সাহস করলেই অলসতার মোকাবেলা হয়। এ ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই।

নফসকে ফুসলিয়ে কাজ নাও

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) বলতেন, নফসকে একটু ফুসলিয়ে তার দ্বারা কাজ আদায় করো। তারপর নিজের একটি ঘটনা শোনান। একদিন তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গলো। খুব অলসতা লাগছিলো। চিন্তা হলো আজ তো শরীরটা ভালো না, অলসতাও লাগছে, জীবন তো পড়ে

আছে তাহাজ্জুদ নামায ওয়াজিব, ফরযও নয় ঘুমিয়ে থাকি। আজকে তাহাজ্জুদ না পড়লে এমন কি হবে?

হযরত বলেন, আমি নিজেকে নিজে বললাম, কথা তো ঠিক, তাহাজ্জুদ নামায ফরয-ওয়াজিব নয়, ওদিকে শরীর ভালো নয়, কিন্তু এটা তো আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার সময়। হাদীস শরীফে আছে, রাতের এক তৃতীয়াংশ যখন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত জগতবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আহবানকারী আহবান করতে থাকে, আছো কোনো ক্ষমাপ্রার্থী তাকে ক্ষমা করা হবে।[১]

এজন্য এমন বরকতময় সময় বেকার কাটানো ঠিক নয়। তারপর নিজের নফসকে সম্বোধন করে বললাম, আচ্ছা এক কাজ করো, নামায পড়ো না তবে বিছানার উপরে উঠে বসো, অল্প একটু দু'আ করো। দু'আ করে পুনরায় ঘুমিয়ে যাও। সুতরাং আমি অবিলম্বে উঠে বসে পড়লাম এবং দু'আ করতে আরম্ভ করলাম। দু'আ করতে করতে মনকে আবার বললাম, মিয়া উঠে যখন বসেছো, তো ঘুমতো ভেঙ্গে গেছে। এবার এক কাজ করো, গোসলখানায় যাও, এস্তেঞ্জা সারো তারপর আরামে শুয়ে থাকো। সুতরাং আমি গোসলখানায় চলে যাই এবং এস্তেঞ্জা সারি। তারপর নফসকে বলি, ঠিক আছে ওযুও করি, কারণ ওযু করে দু'আ করলে কবুল হওয়ার অধিক আশা রয়েছে। সুতরাং ওযু করে বিছানায় এসে বসি। দু'আ আরম্ভ করি। তারপর নফসকে বলি, বিছানায় বসে বসে কেমনতর দু'আ হচ্ছে! দু'আ করার তোমার যেই নির্ধারিত জায়গা আছে, জায়নামায আছে, সেখানে গিয়ে দু'আ করো। এ কথা বলে নফসকে জায়নামায পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই। জায়নামাযের উপর পৌঁছে দ্রুত দু' রাকাত তাহাজ্জুদের নিয়ত করি।

অতপর বলেন, এভাবে নফসকে একটু ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে কাজ করাতে হয়। নফস তোমার সঙ্গে নেক কাজে যেভাবে টালবাহানা করে, তুমিও তার সঙ্গে একই রূপ আচরণ করো। তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাও। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করবেন।

প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে যদি ডাক আসে

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) বলতেন, তুমি নিয়ম বানিয়ে নিলে যে, অমুক সময় তিলাওয়াত করবো বা অমুক সময় নফল

---

১. কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২১৩৯৮, আল মু'যামুল কাবির, হাদীস নং ১৮৩৬২

নামায পড়বো, কিন্তু সেই সময় ঘনিয়ে এলে শরীরে অলসতা লাগছে, উঠতে মন চাচ্ছে না, তাহলে এমন সময় নিজের নফসকে একটু তারবিয়াত করো। নফসকে বলো, আচ্ছা এখন তো তোমার অলসতা লাগছে, বিছানা থেকে তোমার উঠতে মন চাচ্ছে না, কিন্তু বলো! এখন যদি প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এই পয়গাম আসে যে, আমি তোমাকে অনেক বড়ো পুরস্কার বা অনেক বড়ো পদ-পদবী দেবো। তুমি অবিলম্বে আমার কাছে চলে আসো, তাহলে কি তখন অলসতা থাকবে। সংবাদবাহককে কি তুমি এই উত্তর দিবে যে, এখন আমি আসতে পারছি না, কারণ আমার ঘুম পেয়েছে। যেই মানুষের মধ্যে সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি আছে, রাষ্ট্রপ্রধানের এই পয়গাম শুনে তার সমস্ত অলসতা, ক্লান্তি ও নিদ্রা দূর হয়ে যাবে। আনন্দাতিশয্যে অবিলম্বে পুরস্কার লাভের জন্য দৌড়াবে।

এসময় যদি মন এই পুরস্কার লাভের জন্য দৌড়ায় তাহলে বোঝা যাবে, বিছানা ছেড়ে উঠতে বাস্তবে তার কোনো সমস্যা নেই। বাস্তবেই যদি তার কোনো সমস্যা থাকতো তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের সংবাদ শুনে সে ওঠতো না। বিছানায় পড়ে থাকতো। এর পর চিন্তা করো, দুনিয়ার একজন রাষ্ট্র প্রধান যে পরিপূর্ণ অক্ষম, চরম অক্ষম, মারাত্মক অক্ষম, সে যদি তোমাকে একটি পুরস্কার বা পদ দেওয়ার জন্য ডাকে তখন যদি তুমি তার জন্য এভাবে দৌড়াতে পারো তাহলে সেই আহকামুল হাকেমীন যার কুদরতের হাতে পুরো কায়েনাত নিয়ন্ত্রিত, তিনিই দান করেন, তিনিই ছিনিয়ে নেন, তার পক্ষ থেকে যখন আহবান আসছে তার দরবারে উপস্থিত হতে তুমি অলসতা করছো! এসব কথা চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ ঐ কাজের হিম্মত হবে এবং অলসতা দূর হবে।

আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রেখো না

কতক সময় অন্তরে একটি নেক আমলের চিন্তা জাগে, কিন্তু মানুষের নফস তাকে এভাবে বিভ্রান্ত করে যে, কাজটি তো ভালো তবে কাল থেকে তা আরম্ভ করবো। মনে রাখবেন! এটা নফসের চক্রান্ত। কারণ ঐ কাল আর কখনো আসে না। যে কাজ করতে হবে তা আজই বরং এখনই শুরু করুন। জানা তো নেই সেই কাল পাবো কি পাবো না। খবর তো নেই কাল সুযোগ হবে কি হবে না। কি জানি কাল এই চাহিদা থাকে কি না থাকে। খবর তো

নেই কালকের অবস্থা অনুকূল হয় না প্রতিকূল। কাল বেঁচে থাকবো কি না তাও তো জানি না। এজন্য কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

নিজের পরওয়ারদেগারের মাগফেরাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, বিলম্ব করো না এবং সেই জান্নাতের দিকে দৌড়াও যার প্রশস্ততা সমস্ত আসমান ও জমীনের সমান।[১]

যাই হোক, আমি বলছিলাম যে, আজ আমার অলসতা লাগছিলো। কিন্তু আমার হযরতের এসব কথা স্মরণ হলো। যার ফলে আসার হিম্মত হলো। চলে আসলাম।

নিজের উপকারের জন্য এসে থাকি

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, এখানে মূলত আমি নিজের ফায়দার জন্য হাজির হই। আমি চিন্তা করি আল্লাহর নেক বান্দারা নেক নিয়ত নিয়ে দ্বীনের কথা শোনার জন্য একত্রিত হয়। তাদের বরকত আমারও লাভ হয়। আসল কথা এই যে, যখন আল্লাহর বান্দারা দ্বীনের খাতিরে কোথাও একত্রিত হয় তখন পরস্পরে একের উপর অপরের বরকত প্রতিফলিত হয়। এজন্য আমি সব সময় এই নিয়তে আসি যে, নেক লোকদের বরকত লাভ করবো।

জীবনের সেই সময়গুলো কোন কাজের?

তৃতীয় বিষয় এই যে, হযরত থানভী রহ.-এর আরেকটি কথা স্মরণ হলো, এ কথাটিও আমি হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, হযরত থানভী রহ. যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। ডাক্তাররা দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তা নিষেধ করে দিয়েছিলো। একদিন তিনি চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। শুয়ে শুয়ে হঠাৎ চোখ খুললেন এবং বললেন মৌলভী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব কোথায়? তাকে ডাকো। মৌলভী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব দ্বারা আমার ওয়ালেদ মাজেদ উদ্দেশ্য ছিলো। হযরত থানভী রহ. আমার ওয়ালেদ ছাহেবকে আরবী ভাষায় আহকামুল কুরআন সংকলনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। ওয়ালেদ ছাহেব যখন

---

১. সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৩৩

তাশরীফ আনলেন তখন তিনি বললেন, আপনি আহকামুল কুরআন লিখছেন, আমার এই মাত্র খেয়াল হলো কুরআনে কারীমের অমুক আয়াত দ্বারা অমুক মাসআলা বের হয়। এই মাসআলা আমি ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। এই আয়াতে যখন পৌঁছবেন তখন এ মাসআলাটিও লিখবেন। একথা বলে আবার চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলেন। আপনারা লক্ষ্য করুন! অন্তিম রোগে শায়িত কিন্তু মন-মগজে কুরআনে কারীমের আয়াত ও তার তাফসীর ঘুরপাক খাচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুললেন বললেন, অমুককে ডেকে আনো। তিনি আসলে তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু কাজের কথা বললেন। বার বার যখন তিনি এমন করছিলেন তখন মাওলানা শাব্বীর আলী ছাহেব যিনি হযরতের খানকার নাযেম এবং হযরতে সঙ্গে তার অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিলো বললেন, হযরত ডাক্তার এবং হাকীম তো আপনাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি বার বার মানুষদেরকে ডেকে তাদের সাথে কথা বলছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাদের উপর রহম করুন। উত্তরে হযরত থানভী রহ. বললেন,

'তুমি তো কথা ঠিক বলেছো, কিন্তু আমি চিন্তা করি যে, জীবনের ঐ সময়গুলো কোন কাজের যা কারো খেদমতে ব্যয় হলো না। কারো খেদমতে যদি এই জীবন কেটে যায় তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত।'

দুনিয়ার পদ-পদবী

খেদমত বড়ো বিস্ময়কর জিনিস। আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে আমাদের অন্তরে এর অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন। সবার খাদেম হোন, নিজের মধ্যে খেদমতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন। হযরত ডা. ছাহেব (কু.সি.) বলতেন, দুনিয়ার সমস্ত পদের অবস্থা এই যে, তা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। উদাহরণস্বরূপ, মন চাচ্ছে আমি রাষ্ট্রপ্রধান হবো, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া কারো এখতিয়ারে নয়। কিংবা মন চাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হবো, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়া ইচ্ছাধীন নয়। মন চাচ্ছে সংসদ সদস্য হবো, তাও ইচ্ছাধীন নয়। কিংবা কোথাও অফিসার হতে চাচ্ছে, চাকুরি চাচ্ছে, তাহলে তার জন্য দরখাস্ত দিতে হবে, ইন্টারভিউ দিতে হবে, অনেক দৌড়-ঝাপ করতে হবে। এতো সব চেষ্টার পর ঐ পদ যখন লাভ হলো তখন মানুষ হিংসা করতে আরম্ভ করলো, এ ব্যক্তি তো আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেলো। আমরা পিছনে পড়ে গেলাম। এবার তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেলো। যে কোনোভাবে তার থেকে এই

পদ ছিনিয়ে নেওয়া হোক। ফল কী হলো? প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী ছিলো, এখন সব শেষ। পদ হাতছাড়া হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপ্রধান ছিলো তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার সব পদেরই এই অবস্থা যে, সেগুলো অর্জন করা নিজের এখতিয়ারে নয় এবং অর্জন হলেও তা টিকে থাকা নিজের এখতিয়ারে নয়। মানুষ এর জন্য হিংসা করে। হযরত বলতেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী পদের কথা বলছি, যা অর্জন করাও নিজের এখতিয়ারে এবং সে পদ অর্জন করলে কেউ এর জন্য তোমার সঙ্গে হিংসা করবে না, লড়াই ঝগড়া করবে না। কেউ তোমাকে তা থেকে বরখাস্তও করতে পারবে না। তা হলো খাদেম ও সেবক হওয়ার পদ। তুমি খাদেম হয়ে যাও। এই পদ নিজের এখতিয়ারে। এর জন্য দরখাস্ত দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, ভোট দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, ইলেকশনেরও প্রয়োজন নেই। এই পদ লাভ হলে এর জন্য অন্যেরা হিংসাও করে না। কারণ সে তো কাজই করছে খেদমতের। এখন অন্য ব্যক্তি তার জন্য কিভাবে হিংসা করবে। কোনো ব্যক্তি তোমাকে এই পদ থেকে বরখাস্তও করতে পারবে না। এ জন্য হযরত বলেন, খাদেম হয়ে যাও। কার খাদেম হবে? নিজের পরিবারের লোকদের খাদেম হয়ে যাও। ঘরের যেই কাজ করবে খেদমতের নিয়তে করবে। যদি ওয়াজ করো তাও খেদমতের জন্য করো। গ্রন্থ রচনা করো, তাও খেদমতের জন্য। খেদমতের পদ লাভ করো। কারণ সমস্ত ঝগড়া মাখদুম হওয়ার মধ্যে। এজন্য হযরত নিজে নিজের সম্পর্কে বলতেন যে, আমি তো আমাকে খাদেম মনে করি। নিজের স্ত্রীর খাদেম, সন্তানের খাদেম, মুরীদদের খাদেম, বন্ধু-বান্ধবের খাদেম। এটা এমন একটা পদ যার মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসাও কম হয়ে থাকে। কারণ উজুব, তাকাব্বুর, অহমিকা ইত্যাদি ঐ সব পদের মধ্যে সৃষ্টি হয় জাগতিকভাবে যেগুলোকে বড়ো মনে করা হয়। খাদেমের পদে তো বড়ত্ব নেই। এজন্য শয়তানি ওয়াসওয়াসাও আসে না। এজন্য তা অর্জন করার চেষ্টা করো।

বুযুর্গদের খেদমতে হাজির হওয়ার উপকারিতা

আমি বলছিলাম যে, আজ অলসতা লাগছিলো। কিন্তু আমার হযরতের এসব কথা স্মরণ হলো, সাহস সঞ্চার হলো। আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক করার এই ফায়দা হয়ে থাকে। মনে তো নেই হযরত এ কথাগুলো কখন বলেছিলেন। আমার নিজের পক্ষ থেকে না তলব ছিলো, না কামনা ছিলো, না

কোনো চেষ্টা ছিলো, কিন্তু হযরত জোর করে কিছু কথা শুনিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, এখন সেই কথাগুলো সময় মতো স্মরণ হয় এবং কাজে দেয়।

কথাগুলো এখন তোমার হয়ে গেলো, যথাসময়ে স্মরণ হবে

হযরত বলতেন, মজলিসে যেসব কথা হয় অনেক মানুষ চায় সেগুলো মুখস্থ করতে, কিন্তু সেগুলো মুখস্থ হয় না। এ প্রসঙ্গে নিজের ঘটনা শোনালেন যে, আমিও যখন হযরত থানভী রহ.-এর মজলিসে হাজির হতাম তখন মন চাইতো হযরতের কথাগুলো লিখে ফেলি। কেউ কেউ লিখতো। আমি দ্রুত লিখতে পারতাম না এজন্য আমার লেখা হতো না। আমি একদিন হযরত থানভী রহ.-এর কাছে নিবেদন করলাম, হযরত আমার মন চায় মালফূযাতগুলো লিখে ফেলি কিন্তু লেখা হয় না, ওদিকে স্মরণ থাকে না ভুলে যাই। হযরত থানভী রহ. উত্তরে বললেন, লেখার কি দরকার আছে? নিজে মালফূযের অধিকারী হওনা কেন? হযরত বলেন, আমি কেঁপে উঠলাম। আমি কি করে মালফূযের অধিকারী হবো? তখন হযরত থানভী রহ. বললেন, আসল কথা হলো, কথা যদি হক হয় এবং সুস্থ বুঝ ও বিশুদ্ধ চিন্তার উপর তার ভিত্তি হয়, এমন কথা যখন তোমার কানে পড়বে এবং তোমার আত্মা তা গ্রহণ করবে সে কথা তোমার হয়ে গেলো। এখন ঠিক ঐ কথা ঐ শব্দে মনে থাক বা না থাক যখন সময় হবে ইনশাআল্লাহ তখন স্মরণ হয়ে যাবে এবং তার উপর আমল করার তাওফীক লাভ হবে।

বুযুর্গদের খেদমতে যাওয়া এবং তাদের কথা শোনার এটাই ফায়দা হয়ে থাকে যে, তারা কথা কানে দিতে থাকেন। অবশেষে তা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে যথা সময়ে তা স্মরণ হয়।

কানে জোরপূর্বক কথা প্রবেশ করাবে

আমি এখন চিন্তা করি, হযরত ওয়ালেদ মাজেদ (কু.সি.) হযরত ডা. ছাহেব (কু.সি.) এবং হযরত মাওলানা মাছিহুল্লাহ খান ছাহেব (কু.সি.) এই তিন বুযুর্গের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো। নিজের অবস্থা তো শোচনীয় ছিলো কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব বুযুর্গের খেদমতে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করেছিলেন। এটা তাঁর দয়া ও মেহেরবানী। এখন সারাজীবনও যদি এর উপর শোকর আদায় করি তবুও আদায় হবে না। এসকল বুযুর্গ জোরপূর্বক

কিছু কথা কানে দিয়েছেন। নিজের পক্ষ থেকে যার কোনো চাহিদা ছিলো না, বাসনা ছিলো না। আমি যদি সেই কথাগুলো এখন নম্বর দিয়ে লিখতে চাই যেগুলো বুযুর্গদের মজলিসে শুনেছিলাম তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সব কথা স্মরণ আসা মুশকিল। কিন্তু কোনো না কোনো সময় সেসব কথা স্মরণ হয়। বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কের এটাই ফায়দা। বুযুর্গদের খেদমতে হাজির হওয়া যেমন নেয়ামত এবং তাদের কথা শোনা যেমন নেয়ামত তেমনিভাবে সেসকল বুযুর্গের মালফূযাত ও জীবনী পাঠ করাও নেয়ামত, এগুলোর দ্বারাও ফায়দা হয়। আজ এসকল বুযুর্গ নেই কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ তারা সব কথা লিখে গেছেন। সেগুলো মুতালায়া করা উচিত। এসব কথা কাজে আসে। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে এসকল বুযুর্গের আঁচল ধরে রাখার তাওফীক দান করুন।

ওযর ও অলসতার মধ্যে পার্থক্য

মোটকথা, আমি বলছিলাম যে, যখনই অলসতা হবে তার মোকাবেলা করতে হবে, নিয়মিত আমল পুরা করতে হবে। মনে রাখবেন! ওযর এক জিনিস আর অলসতা আরেক জিনিস। ওযরের কারণে যদি আমল ছুটে যায় তাহলে দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। যেমন অসুস্থতার কারণে আমল ছুটে গেলো বা সফরের কারণে আমল ছুটে গেলো এতে কোন সমস্যা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন এর জন্য পাকড়াও করেননি বরং ওযরের কারণে ছাড় দিয়েছেন তাই আমরা কে বাধ্যবাধকতা আরোপকারী? এজন্য কোনো ওযরের কারণে আমল ছুটে গেলে ব্যাথিত হওয়া উচিত নয়।

এ রোযা কার জন্য রাখছিলে?

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) হযরত থানভী রহ.-এর এ কথা বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রমাযান মাসে অসুস্থ হয়। অসুস্থতার কারণে তার রোযা ছুটে যায়। রমাযানের রোযা ছুটে যাওয়ার কারণে সে ব্যথিত ছিলো। হযরত বললেন, দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। তুমি এটা দেখো যে, রোযা কার জন্য রাখছিলে? তুমি যদি নিজের জন্য, নিজের মনকে খুশি করার জন্য, নিজের আগ্রহ পুরা করার জন্য রোযা রাখছিলে তাহলে তো নিঃসন্দেহে দুঃখিত হও যে, অসুস্থতার কারণে রোযা ছুটে গেলো। কিন্তু যদি আল্লাহ জন্য রোযা রাখছো তাহলে ব্যথিত হওয়ার

প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেছেন যে, অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দাও।

তাই শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে যদি রোযা কাযা হয় বা আমল ছুটে যায় যেমন অসুস্থতা, সফর, মেয়েদের স্বাভাবিক সমস্যা বা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যস্ততার কারণে- যা দ্বীনেরই দাবি ছিলো- আমল ছুটে যায়, উদাহরণস্বরূপ, মা-বাবা অসুস্থ তাদের খেদমতে ব্যস্ত থাকার ফলে আমল ছুটে গেলো, তাহলে এর জন্য মোটেই ব্যথিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অলসতার কারণে আমল ছাড়া উচিত নয়।

অলসতার চিকিৎসা

অলসতার একমাত্র চিকিৎসা তার মোকাবেলা করা। তার সামনে অবিচল হয়ে দাঁড়ানো। সাহসিকতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। নিজের সংকল্পকে ব্যবহার করা ছাড়া এর অন্য কোনো চিকিৎসা নেই। আমাদের জীবনেও যদি এতটুকু বিষয় চলে আসে অর্থাৎ, অলসতার মোকাবেলা করি তাহলে বুঝুন যে, অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। তারপর অবশিষ্ট অর্ধেক অর্জনের চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় অলসতার মোকাবেলা করার হিম্মত ও তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

কুদৃষ্টি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুদৃষ্টি ব্যাধির বর্ণনা দিয়েছেন। কুদৃষ্টি এমন এক ব্যাধি যার মধ্যে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত। শিক্ষিত ও লেখাপড়া জানা মানুষ, আলেম-ওলামা, আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ওঠানো মানুষ, ধার্মিক ও নামায-রোযার পাবন্দ ব্যক্তিরাও এই রোগে আক্রান্ত। আজকাল তো ঘর থেকে বাইরে বের হলে নিজের দৃষ্টিকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। চর্তুদিকে এমন সব দৃশ্য যা থেকে চোখকে বাঁচানো মুশকিল।

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৮-১৩৩, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা নূর, আয়াত-৩০

কুদৃষ্টির স্বরূপ

কুদৃষ্টি হলো, কোনো পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বিশেষ করে কামনার সাথে স্বাদ উপভোগের জন্য দৃষ্টিপাত করা। সেই পরনারী প্রকৃত হোক বা তার ছবি হোক। ছবির উপরও দৃষ্টিপাত করা হারাম। এটাও কুদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

এই কুদৃষ্টি মানুষের আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক। কুদৃষ্টি মানুষের আত্মাকে এমনভাবে ধ্বংস করে যে, তা অন্য সমস্ত গোনাহ থেকে মারাত্মক। মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এর অনেক বেশি দখল রয়েছে। এর সংশোধন না হওয়া এবং দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির চিন্তা করাও প্রায় অসম্ভব। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلنَّظَرُ سَهْمٌ مَّسْمُوْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

'দৃষ্টি ইবলিসের তীরসমূহের মধ্যে থেকে একটি বিষ মিশ্রিত তীর, এই তীর ইবলিসের ধনুক থেকে বের হয়।'[১]

কেউ যদি নির্দ্বিধায় তা মেনে নেয় এবং তার সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে তার অর্থ এই যে, তার আত্মশুদ্ধির পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হলো। কারণ মানুষের আত্মাকে বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে এই কুদৃষ্টির যেই পরিমাণ দখল রয়েছে সম্ভবত অন্য কোনো গোনাহের এই পরিমাণ দখল নেই।

এই তিতা ঢোক পান করতে হবে

আমি আমার শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, দৃষ্টির অপব্যবহার মানুষের আত্মার জন্য জীবননাশক বিষতুল্য। যদি কেউ আত্মশুদ্ধি করতে চায় তাহলে তাকে সর্বপ্রথম দৃষ্টির হেফাজত করতে হবে। এই কাজটি খুব মশকিল মনে হয়। চেষ্টা করা সত্ত্বেও চোখের হেফাজত করা কঠিন হয়ে পড়ে। সর্বত্র বেপর্দা, নগ্নতা, অশ্লীলতার সয়লাব। এমন পরিস্থিতিতে নিজের দৃষ্টিকে বাঁচানো মুশকিল মনে হয় কিন্তু কেউ যদি ঈমানের মধুরতা লাভ করতে চায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সঠিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা অর্জন করতে চায়, নিজের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা,

---

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৩, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ১৩০৬৮, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮১, উদদাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরিন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮

বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে এই তিতা ঢোক পান করতেই হবে। এই তিতা ঢোক পান করা ছাড়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যাবে না। কিন্তু এই তিতা ঢোক এমন যে, শুরুর দিকে তা খুব তিতা মনে হলেও একবার তার অভ্যাস করে নেওয়া হলে এ পরিমাণ মিষ্টি হয়ে যায় যে, এটা ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না।

আরবদের কফি

আরবের লোকেরা কফি পান করে থাকে। আপনারাও দেখেছেন তারা ছোট ছোট পিয়ালায় কফি পান করে। আমার স্মরণ আছে, আমি যখন শিশু ছিলাম ঐ সময় কাতারের এক শাইখ করাচী এসেছিলেন। আমার ওয়ালেদ ছাহেবের সঙ্গে আমিও তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই। সেই সাক্ষাতকালে সেখানের বৈঠকে সর্বপ্রথম সেই কফি দেখি। সবাইকে কফি পান করতে দেওয়া হয়। কফি শব্দ শুনতেই মাথায় আসে যে এটা মিষ্টি জিনিস। কিন্তু মুখে লাগিয়ে দেখি তা এ পরিমাণ তিতা যে, গলাধঃকরণ করাও মুশকিল। কফি ছিলো সামান্য। সবার সামনে মজলিসের মধ্যে কুলি করে ফেলে দিতেও পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে কোনো মতে তা গিলে ফেলি। কিন্তু যখন গলা থেকে ভিতরে যায় তখন তার স্বাদ অনুভব হয়। তারপর পরবর্তীতে আরেকটি মজলিসে এই কফি পান করার সুযোগ হয়। আস্তে আস্তে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, এখন তা এতো মজার ও স্বাদের অনুভূত হয় যে, তার কোনো শেষ নেই। কারণ এখন তা পান করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

এরপর মধুরতা ও স্বাদ উপভোগ হবে

এমনিভাবে এটাও এমন তিতা ঢোক যে, প্রথম প্রথম তা পান করা কঠিন মনে হয়, কিন্তু পান করার পর যখন তার আনন্দ ছেয়ে যাবে তখন দেখবে তার মধ্যে কত মজা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই মধুরতা দান করুন। মোটকথা, এটা এমন তিতা জিনিস একবার তার তিক্ততা সহ্য করো, অন্তরে পাথর বেঁধে একবার তার তিক্ততা গলাধঃকরণ করো তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এমন মধুরতা, এমন স্বাদ, এমন উপভোগ দান করবেন যে, তার সামনে এই কুদৃষ্টির স্বাদ অত্যাধিক গৌণ ও তুচ্ছ মনে হবে। তার সামনে এর কোনোই মূল্য থাকবে না।

চোখ অনেক বড়ো নেয়ামত

এই চোখ একটি মেশিন। এটি আল্লাহ তা'আলার এমন নেয়ামত যে, মানুষ তার কল্পনাও করতে পারে না। যা না চাইতেই পাওয়া গেছে। বিনামূল্যে পাওয়া গেছে। এর জন্য কোনো মেহনত করতে হয়নি, পয়সা ব্যয় করতে হয়নি। এ জন্য এই নেয়ামতের কদর নেই। যারা এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত, যারা অন্ধ, যাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বা শুরু থেকেই যাদের এই নেয়ামত নেই, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখো এই চোখ কতো বড়ো জিনিস। আল্লাহ না করুন! যদি দৃষ্টিশক্তি কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন সারা পৃথিবী অন্ধকার মনে হবে। সে সময় মানুষ নিজের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে হলেও এই দৌলত লাভ করতে চাইবে। এটা এমন এক মেশিন যে, আজ পর্যন্ত এমন মেশিন কেউ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি।

মুহূর্তে সাত মাইলের সফর

আমি একটি কিতাবে পড়েছিলাম, আল্লাহ তা'আলা মানুষের চোখে যেই মণি রেখেছেন এটা অন্ধকারের মধ্যে সংকুচিত হয়, আর আলোর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। যখন মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে আসে বা আলো থেকে অন্ধকারে আসে তখন এই সংকোচন ও বিস্তৃতি লাভের ঘটনা ঘটে। এই সংকোচন ও বিস্তৃতি লাভের মধ্যে চোখের স্নায়ু সাত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে। কিন্তু মানুষ এতো বড়ো ব্যাপারটি বুঝতেও পারে না! এমন এক নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন।

চোখের সঠিক ব্যবহার

এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করা হলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাকে এর উপর ছওয়াবও দান করবো। যেমন এই চোখের মাধ্যমে নিজের মা বাবার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালো, তাহলে হাদীস শরীফে এসেছে, একটি হজ্জ ও একটি ওমরাহ করার ছওয়াব লাভ হবে। আল্লাহু আকবার। অপর এক হাদীসে এসেছে, স্বামী ঘরে প্রবেশ করে যদি নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে এবং বিবি স্বামীকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা উভয়কে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন। যখন এই চোখকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা হয় তখন শুধু এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বাদ ও মজা দান করেন বরং এর উপর ছওয়াব ও প্রতিদানও দিয়ে

থাকেন। কিন্তু যদি এর অপব্যবহার করা হয়, অন্যায় জায়গায় দৃষ্টিপাত করা হয়, খারাপ জিনিস দেখা হয় তখন এর আপদও মারাত্মক হয় এবং এ কাজ মানুষের অভ্যন্তরকে নষ্ট করে দেয়।

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার চিকিৎসা

এই কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার একটাই পথ রয়েছে, আর তা হলো, সাহস করে কাজ নিতে হবে, দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, এই দৃষ্টি দ্বারা আমি খারাপ জায়গায় দৃষ্টিপাত করবো না। তারপর আত্মা যদি বিদীর্ণও হয়ে যায় তবুও খারাপ জায়গায়, নিষিদ্ধ জায়গায় দৃষ্টিপাত করো না। কবি বলেন,

آرزوئیں خون ہوں، یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

হিম্মত ও সংকল্প করেই দৃষ্টিকে বাঁচাতে হবে তারপর দেখবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কেমন সাহায্য আসে। হযরত থানভী রহ. এই চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু তাদবীর বলেছেন, তা স্মরণ রাখার মতো।

তিনি বলেন, 'কোনো মহিলা চোখে পড়লে মন যদি বলে, একবার দেখলে কি সমস্যা? কারণ তুমি তো আর ব্যভিচার করবে না। তখন মনে রাখতে হবে যে, এটা নফসের ষড়যন্ত্র। বাঁচার উপায় হলো তার কথা মতো আমল করবে না।'[১]

কারণ এটা শয়তানের ধোঁকা। সে বলে, দেখলে কি সমস্যা? দেখা তো এ জন্য নিষেধ যে, মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। আর এখানে তো ব্যভিচারের সম্ভাবনা নেই তাই দেখে নাও, কোনো সমস্যা নেই। হযরত বলেন, এটা নফসের চক্রান্ত। এর চিকিৎসা হলো, তার কথা মতো কাজ করবে না। যতো আগ্রহই সৃষ্টি হোক দৃষ্টি সরিয়ে নিবে।

কামনামূলক চিন্তার চিকিৎসা

হযরত ডাক্তার ছাহেব রহ. একবার বলেন যে, অন্তরে গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হলে এভাবে তার চিকিৎসা করবে, যেমন অন্তরে অপাত্রে দৃষ্টিপাত করে স্বাদ উপভোগ করার প্রচণ্ড চাহিদা সৃষ্টি হলে কল্পনা করবে যে, আমার বাবা

---

১. আনফাসে ঈসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪২

যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখেন তাহলেও কি আমার এ আচরণ অব্যাহত থাকবে? কিংবা আমি যদি জানতে পারি যে, আমার শাইখ আমাকে এ অবস্থায় দেখছেন তখনও কি এ কাজ অব্যাহত থাকবে? কিংবা আমি যদি বুঝতে পারি যে, আমার সন্তান আমার এ আচরণ দেখছে তাহলেও কি এ কাজ চালু থাকবে? বলাবাহুল্য যে, এদের মধ্যে থেকে যে কেউ আমার এ আচরণ দেখলে তখন আমি দৃষ্টি নত করে ফেলবো। এ কাজ করবো না। মনের মধ্যে যতো চাহিদাই হোক না কেন এ কাজ আর করবো না।

তারপর এ কথা চিন্তা করো যে, এদের দেখা না দেখার দ্বারা আমার দুনিয়া আখেরাতে কোনো তারতম্য হবে না। কিন্তু আমার এ অবস্থা আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তা'আলা দেখছেন। আমার এ বিষয়ে পরোয়া নেই কেন? কারণ তিনি তো আমাকে এ কারণে শাস্তি দিতেও সক্ষম। এই চিন্তার বরকতে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এই গোনাহ থেকে হেফাজত করবেন।

তোমার জীবনের ফিল্ম চালিয়ে দেয়া হলে!

হযরত ডা. ছাহেব (কু.সি.)-এর আরেকটি কথা স্মরণ হলো, তিনি বলেন, একটু চিন্তা করো যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আখেরাতে তোমাকে বলেন, আচ্ছা, জাহান্নামে যেতে যদি তোমার ভয় লাগে তাহলে চলো আমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে এবং আগুন থেকে রক্ষা করবো, কিন্তু তার জন্য একটি শর্ত রয়েছে তা এই যে, আমি তোমার পুরা জীবন শিশু কাল, যৌবন কাল, বৃদ্ধ কাল এবং মৃত্যু কাল যেভাবে অতিবাহিত করেছো আমি তার ফিল্ম চালিয়ে দেবো। এই ফিল্ম যারা দেখবে তাদের মধ্যে তোমার বাপ, তোমার মা, তোমার ভাই-বোন, তোমার সন্তান, তোমার ছাত্র, তোমার ওস্তাদ, তোমার বন্ধু-বান্ধব সকলেই থাকবে। এই ফিল্মের মধ্যে তোমার পুরো জীবনের চিত্র তুলে ধরা হবে। যদি তুমি এটা মঞ্জুর করো তাহলে তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে।

এরপর হযরত বলেন, এমতাবস্থায় মানুষ হয়তো আগুনের আযাবকে মেনে নিবে, কিন্তু এসমস্ত মানুষের সামনে তার জীবনের নকশা চলে আসুক, চিত্র চলে আসুক তা মেনে নিবে না। তাই যখন নিজের মা-বাপ, দোস্ত-আহবাব, আত্মীয়-স্বজন ও সৃষ্টির সামনে নিজের জীবনের অবস্থা আসা এবং

তা প্রকাশ পাওয়া সহ্য নয়, তাহলে এসমস্ত অবস্থা আল্লাহ তা'আলার সামনে আসা কি করে সহ্য হয়? এই কথাটা একটু চিন্তা করে দেখো।

আত্মা ধাবিত হওয়া ও বিচলিত হওয়া গোনাহ নয়

এরপর হযরত আরেকটি মালফূযাতে ইরশাদ করেন,

'কুদৃষ্টির একটি স্তর হলো মন ধাবিত হওয়া, যা অনিচ্ছাকৃত। এর জন্য পাকড়াও করা হবে না। আরেকটি স্তর হলো তার চাহিদা অনুপাতে আমল করা, এটা ইচ্ছাকৃত। এর জন্য পাকড়াও করা হবে।'[১]

মন ধাবিত হওয়ার অর্থ এই যে, দেখার জন্য খুব মন চাচ্ছে, মন বিচলিত হচ্ছে, এই মনের চাওয়া ও বিচলিত হওয়া এবং ধাবিত হওয়া এটা যেহেতু ইচ্ছাবর্হিভূত, এজন্য আল্লাহ তা'আলা এর কারণে পাকড়াও করবেন না। এতে কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তর হলো মনের চাহিদা অনুপাতে কাজ করা, তার দিকে দৃষ্টিপাত করা, এটা ইচ্ছাকৃত। এরজন্য পাকড়াও করা হবে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি পড়ে যায় এবং নিজের ইচ্ছায় তা অব্যাহত রাখে তাহলেও পাকড়াও করা হবে এবং গোনাহ হবে। তো মন ধাবিত হ[illegible]র প্রথম স্তর হলো ইচ্ছাবর্হিভূত সেটা মাফ, সে জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর দ্বিতীয় স্তর হলো ইচ্ছাকৃত এর জন্য পাকড়াও করা হবে।

চিন্তা করে করে স্বাদ গ্রহণ করা হারাম

এরপর বলেন,

'ইচ্ছা করে দেখা এবং চিন্তা করা সব এর অন্তর্ভুক্ত। নফসকে প্রতিহত করা, নিয়ন্ত্রণ করা ও দৃষ্টিকে অবনত রাখা হলো এর চিকিৎসা।'

আজনবী ও গায়রে মাহরাম কোনো মহিলার কথা চিন্তা করে স্বাদ উপভোগ করা তেমনি হারাম, যেমন কুদৃষ্টি করা হারাম। দেখাও এর অন্তর্ভুক্ত। চিন্তা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এর চিকিৎসা এই বলেছেন যে, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করো, দৃষ্টিকে নত রাখো। আগে-পিছে, এদিকে-ওদিকে এবং ডানে-বামে না দেখে জমিনের দিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলো।

---

১. আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা-১৪২

পথচলার সময় দৃষ্টি নত রাখুন

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন, তখন যেতে যেতে সে দু'আ করলো, হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিন, সুযোগ দিন, অবকাশ দিন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অবকাশ দিলেন, তখন সে অহংকার দেখালো। সে বললো,

لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ

'আমি ঐ বান্দাদের কাছে তাদের ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে যাবো এবং চর্তুদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবো।'[১]

হযরত বলেন, শয়তান চার দিকের কথা বর্ণনা করেছে। বোঝা গেলো শয়তান এই চারদিক থেকে আক্রমণ করে। কখনো সামনে থেকে, কখনো পিছন থেকে, কখনো ডান থেকে, কখনো বাম থেকে। কিন্তু দুটি দিকের কথা সে বলেনি, ছেড়ে দিয়েছে। এক উপরের দিক, আরেক নীচের দিক। এজন্য উপরের দিক থেকেও নিরাপদ এবং নীচের দিক থেকেও নিরাপদ। এখন যদি উপরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলো তাহলে ধাক্কা খাবে, পড়ে যাবে। এজন্য এখন একটাই মাত্র রাস্তা বাকি আছে, তা হলো নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের চার দিকের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, নিরাপদে থাকতে পারবে। এ কারণে বিনা প্রয়োজনে ডানে-বামে তাকিও না। আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলো। তারপর দেখবে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তোমাকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[২]

খোদ কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর তার ফলাফল বলেছেন যে, এর কারণে লজ্জাস্থানের হেফাজত হবে, পবিত্রতা লাভ হবে।

---

১. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত-১৭

২. সূরা নূর, আয়াত-৩০

এ কষ্ট জাহান্নামের কষ্টের চেয়ে কম

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন,

'নফসের যতো কষ্টই হোক সাহস করে এ দুটি বিষয়কে অবলম্বন করবে। কারণ, এ কষ্ট জাহান্নামে আগুনের কষ্টের চেয়ে কম।'

অর্থাৎ, এখন তো দৃষ্টি নত করতে নফসের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এই কুদৃষ্টির কারণে জাহান্নামে যেই আযাব হবে, তার কষ্টের তুলনায় এ কষ্ট লাখ-কোটি বরং মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ কম। বরং এখানের কষ্টের সাথে সেখানের কষ্টের কোনো তুলনাই হয় না। কারণ, সেখানের আযাব হলো অন্তহীন, কখনো তা শেষ হবে না। আর এখানের কষ্ট তো শেষ হয়ে যাবে।

সাহসিকতার সাথে কাজ করুন

এরপর বলেন,

'সাহস করে কয়েকদিন যখন এমন করবে তখন সেদিকে আকর্ষণ কমে যাবে। এটাই চিকিৎসা, এছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই। যদিও সারাজীবন উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরুক না কেন।'

কারণ, মানুষ মেহনত ও কষ্ট সহ্য করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ওয়াদা করেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যে ব্যক্তি আমার পথে মুজাহাদা করবে আমি অবশ্যই তাকে পথ দেখাবো।'[১]

তিনি মুজাহাদা ও সাধনাকারীকে পথ দেখান। এ জন্য মুজাহাদা করে দৃষ্টি নত করো, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আকর্ষণও কমিয়ে দিবেন, ইনশাআল্লাহ। এটাই চিকিৎসা। এছাড়া কোনো চিকিৎসা নেই। যদিও সারাজীবন দিশেহারা হয়ে ঘুরুক না কেন? মানুষ চায় আমরা যখন শাইখের কাছে যাবো তখন শাইখ এমন এক ফুঁ দিবেন বা এমন এক ব্যবস্থাপত্র দিবেন বা এমন এক ওযীফা পড়তে দিবেন, যার ফলে চোখে আর আকর্ষণ থাকবে না। আরে ভাই! এমনটি হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ হিম্মত করে কাজ না করে।

---

১. সূরা আনকাবূত, আয়াত-৬৯

এ দুটি কাজ করুন! একটি হলো হিম্মত করুন আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহমুখী হোন। হিম্মত ব্যবহার করার অর্থ হলো সাধ্য মতো নিজেকে দূরে রাখুন। আর আল্লাহমুখী হওয়ার অর্থ হলো, যখনই এমন পরীক্ষা সামনে আসবে সাথে সাথে আল্লাহমুখী হোন, আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। আল্লাহকে বলুন, হে আল্লাহ! নিজ দয়ায় আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমার চোখকে রক্ষা করুন, আমার চিন্তাকে রক্ষা করুন, আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে তো আমি আক্রান্ত হয়ে যাবো।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চরিত্র অবলম্বন করুন

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন পরীক্ষার শিকার হলেন তখন তিনি এই কাজই করেছিলেন। নিজের তরফ থেকে চেষ্টা করেছিলেন। যখন জুলায়খা চর্তুদিক থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে গোনাহের দাওয়াত দিলো, তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ চোখে দেখছিলেন যে, দরজায় তালা লাগানো আছে, বের হওয়ার কোনো পথ নেই। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দরজার দিকে দৌড়ালেন। যখন স্বচক্ষে দেখা যচ্ছে যে, দরজায় তালা লেগে আছে তখন দৌড়ে যাবেন কোথায়? পথ তো নেই। কিন্তু যেহেতু দরজা পর্যন্ত দৌড়ে যেতে তিনি সক্ষম ছিলেন, তাই নিজের সাধ্যের কাজটুকু তিনি করলেন। নিজের ইচ্ছাধীন যা ছিলো, তা তিনি বাস্তবায়ন করলেন। দরজা পর্যন্ত যাওয়ার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ করার হকদার হলেন যে, হে আল্লাহ! আমার সাধ্যে তো এতটুকুই ছিলো। এরচে' বেশি তো আমার সাধ্য নেই। এবার সামনে আপনার কাজ। যখন নিজের অংশের কাজ করে আল্লাহর কাছে চাইলেন, হে আল্লাহ! সামনের কাজ আপনার ক্ষমতাভুক্ত, তখন আল্লাহ তা'আলাও নিজের অংশেরটুকু করলেন। তিনিও দরজার তালা ভেঙ্গে দিলেন। এ বিষয়টিই মাওলানা রূমী রহ. খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করে বলেছেন,

گرچہ رخنہ نیست عالم راپدید

خیرہ یوسف واری باید دوید

যদিও তোমার সামনে এই দুনিয়াতে কোন পথ ও আশ্রয়স্থল পাচ্ছো না, চর্তুদিক থেকে গোনাহের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তুমি পাগলের মতো পালাও। পাগলের মতো এমনভাবে পালাও যেভাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পালিয়েছিলেন। তুমি যতটুকু পালিয়ে যেতে পারো দৌড়াতে পারো ততটুকু দৌড়াও, বাকী আল্লাহর কাছে চাও। যাই হোক, মানুষ যদি এ দুটি কাজ করে, এক নিজের সাধ্য মতো কাজ করা, দ্বিতীয় আল্লাহর কাছে চাওয়া, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, দুনিয়াতে কামিয়াবী লাভের মূল কথা এটাই।

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পদ্ধতি অবলম্বন করুন

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) খুব বিস্ময়কর বিস্ময়কর কথা বলতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে তিন দিন পর্যন্ত মাছের পেটে রেখেছিলেন। সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ ছিলো না। চর্তুদিকে অন্ধকার। বিষয়টি সাধ্যের বাইরে চলে গেছিলো। তখন তিনি সমস্ত অন্ধকারের ভিতর অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকলেন আর এই কালিমা পড়লেন,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

'হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তুমি সব দোষ থেকে পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমিই অপরাধী।'[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তিনি আমাকে অন্ধকারের ভিতর থেকে ডাকলেন তখন আমি বললাম,

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِی الْمُؤْمِنِیْنَ

অর্থাৎ, আমি তার ডাক শুনলাম এবং তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম। সুতরাং তিন দিন পর মাছের পেট থেকে বের হয়ে এলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি এবং দেবো।[২]

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৮
২. সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৮

হযরত ডা. ছাহেব বলতেন, তোমরা একটু চিন্তা করো তো দেখি, আল্লাহ তা'আলা এখানে কেমন কথা বললেন যে, আমি ঈমানদারদেরকেও এভাবে মুক্তি দিবো? সব ঈমানদার কি তাহলে প্রথমে মাছের পেটে যাবে, তারপর সেখানে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে নাজাত দিবেন? এ আয়াতের অর্থ কি তাই? এ আয়াতের অর্থ তা নয়। বরং আয়াতের অর্থ হলো, হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে অনেক অন্ধকারের ভিতর আক্রান্ত হয়েছিলেন তেমনিভাবে তোমরাও অন্য ধরনের অন্ধকারের মধ্যে আক্রান্ত হতে পারো কিন্তু সেখানেও তোমাদের অবলম্বন তাই যা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম গ্রহণ করেছিলেন, আর তা হলো আমাকে এই শব্দ দিয়ে ডাকা।

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নাই, আপনি সব ধরনের দোষ থেকে মুক্ত। নিঃসন্দেহে আমি অপরাধী।'[১]

যখন তুমি এই কালিমার মাধ্যমে আমাকে ডাকবে তখন তুমি যে ধরনের অন্ধকারে আক্রান্ত হবে আমি তোমাকে তা থেকে নাজাত দিবো।

এ জন্য যখন নফসের চাহিদার অন্ধকার সামনে আসবে এবং পরিবেশের অন্ধকার সামনে আসবে তখন তুমি আমাকে ডাকো, হে আল্লাহ! এসব অন্ধকার থেকে রক্ষা করুন, এসব অন্ধকার থেকে বের করে দিন, এগুলোর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। এভাবে যখন দু'আ করবে তখন এই দু'আ কবুল না হওয়া অসম্ভব।

দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দু'আ কবুল হওয়া

দেখুন! যখন মানুষ কোনো দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে, যেমন এই দু'আ করলো যে, হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন, হে আল্লাহ! আমাকে টাকা পয়সা দিন, হে আল্লাহ! আমাকে অমুক চাকুরিটা দিন, হে আল্লাহ! আমাকে অমুক পদ দিন, তখন এ সব দু'আই কবুল হয়, তবে কবুল হওয়ার ধরন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কখনো ঠিক ঐ জিনিসই আল্লাহ তা'আলা দান করেন যা সে চেয়েছে। যেমন টাকা পয়সা

---

১. সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত-৮৮

চেয়েছিলো, তো আল্লাহ তা'আলা টাকা পয়সা দিয়ে দিলেন। কিংবা কোনো পদ চেয়েছিলো, তা দিয়েদিলেন। কিন্তু কতক সময় আল্লাহ তা'আলা দেখেন যে এ ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতার কারণে এমন জিনিস চাচ্ছে, আমি যদি তা দেই তা তার জন্য আযাবের কারণ হবে। যেমন টাকা পয়সা চাচ্ছে, আমি যদি তাকে টাকা পয়সা দেই তাহলে তার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যাবে। সে ফেরাউন হয়ে যাবে। নিজের দুনিয়াও খারাপ করবে, আখেরাতও খারাপ করবে। এজন্য আমি তাকে বেশি টাকা পয়সা দিবো না। কিংবা এক ব্যক্তি কোনো পদ-পদবী চাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, সে যদি এই পদ লাভ করে তাহলে কি বিপর্যয় ঘটাবে, চরম বিপর্যয় ঘটাবে। এজন্য কতক সময় ঐ প্রার্থিত জিনিস দেওয়া সমীচীন হয় না, এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে এর চেয়ে ভালো জিনিস দিয়ে থাকেন।

দ্বীনি উদ্দেশ্যের দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে

কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি দ্বীন চায় আর দু'আ করে, হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের উপরে পরিচালিত করুন, আমাকে সুন্নাতের উপর পরিচালিত করুন, আমাকে গোনাহ থেকে রক্ষা করুন। তাহলে কি এখানে কোনো সম্ভাবনা আছে যে, দ্বীনের উপর চলার কারণে অধিক ক্ষতি হবে, আর অন্য পথে চললে ক্ষতি কম হবে? ফলে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের পরিবর্তে ঐ পথে পরিচালিত করবেন। যেহেতু এখানে এ সম্ভাবনা নেই। এজন্য যেই দু'আ দ্বীনের জন্য চাওয়া হয় এবং বলা হয় যে, হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীন দান করুন, হে আল্লাহ! আমাকে গোনাহ থেকে রক্ষা করুন, হে আল্লাহ! আমাকে ইবাদতের তাওফীক নসীব করুন। এসব দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। এখানে কবুল না হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এজন্য যখনই আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে একীনের সাথে দু'আ করবে। অবশ্যই তা কবুল হবে।

দু'আ করার পর যদি গোনাহ হয়ে যায়

আমাদের হযরত ডা. ছাহেব (কু.সি.) বলতেন, তুমি যখন এই দু'আ করলে যে, হে আল্লাহ! আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচান। কিন্তু দু'আর পর আবারো তুমি গোনাহে লিপ্ত হয়ে গেলে, এর অর্থ এই নয় যে, দু'আ কবুল হয়নি। দুনিয়ার বিষয়ে তো বলা হয়েছিলো যে, যেই জিনিস বান্দা চেয়েছিলো

তা যেহেতু তার জন্য সমীচীন ছিলো না সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তা দেননি। বরং তার চেয়ে ভালো কোনো জিনিস দান করেছেন। কিন্তু এক ব্যক্তি এই দু'আ করছে যে, হে আল্লাহ! আমি গোনাহ থেকে বাঁচতে চাই। আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। তো এখানেও কি বলা যাবে যে, গোনাহ থেকে বাঁচা ভালো ছিলো না তাই এর চেয়ে ভালো কোনো জিনিস আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'আকারীকে দান করেছেন?

আরো তাওবার তাওফীক লাভ হয়

আসলকথা এই যে, গোনাহ থেকে বাঁচার দু'আ কবুল তো হয়েছে, তবে তার প্রভাব এই হবে যে, প্রথমত গোনাহ সংঘটিত হবে না ইনশাআল্লাহ। আর যদি গোনাহ হয়েও যায় তাহলে অবশ্যই তাওবার তাওফীক লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ। এটা হতে পারে না যে, তাওবার তাওফীক হবে না। এ জন্য দ্বীনের বিষয়ে দু'আ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। কখনো দু'আ বেকার হতে পারে না। বৃথা যেতে পারে না। আর যদি গোনাহের পর তাওবার তাওফীক লাভ হয় তখন ঐ তাওবা কতক সময় মানুষকে এতো উপরে নিয়ে যায় এবং তার মর্যাদা এতো বৃদ্ধি করে যে, কতক সময় গোনাহ না করার অবস্থায় এতো মর্যাদা হয় না এবং এতো উঁচু মাকামে পৌছতে পারে না। এ জন্য গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে সে তাওবা করলো, কেঁদে ফেললো, রোনাজারি করলো তখন আল্লাহ তা'আলা এর পরিণতিতে তার মর্যাদা আরো উঁচু করে দেন।

তখন আমি তোমাকে উঁচু মাকামে পৌছাবো

এ জন্য আমাদের হযরত ডা. ছাহেব (কু.সি.) বলতেন, দু'আ করা সত্ত্বেও যদি পা পিছলে যায় এবং সেই গোনাহ সংঘটিত হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কু-ধারণা করো না যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করেননি। আরে নাদান! তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কোথায় পৌছাতে চাই? গোনাহ হয়ে গেলে আমি তোমাকে তাওবার তাওফীক দিবো। অতঃপর আমার সাত্তার ও গাফফার নামের গুণে তোমার গোনাহকে ঢেকে দিবো এবং তোমাকে রহমতের পাত্র বানাবো। এ জন্য দু'আ করাকে কখনোই বৃথা মনে করবে না এবং বেকার মনে করবে না। বাস, এ দুটি কাজ করতে থাকো, হিম্মতের সাথে কাজ করো, হিম্মতকে কাজে লাগাও এবং দু'আ চাইতে থাকো। তারপর দেখো কি থেকে কি হয়, ইনশাআল্লাহ!

সমস্ত গোনাহ থেকে বাঁচার একটাই ব্যবস্থা

কুদৃষ্টি সম্পর্কে এ কয়টি কথা আমি নিবেদন করলাম। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন। শুধু কুদৃষ্টিই নয় দুনিয়াতে যতো গোনাহ আছে, সব গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে নিজের সাহসকে ব্যবহার করা, ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানো, বার বার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করা, আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হওয়া এবং দু'আ করা জরুরী। এই দুটি জিনিস জরুরী। এ দু'টির একটি দিয়ে কাজ হবে না। শুধু যদি দু'আ করতে থাকে আর সাহস করে কাজ না করে তাহলে এই জিনিস লাভ হবে না। যেমন এক ব্যক্তি পূর্বদিকে দৌড়াচ্ছে আর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে পশ্চিমে পৌছিয়ে দিন। আরে তুমি দৌড়াচ্ছো পূর্ব দিকে আর দু'আ করছো পশ্চিমে যাওয়ার! এ দু'আ কিভাবে কবুল হবে? কম পক্ষে প্রথমে নিজে পশ্চিম দিক হয়ে নাও। এরপর তোমার সাধ্যে যতটুকু আছে, তা করো। তারপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করো, হে আল্লাহ! আমাকে পশ্চিমে পৌছিয়ে দিন। তখন ঐ দু'আ কাজে আসবে। অন্যথায় ওটা দু'আই নয়। ওটা তো আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টা করা।

এজন্য আগে সেদিকে মুখ করুন, সাহস করুন, যতটুকু সম্ভব আগে বাড়ুন, এরপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। সমস্ত গোনাহ থেকে বাঁচার এটাই ব্যবস্থা। এটাই উপায়। এছাড়া আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই। সমস্ত ইবাদত অর্জন করার ব্যবস্থাপত্রও এই একটাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দৃষ্টি নত করা শিখুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- ২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত তাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী। ৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। ৬. নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৭. তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[১]

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫২-১৬৬, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা মু'মিনুন ১-৭

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! গত কয়েক জুমা ধরে সফলতা লাভকারী ঈমানদারদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা চলছিলো। তিনটি গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কুরআনে কারীম সফলকাম মুমিনের চতুর্থ গুণ এই বর্ণনা করেছে যে, তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, নিজেদের স্ত্রী ও দাসীদের ছাড়া। এদের দ্বারা যে ব্যক্তি নিজের জৈবিক চাহিদা পুরা করবে সে তিরস্কৃত হবে না। আর যে ব্যক্তি এদের ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় জৈবিক চাহিদা পুরা করতে চাইবে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং নিজের উপর অবিচারকারী।

গত জুমায় আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন এক দ্বীন দিয়েছেন যার মধ্যে আমাদের প্রত্যেক বৈধ চাহিদাকে প্রশমিত করার পাক পবিত্র পথ রয়েছে। মানুষের জৈবিক চাহিদা তার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। এই চাহিদা পূরণে আল্লাহ তা'আলা কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। তবে এ কথা বলেছেন যে, জৈবিক চাহিদা পূরণের বৈধ পথ হলো বিবাহ। এখন যদি মানুষ এ পথে তার চাহিদা পুরা করে তাহলে তা শুধু জায়েযই নয় বরং ছওয়াবের কারণ। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো পথ যদি তালাশ করে এবং বিবাহবর্হিভূত পন্থায় জৈবিক চাহিদা পুরা করতে চায় তাহলে এটা হবে সীমালঙ্ঘন, বিপর্যয়ের পথ, ফেৎনার পথ যা মানুষকে ধ্বংসে নিপতিত করবে।

পশ্চিমা সভ্যতার অভিশাপ

যে সব সমাজে বিবাহবর্হিভূত পন্থায় জৈবিক চাহিদা প্রশমনের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে তারা নৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে ধ্বংসের শিকার হয়েছে। আজ পশ্চিমা জগত ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার ডংকা দুনিয়ায় বাজছে। কিন্তু তারা জৈবিক চাহিদা প্রশমনের জন্য বিবাহবর্হিভূত পন্থাসমূহ অবলম্বনের চেষ্টা করেছে, ফলে এই জৈবিক চাহিদা তাদেরকে কুকুর, বিড়াল ও গাধার কাতারে নামিয়েছে। কতক সমাজের রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে যে, সেখানকার ৭০-৮০ শতাংশ অধিবাসী অবৈধ সন্তান। তাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। ফ্যামিলি সিস্টেমের সর্বনাশ ঘটেছে। বাপ-বেটা, মা-বেটি, ভাই-বোনের চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে চলছে। আজ পশ্চিমা জগতের

চিন্তাশীলরা চিৎকার করে বলছে, আমরা এ দিক থেকে নিজেদেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দিয়েছি। এটা এ কারণে হয়েছে যে, কুরআনে কারীম পথ বলে দিয়েছিলো যে, বিবাহের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা প্রশমিত করো। তারা এ পথ ছেড়ে অন্যান্য পথ অবলম্বন করেছে।

এ চাহিদা কোথাও গিয়ে থামবে না

আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা বানিয়েছেন যে, এই জৈবিক চাহিদা যদি জায়েয সীমার মধ্যে থাকে তাহলে তা মানব জাতির টিকে থাকার উপকরণ হয়। এর মাধ্যমে মানুষ অনেক উপকার লাভ করে। কিন্তু যখন এ চাহিদা বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করে যায় তখন তা এক অতৃপ্ত ক্ষুধা ও অপূরণীয় তৃষ্ণায় পরিণত হয়। কোনো মানুষ অবৈধ পন্থায় নিজের কামনা পুরা করলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, সে কোনো সীমায় গিয়ে থামতে পারে না। কোনো সীমারেখায় গিয়ে তার শান্তি ও স্থীরতা লাভ হয় না। সে আরো সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। কখনোই তার ক্ষুৎ-পিপাসা নীবারিত হয় না। ইস্তিসকার রোগী, যে হাজার বার পানি পান করলেও এবং মটকার পর মটকা পানি পেটে ভরলেও যার পিপাসা নিবারিত হয় না, একই অবস্থা হয় ঐ সময়ও যখন জৈবিক চাহিদা যৌক্তিক সীমা অতিক্রম করে যায়।

তারপরও প্রশমিত হয় না

আজ পশ্চিমা জগতে এ অবস্থাই দেখা দিয়েছে। একপন্থায় জৈবিক চাহিদা পুরা করতে আরম্ভ করেছে কিন্তু সে পন্থায় প্রশমন লাভ হয়নি, তখন আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। তারপরও পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ হয়নি, তখন আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। তারপরও পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ হয়নি। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিমা জগতে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যে, এখন কোনো নারীর সঙ্গে জৈবিক চাহিদা পুরা করার পর তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত কতক মানুষের জৈবিক চাহিদা প্রশমিত হয় না।

সীমা অতিক্রম করার পরিণতি

পশ্চিমা জগতের এক বিস্ময়কর দৃশ্য এই যে, তাদের সমাজ নারীদেরকে এতো সস্তা করেছে যে, পদে পদে তাদেরকে উপভোগ করার ও জৈবিক

চাহিদা পুরা করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কোনো প্রকার বাধা ও নিয়ম-নীতি তাদের নেই। কিন্তু যে সব দেশে নারী এতো সস্তা সে সব দেশেই ধর্ষণের ঘটনা সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি। এর কারণ এই যে, সম্মতির সাথে জৈবিক চাহিদা পুরা করার পরও যখন নফস পরিতৃপ্ত হয়নি, তখন চিন্তা জেগেছে যে, ধর্ষণের মধ্যে অধিক উপভোগ রয়েছে। ধর্ষণের সীমা এ পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, যেই নারীর সাথে জৈবিক চাহিদা পুরা করা হচ্ছে তাকে সেই মুহূর্তেই হত্যা না করা পর্যন্ত জৈবিক চাহিদা প্রশমিত হচ্ছে না। আজ ঐ সমাজে এমন ঘটনা এতো অসংখ্য পরিমাণে ঘটছে যে, সেখানের চিন্তাশীলরা এখন চিন্তা করছে, আমরা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের কোন অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছি। কুরআনে কারীমের বক্তব্য হলো, যে সব লোক বিবাহের এই বন্ধন থেকে সরে গিয়ে জৈবিক চাহিদা প্রশমনের পথ তালাশ করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী। সীমালঙ্ঘনের পর কোনো সীমাতেই আর তাদের স্থীরতা লাভ হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বিবাহের মাধ্যমে তোমাদের জন্য একটি জায়েয পন্থা করে দিয়েছি। সেই জায়েয পদ্ধতিতে ফযীলত রেখেছি। মানুষ যদি নিজের স্ত্রীর সাথে তার জৈবিক চাহিদা পুরা করে তা শুধু জায়েযই নয়, বরং তাতে সে ছওয়াবও পায়। এ ছাড়া অন্য সব পন্থা হারাম করেছেন।

প্রথম সীমানা, দৃষ্টির হেফাযত

হারাম পন্থা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন পাহারা বগেছেন, যেগুলো রক্ষা করা হলে মানুষ কখনোই জৈবিক বিপথগামিতার শিকার হবে না। তার মধ্যে সর্ব প্রথম নিজের চোখের হেফাজতের হুকুম দিয়েছে। রাসূলে কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

'মানুষের চোখ ইবলিসের তীরসমূহের মধ্যে থেকে একটি বিষাক্ত তীর।'[১]

অর্থাৎ, শয়তান মানুষকে এই চোখের মাধ্যমে ভুল পথে পরিচালিত করে। দৃষ্টিকে নিষিদ্ধ জায়গায় ফেলাতে চায়। এর ফলে মানুষের অন্তরে

---

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৩, কানযুল উম্মাল, খণ্ডঃ৫, পৃষ্ঠা-৪৮১, হাদীস নং ১৩০৬৮, ইদাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮

কুচিন্তা জন্মে। অবৈধ প্রেরণা সৃষ্টি হয়। যার ফলে পরিশেষে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

চক্ষু অবনত রাখুন

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

'আপনি ঈমানদারদের বলুন তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।'[১]

যেন এ কথা বলে দিয়েছেন যে, লজ্জাস্থানের হেফাজতের সর্বপ্রথম পদ্ধতি হলো, নিজের দৃষ্টির হেফাজত করা। দৃষ্টি যেন অপাত্রে না পড়ে। কোনো পরনারীর দিকে উপভোগের উদ্দেশ্যে দৃষ্টিপাত করা ব্যভিচারের প্রথম ধাপ। এক হাদীসে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ

'চোখও ব্যভিচার করে, আর তার ব্যভিচার হলো দেখা।'[২]

চোখ দ্বারা পরনারীকে উপভোগের উদ্দেশ্যে দেখা ব্যভিচারের প্রথম ধাপ। শরীয়ত এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

বর্তমানে চোখের হেফাজত করা কঠিন হয়ে পড়েছে

বর্তমান সমাজে কোথাও চোখ রাখার সুযোগ নেই, সর্বত্র ফেৎনা ছড়িয়ে আছে, অথচ হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, দৃষ্টিকে নত রাখো। চোখের অবৈধ ব্যবহার করো না। এ যুগের যুবকরা বলবে, দৃষ্টি নত রেখে চলা বড়ো কঠিন কাজ। কারণ কোথাও বোর্ডের উপর ছবি দৃষ্টি গোচর হচ্ছে এবং কোথাও পত্র পত্রিকায় ছবি দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। কোনো ম্যাগাজিন দেখলে তার মধ্যে ছবি রয়েছে, বাজার থেকে কোনো জিনিস ক্রয় করলে তার উপর ছবি রয়েছে,

---

১. সূরা নূর, আয়াত-৩০

২. মুখতাসারু ইরওয়াইল গালীল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭১, হাদীস নং ২৩৭০, গায়াতুল মুরাম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩২, হাদীস নং ১৮৪, বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ বিন হাম্বলের উল্লেখিত অনেক বর্ণনা দ্বারা এ হাদীসটি সমর্থিত হয়।

বেপর্দা নারী সব জায়গায় চলাফেরা করছে, এ জন্য চোখের হেফাজত করা তো বড়ো কঠিন কাজ।

চোখ কতো বড়ো নেয়ামত!

কিন্তু এই কঠিন কাজকে আয়ত্ব করার জন্য একটু চিন্তা করে দেখুন যে, যেই চোখ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন এটা কেমন জিনিস! এমন এক মেশিন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন, যা জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো পয়সা ছাড়া এবং কোনো পরিশ্রম ছাড়া কাজ করে যাচ্ছে। এমনভাবে কাজ করছে যে, যা ইচ্ছা তা এই চোখ দিয়ে দেখতে পারছেন। যে কোনো দৃশ্য দেখে উপভোগ করতে পারছেন। আল্লাহ তা'আলা যদি আপনাকে এই মেশিন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার তাওফীক দান করেন তখন বুঝতে পারবেন যে, ছোট্ট এই জায়গায় আল্লাহ তা'আলা কেমন কারখানা বসিয়ে দিয়েছেন। চক্ষু বিশেষজ্ঞরা কলেজ, ইউনির্ভাসিটি ও হাসপাতালে সারাজীবন দিয়ে দিলো কিন্তু এই রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হলো না যে, এটা কেমন কারখানা! এই কারখানার মধ্যে কতগুলো পর্দা রয়েছে, কতগুলো ঝালোড় রয়েছে! আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যে কতগুলো পর্দা ফিট করে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু এটা বিনামূল্যে পাওয়া গেছে, এর জন্য কোনো পয়সা খরচ করতে হয়নি, কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি, এ জন্য এই নেয়ামতের কোনো কদর নেই।

চোখের হেফাজতের জন্য পয়সা খরচ করতে প্রস্তুত

যেদিন দৃষ্টিশক্তি সামান্য এদিক সেদিক হয় সেদিন আপনার মধ্যে ভয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমার দৃষ্টি শক্তি আবার নষ্ট হয়ে না যায়! আল্লাহ না করুন, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেলে তখন মানুষ সারা দুনিয়ার সম্পদ খরচ করতে তৈরী হয়ে যাবে, আমার সব সম্পদ শেষ হয়ে গেলেও যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। আমার স্ত্রীকে যেন দেখতে পাই, আমার সন্তানকে যেন দেখতে পাই, আমার মা-বাপকে যেন দেখতে পাই। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, এর মধ্যে যদি সামান্য হেরফের হয়, বাঁকা দেখা যায়, চোখের সামনে সরিষার ফুল দেখা যায়, চোখের সামনে বৃত্ত দেখা যায়, তখন মানুষ ঘাবড়ে যায় এ কি হলো! তখন চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে দৌড়ায়। যে কোনোভাবে আমার চোখের সমস্যা দূর হোক। আমরা বিনামূল্যে এ সম্পদ

পেয়েছি। মৃত্যু পর্যন্ত তা কাজ করে যাচ্ছে। যার সার্ভিসিং-এরও প্রয়োজন পড়ে না এবং তেল দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।

বিস্ময়কর চোখের মণি

চোখের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা রেখেছেন। আমাকে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ বলেন, মানুষ যখন আলোর মধ্যে যায় তখন তার চোখের মণি বিস্তৃত হয়, আর যখন অন্ধকারে আসে তখন চোখের মণির স্নায়ুসমূহ সংকুচিত হয়। কারণ, অন্ধকারের মধ্যে ঠিকভাবে দেখার জন্য তা সংকুচিত হওয়া জরুরী। ঐ ডাক্তার বলেন যে, এই বিস্তৃত হওয়া ও সংকুচিত হওয়ার কাজে মানুষের চোখের শিরা সাত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে। এ কাজটি নিজে নিজে হয়ে যায়। এই কাজ যদি মানুষের হাতে ন্যস্ত করা হতো আর বলা হতো যে, যখন তুমি অন্ধকারের মধ্যে যাবে তখন এই বোতামটি চাপবে আর যখন আলোর মধ্যে যাবে তখন এই দ্বিতীয় বোতামটি চাপবে তাহলে তোমার চোখ ঠিকভাবে কাজ করবে। তাহলে ফল এই হতো যে, বিষয়টি কারো বুঝে আসতো, আর কারো বুঝে আসতো না। ভুল সময়ে বোতাম চাপতো, প্রয়োজনের অধিক বোতাম চাপতো, ফলে আল্লাহ জানেন সেই চোখের পরিণতি কি হতো! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা চোখে বসিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজন মতো চোখের মণি বিস্তৃত ও সংকুচিত হয়।

চোখের হেফাজতের খোদায়ী ব্যবস্থা

চোখ এতো সংবেদনশীল অঙ্গ যে, পুরো মানব দেহে এরচে' অধিক সংবেদনশীল অঙ্গ হয়তো আরেকটি নেই। আপনাদের অভিজ্ঞতা থাকবে, বালু বা মাটির সামান্য অংশ যা দেখাও যায় না যদি চোখের মধ্যে চলে যায় তাহলে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। ব্যথায় ব্যকুল হয়ে পড়ে। চোখ মানুষের মুখমণ্ডলের একদম সম্মুখে অবস্থিত। সম্মুখ দিকে থেকে মানুষের উপর আক্রমণ করা হলে বা কারো সাথে সংঘর্ষ হলে তখন সর্বপ্রথম মানুষের চেহারার উপর আঘাত লাগে। কিন্তু চোখের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুটি পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছেন, মাথার হাড্ডি ও গালের হাড্ডি। এই দুই হাড্ডির দূর্গের মাঝে মানুষের চোখকে স্থাপন করেছেন। যাতে করে চেহারায় কোনো আঘাত লাগলে হাড্ডি তা বহন করে আর চোখ সংরক্ষিত

থাকে। আল্লাহ তা'আলা চোখের উপর পাপড়ি বিশিষ্ট দুটি পাতা দিয়েছেন, যেন তার মধ্যে কোনো ধুলাবালি যেতে না পারে। মাটি বা ধুলাবালি উড়ে আসলে এই পাতা নিজের উপর তা নিয়ে নেয় এবং চোখকে রক্ষা করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে কেবল চোখে আঘাত লাগে, অন্যথায় চোখের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রেখেছেন। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চোখের নেয়ামতের হেফাজতেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

চোখের উপর শুধু দুটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

এসব ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করে রেখেছেন। এই ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো পয়সা চাননি যে, এতো টাকা দিলে তবে চোখ পাবে। বরং স্বয়ংক্রিয় এই মেশিন জন্মের সময় থেকে আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, এটা সরকারি মেশিন, যেখানে ইচ্ছা তুমি ব্যবহার করো শুধুমাত্র অল্প কয়টি জায়গায় একে ব্যবহার করবে না। চোখ দিয়ে আসমান দেখো, জমিন দেখো, নৈসর্গিক দৃশ্য দেখো, বাগান দেখো, ফল দেখো, ফুল দেখো, নদী দেখো, নালা দেখো, পাহাড় দেখো, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখো, আপনজনকে দেখো, বন্ধু-বান্ধবকে দেখো এবং স্বাদ উপভোগ করো। শুধু দুইটি জিনিস থেকে বেঁচে থাকবে এক কোন পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে দেখবে না আর কোন মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাবে না। শুধু এই দুটি নিষেধাজ্ঞা আপনার উপর আরোপ করা হয়েছে। বাকী সবকিছু দেখা হালাল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দেয়া এই সরকারি মেশিন ইচ্ছা মতো ব্যবহার করুন।

দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার সময় যদি শর্ত আরোপ করা হয়

এর পরও যদি মানুষ বলে, এ কাজ খুব কঠিন। বিশ্ব চরাচরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা দেখানোর জন্য এতো বড়ো আয়োজন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন, আল্লাহ না করুন কোনো সময় যদি আপনার চোখের পর্দা ফেটে যায়, কোনো দিন যদি আপনার চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, আর তখন যদি আপনাকে বলা হয় যে, দৃষ্টিশক্তি তো তুমি ফিরে পাবে কিন্তু শর্ত হলো এই এই জিনিস তুমি দেখবে না তখন মানুষ উত্তরে বলবে, সারাজীবন এগুলো না দেখার লিখিত চুক্তি নিন কিন্তু আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন।

এর মাধ্যমে আমি যেন আমার পরিবার-পরিজনকে দেখতে পারি, আমার ভাই-বোনকে দেখতে পারি, আমার বাড়ি দেখতে পারি, তখন তো লিখিত চুক্তি দিতে তৈরী হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে এখন তা ফিরিয়ে আনার কোনো পথ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিনা চুক্তিতে আপনাকে এই নেয়ামত দিয়েছেন। এই নেয়ামত দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, এই দৃষ্টিশক্তি যেই জায়গায় ব্যবহারের জন্য দিলাম শুধু সেখানে ব্যবহার করবে।

দৃষ্টিপাত সওয়াবের কারণ

যদি শুধু এসব জায়গায় ব্যবহার করো তাহলে তোমার আমলনামায় নেকীর স্তুপ হতে থাকবে। আখেরাতে পুরস্কার ও ছওয়াবের ভাণ্ডার জমা হতে থাকবে। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের মা-বাবাকে একবার ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে তাহলে একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব লাভ হয়।[১]

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন স্বামী ঘরে প্রবেশ করলো এবং নিজের স্ত্রীর দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখলো এবং স্ত্রী তার স্বামীর দিকে ভালোবাসার নজরে তাকালো তখন আল্লাহ তা'আলা উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান।[২]

এবার লক্ষ্য করুন! সঠিক জায়গায় দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার করলে আল্লাহ তা'আলা নেকীর স্তুপ দান করেন।

দৃষ্টির হেফাজতের একটি পদ্ধতি

আল্লাহ না করুন, মানুষ যদি নিষিদ্ধ জায়গায় দৃষ্টিপাত করে এবং পরনারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায়, সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি তীর।

বর্তমানে আমরা বলি, এ যুগে চোখ বাঁচানো খুব কঠিন। চেষ্টা করেও চোখ রক্ষা করা যায় না। মানুষ যাবে কোথায়? বাঁচবে কিভাবে? এ থেকে

---

১. শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩৬৫, হাদীস নং ১১৭৬, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪৭৭, হাদীস নং ৪৫৫৩৫, আদদুররুল মানসূর খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৪

২. কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৭৬, হাদীস নং ৪৪৪৩৭, জামেউল আহাদীস, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭৯, হাদীস নং ৬২৯৬

বাঁচার উপায় হলো, আপনি এ কথা চিন্তা করুন যে, আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি চলে যায় আর কেউ আমাকে বলে, তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে তবে শর্ত হলো, কোনো পরনারীকে দেখতে পারবে না। এই ওয়াদা যদি করতে পারো, পোক্ত অঙ্গীকার করতে পারো, লিখিত দাও, তাহলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, নইলে পাবে না। বলুন! তখন এই ওয়াদা করার জন্য এবং লিখিত দেওয়ার জন্য আপনি সম্মত হবেন কি না? এমন কোন মানুষ আছে, যে এই ওয়াদা করার জন্য এবং লিখিত দেওয়ার জন্য রাজী হবে না। এমন কোন মানুষ আছে, যে বলবে, আমি যদি পরনারীকে দেখতে না পারি তাহলে আমার এই দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন নেই। কোনো মানুষ কি এমন বলবে, কখনই বলবে না। তখন যদি আপনি এই ওয়াদা করতে এবং লিখিত দিতে তৈরী হন, তাহলে যে মেহেরবান মালিক কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়া আগে থেকেই আপনাকে ঐ দৃষ্টিশক্তি দিয়ে রেখেছেন, তারপর তিনি বলছেন যে, দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার করো না তাহলে তা আপনার মুশকিল মনে হয় কেন! কেন পেরেশানী লাগে! যখন কুদৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তখন চিন্তা করুন যে, আমি কুদৃষ্টি করলে আমার দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে।

সাহসিকতার সাথে কাজ করুন

বাস্তবতা এই যে, মানুষ যখন নিজের দৃষ্টিশক্তিকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করে, তখন বাস্তবে তা দৃষ্টিশক্তি নয়, তা তো অন্ধত্ব, তার দৃষ্টিশক্তি তো হারিয়ে গেছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে থাকতো সে আখেরাতে অন্ধ বরং অধিকতর পথহারা থাকবে।'[১]

এজন্য মানুষ অঙ্গীকার করবে, আমি দৃষ্টিশক্তিকে নাজায়েয জায়গায় ব্যবহার করবো না। আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিম্মত ও সাহসিকতার মধ্যে এবং অঙ্গীকার ও সংকল্পের মধ্যে বিরাট শক্তি রেখেছেন। মানুষের সাহসিকতা রাবারের মতো। ইচ্ছা মতো তা টেনে লম্বা করা যায়। মানুষ যখন সাহসকে ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বরকত ও উন্নতি দান করেন।

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত-৭২

সারকথা

মোটকথা, দৃষ্টিশক্তির উপর দুটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। একটি হলো পরনারীকে কামনার দৃষ্টিতে দেখা, আরেকটি হলো কোনো মুসলিমকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা। কোনো মুসলমানের প্রতি তাচিছল্যের দৃষ্টিতে তাকানোও চোখের গোনাহ। এই দুই গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিলে ইনশাআল্লাহ জীবন পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। চিন্তা ও উদ্দীপনা পবিত্র হবে। আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন। আখেরাতের প্রস্তুতি হবে। আর যদি আল্লাহর দেয়া এ মেশিনকে বল্গাহীনভাবে ব্যবহার করা হয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তাহলে এই চোখই আপনাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলার আযাবের হকদার বানাবে। এ জন্য চোখের হেফাজতের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে চোখের হেফাজত করার তাওফীক দান করুন। আমীন। আলোচনা এখনো রয়ে গেছে কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেছে, বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আগামী জুমায় আলোচনা করবো।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

চোখ অনেক বড়ো নেয়ামত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿۲﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿۴﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿۵﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿۶﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿۷﴾

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ- ২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত তাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী। ৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। ৬. নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৭. তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[১]

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৬৮-১৮২, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত-১-৭

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! গত দুই জুমা ধরে সূরা মু'মিনূনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতের আলোচনা চলছে। এসব আয়াতে ঈমানদারদের সফলতার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন তার মধ্যে একটি গুণ হলো

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ

যার সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের মধ্যে জৈবিক চাহিদা রেখেছেন। ইসলাম সহজাত ধর্ম হেতু তাতে সেই জৈবিক চাহিদা প্রশমনের জন্য আল্লাহ তা'আলা হালাল পন্থা নির্ধারণ করেছেন। তা হলো বিবাহের পন্থা। বিবাহের মাধ্যমে মানুষ নিজের এই সহজাত চাহিদা পুরা করবে। তাহলে তা শুধু জায়েযই নয় বরং ছওয়াবের কারণ। কিন্তু বিবাহের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অবলম্বনকারী সীমালঙ্ঘনকারী বলে পরিগনিত। কুরআনে কারীম অতি সংক্ষিপ্ত 'সীমালঙ্ঘনকারী' শব্দ ব্যবহার করলেও তার অর্থের মধ্যে অনেক খারাবী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিবাহের পথ ছাড়া অন্য পথে নিজের জৈবিক চাহিদা প্রশমিত করতে চায় সে সমাজের মধ্যে বিপর্যয় ও বিকৃতির বিস্তার ঘটায়। এটা এই আয়াতের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যার সারকথা।

প্রথম হুকুমঃ চোখের হেফাজত

শরীয়ত অবৈধ জৈবিক চাহিদা পুরা করার পথ যেমন বন্ধ করেছে এবং তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে তেমনি তার জন্য এমন অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করেছে, যেই পরিবেশে এই হুকুমের উপর আমল করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়। একদিকে আল্লাহ তা'আলা বিবাহের পথকে অধিকতর সহজ করে দিয়েছেন, কিন্তু আমরা সামাজিকভাবে বিভিন্ন প্রথা প্রচলন ও বিধিনিষেধ দ্বারা বিবাহকে জড়িয়ে ফেলে নিজেদের জন্য এটাকে কষ্টসাধ্য বানিয়েছি। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা এমনসব দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, যা মানুষকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম চোখের হেফাজতের হুকুম দিয়েছেন। নিজের চোখকে পাক রাখো, নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টিপাত করো না। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مَّسْمُوْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

'দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে থেকে একটি তীর।'[১]

অনেক সময় একটি মাত্র দৃষ্টিপাত মানুষের আত্মাকে বরবাদ করে দেয়। তারমধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অনেক সময় একটি মাত্র দৃষ্টিপাতের ফলে মানুষের চিন্তা, কল্পনা, ভাবনা, আবেগ-উদ্দীপনা এমনকি তার কর্মকাণ্ডকেও নষ্ট করে দেয়। এজন্য শরীয়ত প্রথম পাহারা বগেছে মানুষের দৃষ্টির উপর।

চোখ অনেক বড়ো নেয়ামত

এই চোখ আল্লাহ তা'আলার এতো বড়ো নেয়ামত যে, কোনো মানুষ যদি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করেও সে এই নেয়ামত লাভ করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই নেয়ামত বিনামূল্যে এবং বিনা বিনিময়ে দান করেছেন। এজন্য এই নেয়ামতের কদর হয় না। জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এই নেয়ামত আপনার সাথে রয়েছে। এটি এতো নাজুক অঙ্গ যে, এর মধ্যে একটা চুল চলে গেলে বা একটু আঁচড় লাগলে তা বেকার হয়ে যায়। কিন্তু এতো নাজুক মেশিন পুরো জীবন মানুষকে সঙ্গ দেয়। এমনভাবে সঙ্গ দেয় যে, তার সার্ভিসিং-এরও প্রয়োজন পড়ে না, পেট্রোল দিতে হয় না, তেল দিতে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার অধীনে তার সার্ভিসিং করেন, তার খাদ্যও পৌছান। সুতরাং ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনারা যেই গ্রাস গ্রহণ করেন তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দেহের প্রত্যেক অংশে খাদ্য পৌছিয়ে থাকেন। একই ভাবে চোখকেও পৌছিয়ে থাকেন।

চোখও ব্যভিচার করে

এই চোখ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, যাতে আপনি তা দ্বারা দৃশ্য উপভোগ করেন। নিজের কাজ সম্পাদন করেন। এই চোখের উপর শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিস না দেখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। তা হলো কোনো পরনারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে দেখবে না। এটাকে গোনাহের কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটাকে চোখের যেনা বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ

---

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৩, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮১, হাদীস নং ১৩০৬৮, ইদাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮

'দুই চোখে যেনা করে আর তার যেনা হলো দেখা।'[১]

উপভোগের উদ্দেশ্যে কামনার দৃষ্টিতে কোনো পরনারীর দিকে দেখা কুদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। শরীয়ত এটাকে নাজায়েয ও হারাম সাব্যস্ত করেছে। আপনার দৃষ্টি যখন সংরক্ষিত থাকবে তখন আপনার চিন্তা ও কল্পনাও পবিত্র হবে এবং আপনার আবেগ-অনুভূতিও পবিত্র হবে, ফলে আপনার আমলও পবিত্র হবে।

লজ্জাস্থানের হেফাজত চোখের হেফাজতের উপর নির্ভরশীল

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ......

'হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টিকে নত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[২]

এর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, লজ্জাস্থানের হেফাজতের পথের সূচনা হলো চোখের হেফাজত করা। চোখ যখন হেফাজতে থাকবে তখন লজ্জাস্থানও হেফাজতে থাকবে। পরিণতিতে তোমরা ব্যভিচার থেকে হেফাজতে থাকবে। এটা কোন মোল্লা-মৌলভীর নির্দেশ নয়। এটা কোনো পশ্চাদপদ ধার্মিক সন্ত্রাসীর নির্দেশ নয়, এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, কুরআনে কারীমে যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

দুর্গ অবরোধ করা

যতোদিন পর্যন্ত মুসলিমরা এই বিধানের উপর আমল করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সকল ফেৎনা ফাসাদ থেকে হেফাজত করেছেন। আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী ছাহেব রহ.

---

১. মুখতাসারু ইরওয়াইল গালীল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭১, হাদীস নং ২৩৭০, গায়াতুল মুরাম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩২, হাদীস নং ১৮৪, বুখারী মুসলিম ও আহমদ বিন হাম্বলের উল্লেখিত অনেক বর্ণনা দ্বারা এ হাদীস সমর্থিত হয়।

২. সূরা নূর, আয়াত-৩০

থেকে এ ঘটনাটি শুনেছিলাম। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর পবিত্র যুগে হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি., যিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম উঁচু স্তরের সাহাবী এবং শাম বিজয়ী। শামের বিরাট অঞ্চলের বিজয়মুকুট আল্লাহ তা'আলা তার মস্তকে স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি শামের গভর্ণর ছিলেন। একবার তিনি অমুসলিমদের দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গ অবরোধ করেন। অবরোধ কাল দীর্ঘ হয়। দুর্গ জয় হচ্ছিলো না। অবশেষে যখন দুর্গের লোকেরা দেখলো মুসলিমরা খুব দৃঢ়তার সাথে অবরোধ করে আছে তখন তারা একটা ষড়যন্ত্র করলো। তারা বললো, আমরা আপনাদের জন্য দুর্গের দরজা খুলে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের সৈন্য সহ শহরে প্রবেশ করুন। তাদের ষড়যন্ত্র এই ছিলো যে, শহরের ফটক যেদিকে খুলতো সেদিকে দীর্ঘ বাজার ছিলো, যার উভয়দিকে ছিলো দোকান। সেই বাজারটি শাহী মহলে গিয়ে শেষ হতো। তারা বাজারের উভয় দিকে প্রত্যেকটা দোকানে নারীদেরকে সাজিয়ে একজন করে বসিয়ে দেয়। নারীদেরকে গুরুত্বের সাথে বলে দেয় যে, এই মুজাহিদরা প্রবেশ করার পর তোমাদেরকে উত্তপ্ত করতে চাইলে, তোমাদের সাথে কোনো কিছু করতে চাইলে, তোমরা অস্বীকার করবে না, বাধা দিবে না। তারা চিন্তা করেছিলো এরা আরব ভূমি থেকে এসেছে। কয়েক মাস ধরে বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করছে। ভিতরে প্রবেশ করার পর আকস্মিকভাবে যখন তারা সুন্দর ও সজ্জিত নারীদেরকে দেখতে পাবে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হবে যখন তারা এদের নিয়ে ব্যস্ত হবে তখন আমরা পিছন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবো।

মুমিনের ফেরাসাত সম্পর্কে সতর্ক থাকো

পরিকল্পনা তৈরী করে দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.-এর নিকট এই পয়গাম পাঠায় যে, আমরা পরাজয় স্বীকার করছি এবং আপনাদের জন্য আমরা দুর্গের ফটক খুলে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের সৈন্য নিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। আল্লাহ তা'আলা যখন ঈমান দান করেন তখন ঈমানী ফেরাসাত তথা অন্তর্দৃষ্টিও দান করেন। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

'তোমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাকো, কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার নূর দিয়ে দেখে।'[১]

এই সংবাদ পেয়ে হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.-এর মাথায় ধাক্কা লাগলো। তিনি চিন্তা করলেন, এতো দিন পর্যন্ত এরা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলো, দরজা খুলছিলো না, হঠাৎ এখন কি হলো যে, তারা দরজা খুলে দেওয়ার প্রস্তাব করছে। সৈন্যদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছে। অবশ্যই এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে।

পুরো সেনাবাহিনী বাজার দিয়ে অতিক্রম করলো

তিনি পুরো সেনাবাহিনীকে একত্রিত করলেন। তাদের সামনে খুৎবা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলার শোকর দুশমন অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তারা আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার দাওয়াত দিচ্ছে। আপনারা অবশ্যই ভিতরে প্রবেশ করবেন। তবে আমি আপনাদের সামনে কুরআনে কারীমের একটি আয়াত পাঠ করছি, আপনারা এই আয়াত পাঠ করতে করতে এবং তার উপর আমল করতে করতে প্রবেশ করবেন। তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

'মুমিনদেরকে বলে দিন! তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এটা তাদের জন্য পবিত্রতার রাস্তা।'[২]

সুতরাং সেনাবাহিনী নত চোখে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করলো, এ অবস্থাতেই পুরো বাজার পার হয়ে গেলো এবং শাহী মহল পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। কেউ ডান-বামে চোখ তুলে তাকালো না যে, কি ফেৎনা এই দোকানগুলোতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে?

এই দৃশ্য দেখে তারা ইসলাম গ্রহণ করলো

শহরের অধিবাসীরা এ দৃশ্য দেখে পরস্পরে বলতে লাগলো, এরা কেমনতর মানুষ! কোনো সৈন্য যখন বিজয়ী হয়ে শহরে প্রবেশ করে তখন

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৫২

২. সূরা নূর, আয়াত-৩০

বুক টান করে প্রবেশ করে, স্বাধীন ভাব নিয়ে প্রবেশ করে, লুট করে, সতিত্ব হরণ করে, কিন্তু এই বিরল বিস্ময়কর সৈন্য বাহিনী এমনভাবে প্রবেশ করলো! তাদের সেনাপতি বলেছিলো দৃষ্টি নত রাখবে, তাদের সকলের দৃষ্টি নত ছিলো। এমতাবস্থায় পুরো সেনাবাহিনী বাজার পার হয়ে গেলো, শহরের অসংখ্য মানুষ শুধু এই দৃশ্য দেখে মুসলিম হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামের তাওফীক দান করলেন।

ইসলাম কি তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে?

মানুষ বলে, ইসলাম তাওবারীর জোরে বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাহাবায়ে কেরামের এই কীর্তির ফলে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। তাদের আমলের ফলে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। মোটকথা, দৃষ্টি নত রাখার এই আমল তাদেরকে শুধু দৈহিক, মানসিক ও জৈবিক ফেৎনা থেকে রক্ষা করেনি বরং এর দ্বারা শত্রুর ষড়যন্ত্র এবং তাদের চক্রান্ত থেকেও হেফাজত করেছে।

শয়তানের আক্রমণ চারদিক থেকে

আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মত (কু.সি.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন, তাকে বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহ তা'আলার সামনে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলেছিলো, আপনি যখন আমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন এবং আমার এই দু'আও কবুল করেছেন যে, আমি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবো তাই আমি সংকল্প করছি, যেই আদমের কারণে আমাকে জান্নাত থেকে বের হতে হলো সেই আদমের সন্তানদেরকে আমি এভাবে গোমরাহ করবো-

لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ

'আমি তাদেরকে সামনে থেকে আক্রমণ করবো, পিছন থেকে আক্রমণ করবো, বাম দিক থেকে আক্রমণ করবো, ডান দিকে থেকে আক্রমণ করবো, চর্তুদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবো।'[১]

তাই শয়তান চর্তুদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. বলেন, দুটি দিকের কথা বলতে সে ভুলে যায়, এক উপর দিক, আরেক

---

১. সূরা আরাফ, আয়াত-১৭

নিচের দিক। শয়তান চর্তুদিক থেকে তো আক্রমণ করবে, তাই তার থেকে বাঁচার রাস্তা হয় উপর দিক থেকে, না হয় নিচের দিক থেকে। উপর দিক দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক কায়েম করা। তার সাহায্য চাওয়া, তার শরণাপন্ন হওয়া, তার অভিমুখী হওয়া এবং বলা যে, হে আল্লাহ! এই শয়তান আমাকে চর্তুদিকে থেকে ঘিরে রেখেছে, আপনি দয়া ও অনুগ্রহ করে আমাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন। উপরের রাস্তা শয়তানের আক্রমণ থেকে এ জন্য সংরক্ষিত যে, তা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক করার রাস্তা।

নিচের পথ সংরক্ষিত

আর নিচের পথ শয়তানের আক্রমণ থেকে এ জন্য সংরক্ষিত যে, আপনারা দৃষ্টি নত রেখে চলবেন, ডান বাম আগে পিছে এই চারদিক থেকে তো শয়তানের আক্রমণ হতে পারে, কিন্তু নিচের দিক শয়তানের আক্রমণ থেকে সংরক্ষিত। যখন আপনারা দৃষ্টি নত রেখে চলবেন তখন আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে হেফাজত করবেন। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন যে, নিজেদের দৃষ্টিকে নত রেখে চলো যাতে ফেৎনার শিকার না হও। যাই হোক, দৃষ্টির ফেৎনা মানুষের অত্মিক চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলীকে ধ্বংস করে। আফসোস! আজ আমাদের সমাজে এই মুসিবত এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, আল্লাহর খুব কম বান্দাই এর থেকে আত্মরক্ষা করছে। এক সমস্যা তো এই যে, চর্তুদিকে দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও দৃষ্টি হরণকারী উপকরণ ছড়িয়ে আছে। সর্বত্র দৃষ্টিপাতের দাওয়াত লাভ হচ্ছে। এর কারণ এই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই সমাজে পর্দা ছিলো, হায়া ছিলো, সংকোচ ছিলো, মানবতার উচ্চ গুণাবলী তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো, কিন্তু আজকের সমাজে পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নগ্নতার প্রতিযোগিতা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যে কারণে কোনো দিকেই দৃষ্টির আশ্রয় নেই।

আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিতির চিন্তা

দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, সাহস দুর্বল হয়ে গেছে। একজন ঈমানদারের নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার যেই যোগ্যতা থাকা উচিত এখন তা দুর্বল হয়ে গেছে। একজন ঈমানদার সবসময় আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত

হওয়ার বিষয়টি সামনে রাখবে, সেই চিন্তা এখন দুর্বল হয়ে গেছে। যে কারণে চর্তুদিকে কুদৃষ্টির ফেৎনা ছড়িয়ে আছে। তবে মনে রাখবেন! শরীয়তের যে হুকুমের উপর আমল করা যে সময় কঠিন হয়ে পড়ে তখন সেই পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ হয়ে থাকে এবং সে হুকুম পালন করলে সেই পরিমাণে পুরস্কার ও ছওয়াবও লাভ হয়ে থাকে।

আকস্মাৎ দৃষ্টি মাফ

আরেকটি বিষয় হলো, ইচ্ছা ছাড়া এরাদা ছাড়া হঠাৎ কোনো পরনারীর উপর দৃষ্টি পড়লে সেটা আল্লাহর নিকট মাফ, এতে কোনো গোনাহ হয় না। তবে আল্লাহর হুকুম হলো, অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পড়লে অবিলম্বে তা সরিয়ে ফেলবে। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَكَ النَّظْرَةُ الْأُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ

'প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য অর্থাৎ, এতে গোনাহ হবে না। কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করো বা প্রথম দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করো তাহলে গোনাহ হবে এবং আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবে।'[১]

তাই কখনো অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পড়ে গেলে একথা চিন্তা করে অবিলম্বে দৃষ্টি সরিয়ে নিবে যে, এটা আমার আল্লাহর হুকুম। আরো চিন্তা করবে যে, যখন আমি চোখের অবৈধ ব্যবহার করছি তখন যদি আল্লাহ তা'আলা আমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন আর যদি আমাকে বলা হয়, তুমি কুদৃষ্টি না ছাড়া পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তি ফেরত পাবে না, তখন তো আমি হাজারবার কুদৃষ্টি ছাড়ার জন্য তৈরী হবো। তখন যদি আমি এই গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য তৈরী হতে পারি তাহলে আজও এ কথা চিন্তা করে তৈরী হতে পারি যে, আমার মালিক আমাকে এই গোনাহ করতে নিষেধ করেছেন।

এটা নেকমহারামী

মানুষ চিন্তা করবে যে, যেই দয়ালু মূল্য ছাড়া, চাওয়া ছাড়া, বিনিময় ছাড়া এই নেয়ামত আমাকে দিয়েছেন তার মর্জির খেলাফ একে ব্যবহার করা

---

১. জামেউল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫০১৪, হাদীস নং ৪৯৫৪, শারহ মাআনিল আসার, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫, হাদীস নং ৩৯৬৮, শু'য়াবুল ঈমান বাইহাকী কৃত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৫, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৭০১, কোনো কোনো বর্ণনায় لَيْسَتْ لَكَ الْأَخِرَةُ শব্দ এসেছে।

বড়োই নির্লজ্জতার ব্যাপার! বড়োই নিমকহারামীর বিষয়! এই নিমকহারামী থেকে বাঁচার জন্য আমি এই গোনাহ ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর সাহস করে দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিম্মতের মধ্যে বিরাট শক্তি দান করেছেন। মানুষ সাহসের বলে বড়ো থেকে বড়ো পাহাড়কে স্থানান্তরিত করে। এজন্য এই সাহসকে ব্যবহার করো, দৃষ্টি সরিয়ে নাও। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে নাজায়েয জায়গা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমানের এমন রূহানী স্বাদ দান করবেন যার সামনে কুদৃষ্টির স্বাদ, তুচ্ছাতি তুচ্ছ, এই স্বাদের কোনোই মূল্য নেই।

আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন

এছাড়া আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, সাহসহীন, সংকল্পহীন, হে আল্লাহ! আপনি যেহেতু এ কাজকে গোনাহ সাব্যস্ত করেছেন তাই অনুগ্রহ করে আমাকে হিম্মত দান করুন, সংকল্প দান করুন। আমাকে আপনার এই হুকুমের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমি যেন আপনার দেওয়া এই নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। নাজায়েয ব্যবহার থেকে বাঁচতে পারি। বিশেষ করে যখন মানুষ ঘর থেকে বাইরে বের হবে, তখন যেহেতু সে ফেৎনার পরিবেশের দিকে বের হচ্ছে, কোন ফেৎনা সামনে চলে আসে জানা নেই, এজন্য ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার করছি আপনার দেওয়া এই নেয়ামতকে নাজায়েয কাজে ব্যবহার করবো না, কিন্তু আমার নিজের উপর আস্থা নেই, আপনার সাহায্য শামেলে হাল না হলে আমি বাঁচতে পারবো না। তাই হে আল্লাহ! আপনি মেহেরবানী করে আমাকে এই ফেৎনা থেকে রক্ষা করুন। এভাবে দু'আ করে ঘর থেকে বের হোন, হিম্মতকে কাজে লাগান। কখনো ভুল হয়ে গেলে অবিলম্বে তাওবা ইস্তেগফার করুন। কোনো মানুষ যদি এই কাজ করতে থাকে তাহলে আল্লাহর রহমতে আশা আছে, ইনশাআল্লাহ সে এই ফেৎনা থেকে বাঁচতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাকেও এবং আপনাদেরকেও এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

গোনাহ ছাড়ুন, আবেদ হতে পারবেন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ، وَ اَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيْتُ الْقَلْبَ

'হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকো তাহলে সমস্ত মানুষের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার হতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা বণ্টন করেছেন তার উপর রাজি থাকো তাহলে সবার চেয়ে ধনী হতে পারবে। তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করো তাহলে মুসলিম হতে পারবে। তুমি নিজর জন্য যা পছন্দ করো তা মানুষের জন্য পছন্দ করো। বেশি হেসো না, অধিক হাসি আত্মাকে মেরে ফেলে।'

হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেছেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ এনে বললেন, আমি পাঁচটি কথা

---

* ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৮৮-১০২, আসরের নামাজের পর বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

বলবো, কে আছে যে এই পাঁচটি বিষয় স্মরণ রাখবে এবং তার উপর আমল করবে এবং অন্যদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দিবে এবং তাদের দ্বারাও এগুলোর উপর আমল করাবে? হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি বললাম, আমি এই পাঁচটি বিষয় মুখস্থ রাখবো এবং আমল করার চেষ্টা করবো এবং অন্যের নিকটও পৌছাবো। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুলে গুনে এ পাঁচটি কথা বললেন। এগুলোর প্রত্যেকটি কথা 'জাওয়ামেউল কালিমে'র অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এর প্রত্যেকটি বাক্য ও প্রত্যেকটি শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। আল্লাহ তা'আলা যদি এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করেন তাহলে আমাদের সবকিছু শুধরে যাবে।

ইবাদতগুজার কিভাবে হবে?

প্রথম বাক্য এই ইরশাদ করেন,

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

অর্থাৎ, তুমি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকো তাহলে সমস্ত মানুষের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার হতে পারবে।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যটির মাধ্যমে এই হাকীকতের উপর আলোকপাত করেন যে, ফরয ও ওয়াজিব হুকুম পালনের পর একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেকে নিজে নাজায়েয ও হারাম কাজ থেকে বাঁচানো। নফল ইবাদতের পালা এর পরে। কোনো ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে নিজেকে নিজে গোনাহ থেকে বাঁচায় তাহলে সে সবচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার বলে পরিগণিত হবে, যদিও সে অধিক নফল পড়ে না।

নফল ইবাদত মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যের মাধ্যমে একটি বড়ো ধরনের ভুল বুঝাবুঝি দূর করেছেন। তা হলো আমরা অনেক সময় নফল ইবাদতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যেমন নফল নামায পড়া, যিকির করা, মুনাজাত করা, তিলাওয়াত করা ইত্যাদি। অথচ এগুলোর কোনো একটিও ফরয নয়। নফল নামায হোক, নফল রোযা হোক, নফল দান হোক এগুলোকে আমরা অনেক গুরুত্ব দিয়ে রেখেছি, কিন্তু গোনাহ থেকে বাঁচার

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৭৪৮

এবং গোনাহ পরিত্যাগ করার গুরুত্ব নেই। মনে রাখবেন! এসমস্ত নফল ইবাদত মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না, যদি না মানুষ গোনাহের কাজ ত্যাগ করে। এখন রমাযান মাস চলছে, মুবারক এ মাসে মানুষের নফল ইবাদতের দিকে মনযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সময়ের তুলনায় অধিক নফল নামায পড়া, তিলাওয়াত করা, যিকির করা এদিকে মনযোগ আকৃষ্ট হয়। এগুলোও ভালো কাজ। কিন্তু কেউ একথা চিন্তা করে না যে, আমি নফল ইবাদত তো করছি কিন্তু সাথে গোনাহও তো করছি। আল্লাহ তা'আলা যেসব জিনিসকে হারাম ও নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোতেও লিপ্ত হচ্ছি। উভয়টাকে তুলনা করলে দেখা যাবে, নফল ইবাদত করার দ্বারা যে ফায়দা হচ্ছিলো গোনাহের কারণে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গোনাহের দৃষ্টান্ত

এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন আপনি আপনার কামরার এয়ারকন্ডিশনার চালু করে দিয়েছেন, কিন্তু দরজা জানালা খোলা রয়েছে, যার ফলে একদিক থেকে ঠাণ্ডা আসছে আর অপরদিক দিয়ে তা বের হয়ে যাচ্ছে। বাইরের তাপও ভিতরে আসছে। যার ফলে কামরা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। এয়ার কন্ডিশন চালানোর কোনো উপকার পাওয়া যাচ্ছে না। এমনিভাবে আপনি নফলের এয়ার কন্ডিশন তো লাগিয়েছেন, যিকির ও তিলাওয়াতের এয়ার কন্ডিশন তো লাগিয়েছেন, কিন্তু গোনাহের জানালা চর্তুদিক থেকে খোলা রয়েছে। ফলাফল এই হচ্ছে যে, এসব ইবাদত দ্বারা যেই লাভ হওয়ার কথা ছিলো তা হচ্ছে না।

হালাল খাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করুন

রমাযান মাসে তারাবীহের নামায পড়ার প্রতি আমরা কতো গুরুত্ব দিচ্ছি। যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ত্রুটি করে তারা পর্যন্ত নির্দ্বিধায় রমাযানে তারাবীহের লম্বা লম্বা বিশ রাকাত নামাযে দাঁড়ায় এবং রাতে সাহরীর সময় তাহাজ্জুদও পড়ে, তাই নফল ইবাদত তো হচ্ছে, কিন্তু একই ব্যক্তি একথা চিন্তা করে না যে, সন্ধ্যায় ইফতার করার সময় যখন দস্তরখানে বসবে তখন খানা হালাল হবে না হারাম। সারাদিন রোযা রাখলো, রাতের বেলা তারাবীহ পড়লো এবং তাহাজ্জুদ পড়লো, কিন্তু মুখে যে লোকমা যাচ্ছে তা হালাল না হারাম এ চিন্তা নেই। এই হাদীসের মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, আসল চিন্তা এটা করো যে, তোমার দ্বারা কোনো গোনাহ যেন সংঘটিত না হয়। এটা যদি করো তাহলে নফল ইবাদত যদি তুমি বেশি নাও করো তাহলেও তোমাকে সবচে' বেশি ইবাদতগুজার বলে লেখা হবে।

উভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে?

বিষয়টি আরেকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে বুঝুন। মনে করুন এক ব্যক্তি নফল ইবাদত করে, যিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল থাকে এবং সবসময় তাসবীহ্-ও চলতে থাকে, কিন্তু একই সাথে সে গোনাহও করতে থাকে। অপর এক ব্যক্তি সারাজীবনে একটিও নফল ইবাদত করেনি; কিন্তু সারাজীবনে একটি গোনাহও সে করেনি। বলুন এই দু'জনের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে? সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট, যে গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে জীবন কাটালো। যদিও নফল ইবাদতে তার বিশেষ কোনো অংশ নেই। এ ব্যক্তিকে আখেরাতে প্রশ্ন করা হবে না যে, তুমি নফল ইবাদত করোনি কেন? কারণ নফল ইবাদত ফরয নয়। একারণে ইনশাআল্লাহ সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে প্রথম ব্যক্তি নফল ইবাদতে খুব মশগুল ছিলো কিন্তু একই সাথে সে গোনাহও করেছে, আর গোনাহ এমন জিনিস আখেরাতে যার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

'আর যে ব্যক্তি যাররা পরিমাণ কোনো গোনাহের কাজ করেছে, সে তা দেখতে পাবে।'[১]

এজন্য তার কাছে প্রশ্ন করা হবে, তুমি নফল ইবাদত তো করেছো, কিন্তু এই গোনাহের কাজও তো করেছো। ফলে এই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

দুই মহিলার ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে দুই মহিলা সম্পর্কে আলোচনা হলো। এক মহিলা তো খুব ইবাদতে মশগুল থাকে, খুব নফল নামায পড়ে কিন্তু তার মুখ খারাপ। মুখ দিয়ে

---

১. সূরা যিলযাল, আয়াত-৮

মানুষকে বিশেষ করে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। আরেক মহিলা শুধু ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত করে, নফল ইবাদত খুব বেশি করে না, কিন্তু তার ভাষা মধুর। মানুষের সাথে কথা বলতে সদাচরণ করে। প্রতিবেশী মহিলারা তার প্রতি সন্তুষ্ট। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই দুই জনের মধ্যে কোন মহিলা উত্তম? ঐ ইবাদতগুজার মহিলা, না এই পরহেযগার মহিলা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দ্বিতীয় মহিলা প্রথম মহিলার তুলনায় অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। বরং এক বর্ণনায় এসেছে প্রথম মহিলা জাহান্নামী এবং দ্বিতীয় মহিলা জান্নাতী। কেন? কারণ, সে মুখ দিয়ে অন্যদেরকে কষ্ট দেয়।[১]

এ বিষয়ে অধিক চিন্তা করুন

এই হাদীস দ্বারাও এ বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, নফল ইবাদত নিঃসন্দেহে উঁচু স্তরের নেয়ামত এবং অবশ্যই তা সম্পাদন করা উচিত, কিন্তু তার সাথে সাথে নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচানোর চিন্তা আরো অধিক করা উচিত। রমাযানুল মুবারকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলার দেওয়া তাওফীকে রোযা রাখলো, তিলাওয়াত করলো, জামাতের সাথে তারাবীহের নামায আদায় করলো, তাহাজ্জুদ পড়লো, নফল নামায পড়লো, ইতেকাফও করলো, কিন্তু যেই রমাযান বিদায় নিলো সেই আবার পুরাতন জীবন শুরু হলো। এখন না চোখের হেফাজত করছে না মুখের হেফাজত করছে, না কানের হেফাজত করছে, না হালাল-হারামের চিন্তা করছে, যার অর্থ হলো রমাযানুল মুবারকে নেকীর যেই পুঁজি সঞ্চয় করেছিলো তার সব লুটিয়ে দিলো। এজন্য গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করতে হবে এবং এ জন্য পোক্ত সংকল্প করতে হবে। একই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নিকট গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীকের জন্য দু'আও করবে। বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন।

এটা মারাত্মক বিপজ্জনক বিষয়

আমি যে বললাম, আমাদের অন্তরে নফল ইবাদতের গুরুত্ব তো রয়েছে, কিন্তু গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির নেই। এটা এমন এক ব্যাধি, যার মধ্যে

---

১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ৯২৯৮

আমরা সবাই আক্রান্ত। আল্লাহর খুব কম বান্দাই এর ব্যতিক্রম রয়েছে। কতক গোনাহ এমন রয়েছে, যেগুলোকে আমরা গোনাহ মনে করি। গোনাহ মনে করার কারণে তার প্রতি ঘৃণাও রয়েছে। তার থেকে নিজেকে বাঁচানোর কিছুটা চিন্তাও থাকে। আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু অনেক গোনাহ এমন আছে, যেগুলোকে গোনাহই মনে করা হয় না। এটা মারাত্মক বিপজ্জনক কথা। কারণ মানুষ রোগকে রোগ মনে করলে তার চিকিৎসাও করাবে। বিশেষ করে শরীয়তের এই তিনটি শাখা, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাকিয়াত এমন, যেগুলোর উপর আমল না করার ফলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা বৃথা যাচ্ছে। মুআমালার ক্ষেত্রে হালাল-হারামের চিন্তা, মুআশারাতের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের চিন্তা এবং আখলাকিয়াতের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে চলছে। এগুলোকে আমরা দ্বীন থেকে বাহির করে দিয়েছি। মুখের হেফাজত, চোখের হেফাজত এবং কানের হেফাজতের দিকে আমাদের মনযোগ নেই।

কুধারণা ত্যাগ করুন

কিছু গোনাহ সম্পর্কে তো আমাদের জ্ঞান আছে যে এগুলো গোনাহ, তাই এগুলো থেকে বাঁচতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! সেগুলো থেকে বাঁচিও। যেমন আল্লাহর শোকর, মদ পান করি না। আল্লাহর মেহেরবানীতে শূকর খাই না। আল্লাহর দয়ায় যেনায় লিপ্ত হই না, কিন্তু আরো যে অসংখ্য গোনাহ রয়েছে, যেমন গীবতের গোনাহ তা থেকে আমরা বাঁচি না। আমাদের মজলিসগুলো দিনরাত গীবতে পরিপূর্ণ। কুধারণার গোনাহে আমরা আক্রান্ত। কুরআনে কারীমে আছে,

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

'কতক ধারণা গোনাহ।'[১]

কিন্তু আমরা অন্য মানুষের ব্যাপারে মনে মনে কুধারণা পোষণ করি, তা নিয়ে চিন্তা করি, কিন্তু এটাকে আমরা গোনাহই মনে করি না। মনে করি যে, অমুকে হয়তো আমার বিরুদ্ধে এই কাজ করেছে। তারপর এটাকেই মন-মগজে বসিয়ে নিয়েছি। আমাদের এই কাজ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (কতক ধারণা গোনাহ।)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু এই অনুভূতি নেই যে, এটা গোনাহের কাজ।

---

১. সূরা হুজুরাত, আয়াত-১২

উড়ো কথা ছড়ানো গোনাহ

একটা উড়ো কথা শুনলাম। কথাটা ঠিক না বেঠিক তা যাচাই না করেই আরেকজনের কাছে তা বর্ণনা করলাম। উড়ো কথা ছড়িয়ে দিলাম। এটাকে কেউই গোনাহ মনে করে না। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

'একজন মানুষের মিথুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই বর্ণনা করে।'[১]

অর্থাৎ, এটাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত যে, মানুষ উল্টা-সিধা ও সঠিক-বেঠিক যাই শুনলো, যাচাই না করে অন্যের নিকট তাই বলতে আরম্ভ করলো। এটা গোনাহের কাজ, কিন্তু আমরা এটাকে গোনাহই মনে করি না।

চাকরির পুরো সময় দিচ্ছেন তো?

মানুষ বলে, আল্লাহর শোকর আমরা হালাল খাচ্ছি। আল্লাহর শোকর আমরা সুদ খাচ্ছি না। আল্লাহর শোকর জুয়া খেলছি না। আল্লাহর শোকর মদ বিক্রি করে পয়সা কামাচ্ছি না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করুন! আপনি চাকরিজীবী হয়ে থাকলে চাকুরির নির্ধারিত সময় পুরোটা চাকুরির কাজে ব্যয় করছেন কি না? না কি ফাঁকি দিচ্ছেন? যদি পুরো সময় না দিয়ে থাকেন তার অর্থ হলো যতটুকু সময় আপনি বিক্রি করেছেন, যার বিনিময়ে আপনি বেতন পাচ্ছেন, তা থেকে যে সময়টুকু আপনি চাকুরির কাজে লাগাচ্ছেন না, তার বিনিময়ে যেই বেতন আপনি নিলেন তা হারাম হয়ে গেলো। বেতন হারাম হলে সেই টাকা দিয়ে যেই খাবার কিনলেন তাও হারাম হলো। যেই ইফতারি আপনি কিনলেন তাও হারাম হলো। তাই এটাও হারাম খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

জাপানি বলে মাল বিক্রি করা

এক ব্যক্তি ব্যবসা করে। ব্যবসাতে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কোনো ধরনের ধোঁকা দিলো, যেমন পাকিস্তানের (দেশের) তৈরী মাল জাপানি বলে বিক্রি করলো, তা হলে সে হারাম করলো। এভাবে যেই পয়সা কামালো, তা হারাম

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৪০

হলো। সেই পয়সা দিয়ে যেই খাবার কিনলো তা হারাম। এভাবে পেটের মধ্যে হারাম লোকমা যাচ্ছে, হালাল নয়।

জুয়া খেলা হারাম

আমাদের ওয়ালেদ ছাহেবের কাছে এক ব্যক্তি আসতেন। তিনি খুব ইবাদতগুজার ও তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। কখনোই তার তাহাজ্জুদ বাদ যেতো না। নিয়মিত যিকির ও তাসবীহ পাঠ করতেন। ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন। তার দোকানও ছিলো। জানা গেলো তিনি রাতে ঘন্টাকে ঘন্টা তাহাজ্জুদও পড়েন, তিলাওয়াতও করেন, তাসবীহও পড়েন আর দিনে গিয়ে জুয়া খেলেন। ওযীফা এই উদ্দেশ্যে পাঠ করেন, যাতে জুয়ার নাম্বার জানা যায়। এটা তো একেবারে সুস্পষ্ট গোনাহ। সবাই জানে যে, এটা গোনাহ।

জাল সার্টিফিকেট তৈরী করা

কিন্তু আমি ঐসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেগুলো সম্পর্কে এই অনুভূতিও নেই যে, আমি গোনাহের কাজ করছি। যেমন জাল সার্টিফিকেট তৈরী করা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ছুটি নিতে হবে এমনিতে ছুটি পাওয়া যাবে না, তাই কোনো ডাক্তার দিয়ে জাল মেডিকেল সার্টিফিকেট তৈরী করলো এবং তার ভিত্তিতে ছুটি লাভ করলো। এর ফলে নিজেও গোনাহ করলো যেই ডাক্তার দ্বারা সার্টিফিকেট তৈরী করলো তাকেও গোনাহে লিপ্ত করলো। কারণ, সেই ডাক্তার মিথ্যা বলেছে এবং ঘুষও নিয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে তো সে এ কাজ করেনি। এভাবে ঐ ডাক্তার ঘুষ নেওয়ার গোনাহও করলো এবং মিথ্যা বলার গোনাহও করলো। আর এ ব্যক্তি হলো ঐ গোনাহের কারণ। এসব গোনাহ তো হলোই, তাছাড়া মাস শেষে যেই বেতন পেলো তার মধ্যে এ পরিমাণ অংশ হারাম হয়ে গেলো।

'ইবাদত' বন্দেগীর নাম

এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ

অর্থাৎ, রাতের বেলা খুব নফল পড়া এবং তাহাজ্জুদ পড়া ইবাদত নয়, বরং ইবাদত হলো আল্লাহ তা'আলার হারাম করা জিনিস থেকে নিজেকে

নিজে বাঁচানো। আসল ইবাদত এটাই। কারণ, ইবাদতের অর্থ হলো বন্দেগী। আর বন্দেগীর প্রথম কথা হলো আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা। যদি আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য না হলো তাহলে তা বন্দেগী হলো কি করে? আপনি আল্লাহর সামনে সেজদা তো করছেন, কিন্তু সাথে একথাও বলছেন যে, আমি আপনার হুকুম মানবো না। আমার মন যা চাইবে আমি তাই করবো, এটা কোন ধরনের বন্দেগী হলো! আনুগত্য বন্দেগীর প্রধান অংশ। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হুকুমের পরিপন্থী কোনো কাজ না করা এবং নাফরমানী না করার ব্যাপারে চিন্তাশীল হতে হবে।

জিহ্বার হেফাজত করুন

বিশেষভাবে যেই কথাটি বলছি, যাতে ব্যাপকভাবে আমরা আক্রান্ত, তার মধ্যে একটা হলো জিহ্বার গোনাহ। আরেকটা হলো চোখের গোনাহ। ভালো ভালো মানুষ এই দুই গোনাহে আক্রান্ত। বাহ্যিকভাবে যাদেরকে আবেদ যাহেদ দেখা যায়, মুত্তাকী ও পরহেযগার দেখা যায়, তারাও নিজেদের দিকে তাকালে দেখতে পাবে যে, তারাও জিহ্বার গোনাহ ও চোখের গোনাহে আক্রান্ত। এজন্য আমাদের জিহ্বা দিয়ে এমন কোনো কথা যেন বের না হয়, যা আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করবে। এ ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কতক সময় মানুষ নিজের মুখ দিয়ে উদাসীনভাবে এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেন।[১]

যেমন কোন সময় আবেগের সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে গিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললো বা 'সুবহানাল্লাহ' বললো বা অন্য কোনো যিকির করলো এবং এমন ইখলাস আর জযবার সাথে বললো যে, আমার মাওলা তা কবুল করে নিলেন আর এর ভিত্তিতেই তার ঘাটি পার হয়ে গেলো। বা মুখ দিয়ে এমন কোনো কথা বললো, যার দ্বারা কোনো ভাঙ্গা মন জোড়া লাগলো, তার হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হলো। বাহ্যিকভাবে আপনি গুরুত্বের সাথে সে কথা বলেননি, কিন্তু যেহেতু তার মাধ্যমে ভাঙ্গা মন শান্তি লাভ করলো এবং আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করলেন তার বদৌলতে আপনার বেড়া পার করে দিলেন এবং জান্নাতে পৌছিয়ে দিলেন।

---

১. কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫১, হাদীস নং ৭৮৫৬, রওযাতুল মুহাদ্দিসীন, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১০, হাদীস নং ৩৪৮১

মুখ থেকে উচ্চারিত একটি শব্দ

তারপর তিনি বলেন, কতক সময় মানুষ নিজের মুখ দ্বারা এমন কথা উচ্চারণ করে যাকে সে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছিলো না, কিন্তু এই একটি কথার কারণে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, সেই শব্দ তাকে জাহান্নামের এতো গভীরে নিক্ষেপ করে, যা ৭০ বছরের দূরত্বের পথ। যেমন মিথ্যা বললো, গীবত করলো, কারো মন ভেঙ্গে দিলো, কাউকে গালমন্দ করলো, যার ফলে এই শব্দ তাকে ৭০ বছরের দূরত্বে গভীরে নিক্ষেপ করলো। একটি শব্দ যখন এতো গভীরে নিক্ষেপ করে তাহলে এই জিহ্বা যা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাক্ষণ নির্দ্বিধায় কেচির মতো চলছে, জানা নেই তা আমাদেরকে জাহান্নামের কতো গভীরে নিক্ষেপ করবে!

আসরে গীবত ও সমালোচনা

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপকারী জিহ্বার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু নেই।[১]

কিন্তু আমাদের কি এ বিষয়ে কোনো চিন্তা আছে যে, এই জিহ্বাকে আটকাবো, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবো। তাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করবো। আল্লাহর নাফরমানী ও গোনাহের কাজে ব্যবহার করবো না। মজলিসে বসেছি তো গীবত চলছে, আমাদের কোনো পরোয়া নেই। আলোচনার মাঝে কারো কারো অন্যদের সমালোচনা করার খুব আগ্রহ থাকে। কোনো বিষয়ে আলোচনা চলছে, তো তার মধ্যে অন্যের সমালোচনা আরম্ভ করে দেয়। সমালোচনার ফলে অন্যকে দংশন করছে, অন্যের মন ভাঙ্গছে, কিন্তু এ বিষয়ে তার কোনো পরোয়া নেই।

মেপে কথা বলুন

আরে ভাই! মিথ্যা, গীবত, যাচাই ছাড়া কথা বলা, এসব থেকে বেঁচে থাকুন। জিহ্বাকে চিন্তা করে করে ব্যবহার করুন। আল্লাহর ওলীগণ বলেছেন, আগে মাপো তারপর কথা বলো। জিহ্বা যেন লাগামহীন না চলে।

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৪১, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৬৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১০০৮

এমন যেন না হয় যে, জিহ্বা দিয়ে কি বের হচ্ছে তার কোনো পরোয়া নেই। এজন্য চিন্তা করে করে কথা বলুন। যখন কারো সঙ্গে কথা বলবে, তখন ভয় করে কথা বলবে, এমন যেন না হয় যে, আমার কথায় তার কষ্ট হলো। ফলে আখেরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি হলো। এ বিষয়ে চিন্তা করুন। এজন্য নিজের জিহ্বা, নিজের চোখ এবং নিজের কানকে গোনাহ থেকে বাঁচান। কারণ, গীবত করা যেমন নাজায়েয গীবত শোনাও তেমন নাজায়েয। এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ

'হারাম থেকে বাঁচো তাহলে তুমি সবচে' বড়ো ইবাদতগুজার হতে পারবে।'

প্রকৃত মুজাহিদ কে?

নফল পড়া তো সবাই দেখে। দর্শক মনে করে এ ব্যক্তি বড়ো আবেদ যাহেদ মানুষ। কিন্তু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তার প্রতি যত্নশীল হওয়া এমন জিনিস যা মানুষ বুঝতেও পারে না। যেমন অন্তরে গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হলো, মানুষ তা দমন করলো, সেই চাহিদা অনুপাতে কাজ করলো না, এটা এতো বড়ো জিহাদ, যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

'প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করে।'[১]

এতো বড়ো জিহাদ করলো, অথচ কেউ জানতে পারলো না। এতে কোনো খ্যাতি লাভ হয় না। এতে রিয়ার সম্ভাবনা নেই। এতে রয়েছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ও আপনাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন।

রমাযানুল মুবারকের রোযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৪৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৮৩৩

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো যাতে তোমরা পরহেযগার হয়ে যাও।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রোযার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়, গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টার নাম তাকওয়া। এজন্য রমাযান মাসে এই চিন্তা জাগ্রত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা রোযা ও তারাবীহের বরকতে আমাদের অন্তরে এ চিন্তা সৃষ্টি করে দিন। যখন রমাযানের মুবারক মাস শেষ হবে তখনও যেন আমরা নিজেদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে পারি। আমাদের মধ্যে গোনাহের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে চিন্তা জাগ্রত হয় যে, এটা থেকে বাঁচা জরুরী। যদি চোখের হেফাজত, মুখের হেফাজত, কানের হেফাজত এবং আত্মার হেফাজত করতে পারি, তখন দেখবেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কেমন নূর ও বরকত নাযিল হয়!

চোখ কান জিহ্বা বন্ধ করুন

মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند
گر نہ بینی نور حق بر من بخند

মাওলানা রূমী রহ. বলেন, নিজের চোখ বন্ধ করো। বন্ধ করার অর্থ হলো, যত্ন নাও যাতে এই চোখ নাজায়েয জায়গা না দেখে। কান বন্ধ করো। কান বন্ধ করার অর্থ হলো, কান যেন গোনাহের কথা না শোনে, সে ব্যাপারে যত্নশীল হও। যেমন গান শোনা, গীবত ও মিথ্যা কথা শোনা। ঠোঁট বন্ধ করো, কোনো নাজায়েয কথা যেন মুখ দিয়ে বের না হয়। এই তিনটি কাজ করো। এই তিন কাজ করার পরও যদি আল্লাহর নূর দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করো। একথা এমন ব্যক্তি বলছেন, যার সারাটি জীবন আল্লাহ তা'আলার পথে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহর নূর তখন দৃষ্টি গোচর হয়, যখন মানুষ নিজেকে এসব গোনাহ থেকে হেফাজত

---

১. সূরা বাকারাহ ১৮৩

করে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এই হাদীসের নির্দেশের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আজ এই হাদীসের একটি বাক্যের উপর বয়ান হলো, বাকী বিষয়ের বয়ান ইনশাআল্লাহ কাল করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
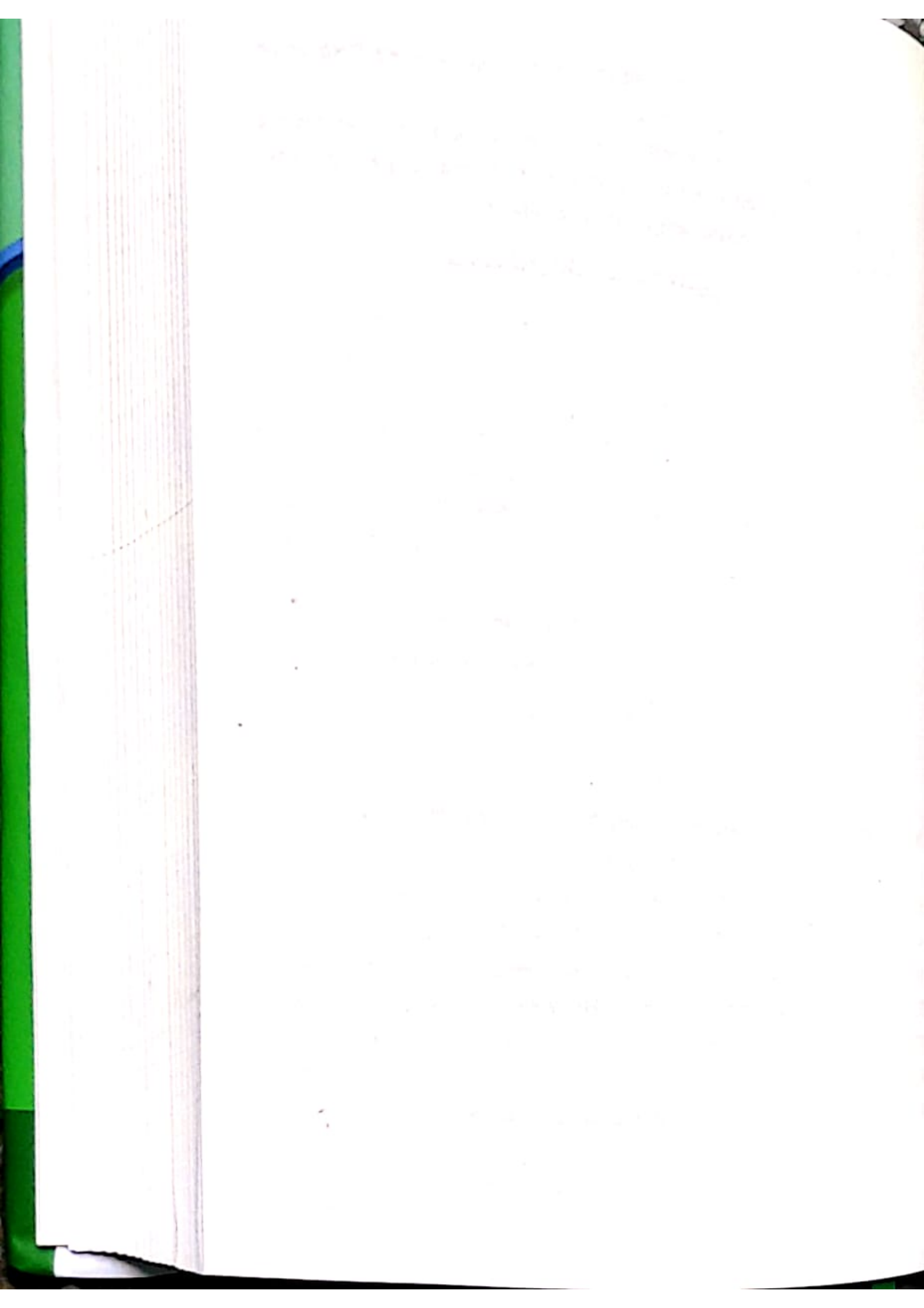
গোনাহের ক্ষতিসমূহ*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّهٗ قَالَ لَهٗ رَجُلٌ: قَلِيْلُ الْعَمَلِ قَلِيْلُ الذُّنُوْبِ اَعْجَبُ اِلَيْكَ اَوْ رَجُلٌ كَثِيْرُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ الذُّنُوْبِ؟ قَالَ لَا اَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ [১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। হযরত আব্বাস রাযি. ছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর ছেলে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে তিনি ছিলেন খুব অল্প বয়সী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো দশ বছরের মতো। কমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলমের অনেক উঁচু স্তর দান করেছিলেন। কারণ, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন-

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৭৯-২০৩, ৬ই মে ১৯৯৪খৃষ্টাব্দ, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী, বক্ষমান বয়ান, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর কিতাবুয যুহদের باب ما جاء في تخويف عواقب الذنوب-এর দরস

১. কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক কৃত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২, হাদীস নং ৬৬, আযযুহদ, হান্নাদ কৃত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫৪, হাদীস নং ৯০২, ফাতহুল বারী, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৫৭, রওযাতুল মুহাদ্দিসীন, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩০, হাদীস নং ২৬০৫

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

'হে আল্লাহ! তাকে কুরআনে কারীমের ইলম দান করুন এবং দ্বীনের ফিকহ দান করুন।'[১]

যদিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তার বয়স ছিলোমাত্র দশ বছর। দশ বছর আর এমন কি বয়স! কিন্তু একদিকে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কথাসমূহ মন-মগজে গেঁথে নিয়েছিলেন। উপরন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি চিন্তা করলেন এখন তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, কিন্তু বড়ো বড়ো সাহাবী তো এখনো বিদ্যমান আছেন। আমি তাদের খেদমতে গিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও শিক্ষা অর্জন করি। তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট যেতেন। এতদোদ্দেশ্যে সফর করতেন। কষ্ট করতেন। এভাবে তিনি বড়ো বড়ো সাহাবী থেকে ইলম অর্জন করেন। ফলে আজ তাঁকে ইমামুল মুফাসসিরীন বলা হয়। অর্থাৎ, সকল মুফাসসিরের ইমাম। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! তাকে কিতাবুল্লাহর ইলম দান করুন। কুরআনের তাফসীরের বিষয়ে তাঁর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য কথা আর কারো নেই। আমি এখন যে কথাটি আপনাদের সামনে পাঠ করলাম তা তাঁরই উক্তি।

পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলো, বলুন তো! এক ব্যক্তি আমল তো কম করে অর্থাৎ নফল ইবাদত ও নফল নামায খুব বেশি পড়ে না, বেশির ভাগ ফরয ওয়াজিব আদায় করে। নফল ইবাদত, যিকির-আযকার, ওযীফা ও তাসবীহ অধিক পাঠ করে না, কিন্তু তার গোনাহ কম। এমন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়, নাকি ঐ ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়,

---

১. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে দু'টি দু'আ দিয়েছিলেন, প্রথম দু'আ হলো اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩২০৬, দ্বিতীয় দু'আটি ছিলো, اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪০০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৭৪

যার নফল ইবাদতও অধিক এবং গোনাহও অধিক। যেমন তাহাজ্জুদ নামাযও পড়ে, ইশরাকও পড়ে, আওয়াবিনও পড়ে, তিলাওয়াতও খুব করে, ওযীফা ও তাসবীহ্-ও খুব পাঠ করে সাথে সাথে গোনাহের কাজও খুব করে। আপনার নিকট এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম? প্রথম ব্যক্তির আমলও কম গোনাহও কম, দ্বিতীয় ব্যক্তির আমলও বেশি গোনাহও বেশি। উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সমান আমি অন্য কিছুকে মনে করি না। অর্থাৎ, মানুষ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে এটা এতো বড়ো নেয়ামত এবং এতো বেশি কল্যাণকর যে, অন্য কোনো আমল এর সমান নয়। গোনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে যত্ন নেয়ার তুলনায় নফল ইবাদতের কোনো গুরুত্ব নেই।

আসল জিনিস গোনাহ থেকে বাঁচা

এই হাদীসে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যতো নফল ইবাদত আছে তা যথাস্থানে অনেক বেশি ফযীলতের জিনিস, কিন্তু এই নফল ইবাদতের উপর ভরসা করে মানুষ যদি চিন্তা করে যে, আমি তো নফল ইবাদত অনেক করি, তাই সে গোনাহ থেকে পরহেয করলো না তাহলে এটা হবে বড়ো ধরনের আত্ম প্রবঞ্চনা। আসল জিনিস হলো গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করা। গোনাহ থেকে বাঁচার পর মনে করুন তার যদি অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করার সুযোগ নাও হয় তাহলেও সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহর নিকট নাজাত পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি নফল ইবাদত খুব করে সাথে অনেক গোনাহও করে তাহলে তার মুক্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই। এটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার।

গোনাহ ছাড়ার চিন্তা নেই

আজকাল আমাদের সমাজে গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা একেবারে কমে গেছে। কারো অন্তরে দ্বীনের উপর চলার আগ্রহ হলে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর তাওফীক লাভ হলে সে চিন্তা করে যে, আমাকে কিছু ওযীফা বলে দেয়া হোক, কিছু আমল শিখিয়ে দেওয়া হোক, যিকিরের নিয়ম বলে দেওয়া হোক। নফল ইবাদত কিভাবে করবো এবং কখন করবো তা বলা হোক। এই বাহ্যিক কিছু আমলের দিকে তার মনযোগ যায়। মা'মুলাত পুরা করার কাজে দিন রাত লেগে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে তার ফিকির হয় না যে

আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনে কতগুলো গোনাহের কাজ হচ্ছে। কতো কাজ আল্লাহর মর্জির খেলাফ হচ্ছে। ভালো ভালো শিক্ষিত দ্বীনদার মানুষকে দেখেছি, তারা প্রথম কাতারে নিয়মিত নামায পড়ে, মসজিদে নিয়মিত জামাতের সাথে নামায আদায় করে, ওযীফা পালন করে, খুব গুরুত্বের সাথে নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ ও ইশরাক আদায় করে, কিন্তু তার এ বিষয়ে চিন্তা নেই যে, বাড়িতে গোনাহের যেই গরম বাজার চলছে তা কিভাবে ঠিক করা যায়। বাজারে গেলে হালাল হারামের চিন্তা নেই। কথাবার্তায় গীবত ও মিথ্যার ব্যাপারে চিন্তা নেই। ঘরে নাজায়েয ও হারাম জিনিস থাকলে তা বের করার চিন্তা নেই। ফলে ফিল্ম দেখা হচ্ছে, নাজায়েয প্রোগ্রাম দেখা হচ্ছে, গান বাজনা হচ্ছে, সেদিকে মনোযোগ নেই। কিন্তু ওযীফার দিকে মনোযোগ আছে। অথচ এসব গোনাহ মানুষকে ধ্বংসকারী। প্রথমে তা থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টা করতে হবে।

নফল ইবাদত ও গোনাহের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

এর দৃষ্টান্ত এমন, মনে করুন যতো নফল ইবাদত আছে, নফল নামায হোক, তিলাওয়াত হোক, যিকির ও তাসবীহ হোক এগুলো হলো টনিক বা শক্তি বর্ধক। এগুলো দ্বারা শক্তি লাভ হয়। যেমন মানুষ শরীরে শক্তি বৃদ্ধির জন্য টনিক ব্যবহার করে, আর গোনাহ হলো বিষতুল্য। কোনো ব্যক্তি যদি টনিকও খায় আবার বিষও খায় তার ফল এই হবে যে, টনিক প্রভাব সৃষ্টি করবে না কিন্তু বিষ প্রভাব সৃষ্টি করবে। তার ধ্বংসের কারণ হবে। আরেক ব্যক্তি এমন যে কোনো টনিক বা শক্তিবর্ধক ঔষধ তো ব্যবহার করে না, শুধু ডাল রুটি খায়, কিন্তু সুস্থতার জন্য যেসব জিনিস ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে এ ব্যক্তি সুস্থ থাকবে। যদিও সে টনিক খায় না। আর প্রথম ব্যক্তি যে টনিকও খায় সাথে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে বিরত থাকে না সে অবশ্যই অসুস্থ হয়ে পড়বে। একদিন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নফল ইবাদত ও গোনাহরে দৃষ্টান্ত ঠিক এমনই। এ জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবন থেকে গোনাহ বের হয়ে যাওয়ার চিন্তা করা উচিত। নিষিদ্ধ ও পাপকাজ বের হওয়ার ব্যাপারে যত্ন নেওয়া উচিত। যে পর্যন্ত এসব জিনিস বের না হবে সে পর্যন্ত এসব নফল ইবাদত আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না।

আত্মশুদ্ধিকামীদের জন্য প্রথম কাজ

বর্তমানে নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো শাইখের নিকট ইসলাহী সম্পর্ক করতে গেলে ঐ শাইখ তাকে সাথে সাথে বলে দেয় যে, তুমি এই মা'মুলাত পালন করবে, এই পরিমাণ যিকির করবে, এই পরিমাণ তাসবীহ পাঠ করবে। কিন্তু হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর নিয়ম এই ছিলো যে, তাঁর কাছে যখন কোনো ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আসতো তখন তাকে যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল কিছু দিতেন না। সর্বপ্রথম বলতেন, গোনাহ ছাড়ো। এ পথে সর্বপ্রথম কাজ হলো পরিপূর্ণ তাওবা করা। মানুষকে সর্বপ্রথম সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। বলতে হবে, হে আল্লাহ! ইতিপূর্বে যতো গোনাহ আমার দ্বারা হয়েছে মেহেরবানী করে আপনি সেগুলো মাফ করে দিন। আমি আগামীর জন্য সংকল্প করছি, ভবিষ্যতে আর এসব গোনাহ করবো না। অতপর ভবিষ্যতে এসব গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিবে। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ কিছু গোনাহ থেকে বাঁচার যত্ন নিলে হবে না। প্রত্যেক গোনাহই গোনাহ। প্রত্যেক গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

'বাহ্যিক গোনাহও ছাড়ো এবং অভ্যন্তরীণ গোনাহও ছাড়ো।'

এরপর বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

'যারা গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় কিয়ামতের দিন তাদেরকে সে সব কাজের শাস্তি দেওয়া হবে যা তারা দুনিয়াতে করতো।'[১]

সব ধরনের গোনাহ ত্যাগ করুন!

এজন্য কোনো গোনাহই এমন নেই, যার ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যায়। না জাহেরী গোনাহ, না বাতেনী গোনাহ। এমন যেন না হয় যে, কিছু মোটা মোটা গোনাহ তো ছেড়ে দিলো কিন্তু অবশিষ্ট গোনাহ ছাড়ার দিকে কোনো

১. সূরা আনআম, আয়াত-১২০

মনযোগ নেই। যেমন মজলিসে গীবত করা হচ্ছে, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলা হচ্ছে, অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে, কিংবা অন্তরে অহঙ্কার ভরা। সম্পদের ভালোবাসা, পদ পদবীর ভালোবাসা, দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে পরিপূর্ণ। তাহলে তো গোনাহ ছাড়া হলো না। প্রত্যেক এমন কাজ, যাকে আল্লাহ ও রাসূল গোনাহ সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো ত্যাগ করতে হবে। সে বিষয়ে মানুষকে চিন্তাশীল হতে হবে।

পরিবার-পরিজনকে গোনাহ থেকে বাঁচান!

আরেকটি কথা বলছি, এসব গোনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ছুটবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পরিবেশকে সংশোধন করার চিন্তা-চেষ্টা না করা হবে। কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহ থেকে বাঁচতে চায় আর পরিবার-পরিজন ভুল পথে চলছে সেদিকে কোনো মনযোগ না দেয়, মনে রাখবেন! এভাবে কখনোই গোনাহ ছাড়তে পারবে না। গোনাহ ছাড়ার জন্য যতো চেষ্টাই করেন না কেন ঘরের পরিবেশ যদি খারাপ থাকে, পরিবার-পরিজন যদি ভুল পথে চলে আর সে বিষয়ে আপনার কোনো ফিকির না থাকে, তাহলে এই পরিবার-পরিজন একদিন না একদিন আপনাকে অবশ্যই গোনাহে লিপ্ত করবে। সুতরাং একজন মানুষের জন্য গোনাহ থেকে বাঁচা যেমন জরুরী, তেমনই জরুরী পরিবার-পরিজনকে বাঁচানো। সব সময় চিন্তা ফিকির থাকতে হবে পরিবার-পরিজন যেন কোনো গোনাহে লিপ্ত না হয়।

মহিলাদের কাজের গুরুত্ব

এ বিষয়ে মহিলাদের কৃতিত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মহিলাদের অন্তরে যদি এই চিন্তা জাগে যে, আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মোতাবেক জীবন কাটাতে হবে এবং গোনাহ থেকে বাঁচতে হবে, তাহলে বাড়ির পরিবেশ ঠিক হয়ে যাবে। কারণ, মহিলারা হলো ঘরের ভিত্তি। মহিলাদের অন্তরে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তাহলে পুরো পরিবার পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু মহিলার অবস্থা যদি এই হয় যে, পর্দার বিষয়ে তার কোনো চিন্তা নেই, মাথা উন্মুক্ত, চুল খোলা, মনমস্তিষ্কে খারাপ চিন্তা, অহেতুক বিষয়ে নিমগ্ন, তাহলে এর পরিণতিতে ঘরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য মহিলাদের উপর গোনাহের কাজ ত্যাগ করার ব্যাপারে দায়িত্ব অধিক বর্তায়।

গোনাহ কী জিনিস?

এ সব গোনাহ কী জিনিস? গোনাহের পরিণতি কী হয়? প্রথমে এটা জানা জরুরী। গোনাহের অর্থ হলো অবাধ্যতা। যেমন আপনার বড়ো কেউ আপনাকে আদেশ করলো, এ কাজটি এভাবে করো। আপনি বললেন, আমি করবো না। বা বড়ো কেউ বললো, এ কাজ থেকে বিরত থাকো। আপনি বললেন, আমি এ কাজ অবশ্যই করবো। বড়োর কথা না মানাকেই নাফরমানী ও অবাধ্যতা বলে। এই নাফরমানী যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের ক্ষেত্রে করা হয় তাহলে তার নামই হলো গোনাহ। আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর প্রভাব এতো সুদূর প্রসারী, এতো খারাপ ও এতো জঘন্য যে, তা অনুমান করাও কঠিন।

গোনাহের প্রথম খারাবি অকৃতজ্ঞতা

গোনাহের প্রথম খারাবি অকৃতজ্ঞতা। যেই দয়ালু সত্তা মানুষকে অস্তিত্ব দান করলেন। মানুষ সর্বদা তাঁর নেয়ামতের ভিতর নিমজ্জিত। মাথা থেকে পাতা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ তার উপর বর্ষিত হচ্ছে। দেহের একেকটি অঙ্গ নিয়ে চিন্তা করুন যে, এর মূল্য কতো! এর গুরুত্ব কতো! এসব নেয়ামত বিনামূল্যে লাভ হয়েছে, অথচ এর জন্য অন্তরে কোনো গুরুত্ব নেই। আল্লাহ না করুন, কোনো সময় যদি এসব অঙ্গের একটি অঙ্গও ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন বুঝে আসবে যে, তা কতো বড়ো নেয়ামত এবং এই ক্ষতি কতো বড়ো ক্ষতি! এই চোখ কতো বড়ো নেয়ামত! এই কান কতো বড়ো নেয়ামত! এই জিহ্বা কতো বড়ো নেয়ামত! এই সুস্থতা কতো বড়ো নেয়ামত! এই রিযিক, যা সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা দান করছেন তা কতো বড়ো নেয়ামত! যেই বিরাট দয়ালু ও করুণাময়ের অসংখ্য নেয়ামত আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে আছে, তিনি শুধু এ কথা বলেছেন যে, তোমরা মাত্র কয়েকটি জিনিস থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তোমার দ্বারা এই সামান্য কাজটুকুই হয় না। এজন্য গোনাহের সর্বপ্রথম খারাপ দিক হলো অকৃতজ্ঞতা, নাশুকরি ও দয়াময়ের হক আদায় না করা।

গোনাহের দ্বিতীয় খারাবি অন্তরে মরিচা পড়া

গোনাহের দ্বিতীয় খারাবি এই যে, হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যখন প্রথমবার গোনাহ করে তখন

তার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগিয়ে দেয়া হয়। সেই দাগের হাকীকত তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। যখন দ্বিতীয় গোনাহ করে তখন দ্বিতীয় দাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়। যখন তৃতীয় গোনাহ করে তখন তৃতীয় দাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে যদি সে তাওবা করে তাহলে এসব দাগ মুছে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাওবা না করে অব্যাহতভাবে গোনাহ করতেই থাকে তাহলে আস্তে আস্তে ঐ কালো দাগ তার পুরো আত্মাকে আচ্ছন্ন করে। তখন ঐ দাগ মরিচার রূপ ধারণ করে। অন্তরে মরিচা লেগে যায়। যখন অন্তরে মরিচা পড়ে যায় তখন হক কথা মানার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার উপর এমন গাফলত আচ্ছন্ন করে যে, তখন গোনাহের অনুভূতি দূর হয়ে যায়। গোনাহের অনিষ্টতা ও অকল্যাণের বোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের বুদ্ধি যেন নষ্ট হয়ে যায়।[১]

গোনাহের চিন্তার ক্ষেত্রে মুমিন ও ফাসেকের পার্থক্য

এক বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, যেই মুমিন এখনো গোনাহে অভ্যস্ত হয়নি, সে গোনাহকে এমন মনে করে যেমন তার মাথার উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। আর পাপী ব্যক্তি গোনাহকে এমন হালকা ও মামুলী মনে করে, যেমন নাকের উপর মাছি এসে পড়েছে আর সে হাত মেরে তা উড়িয়ে দিলো। অর্থাৎ, সে গোনাহকে খুব মামুলি মনে করে। গোনাহ করার পর এজন্য তার কোন অনুশোচনা ও অনুতাপ জাগে না। কিন্তু একজন মুমিন যাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের বরকত দান করেছেন, সে গোনাহকে একটি পাহাড় মনে করে। ভুলে কোনো গোনাহের কাজ হয়ে গেলে তার মাথার উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। ফলে সে দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হয়।

নেককাজ ছুটে গেলে ঈমানদারদের অবস্থা

গোনাহ তো দূরের কথা, একজন মুমিনের যদি নেক কাজ করার সুযোগ লাভ হয়, আর সেই সুযোগ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলেও তার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। হায়! নেক কাজ করার সুযোগটি লাভ হয়েছিলো কিন্তু আফসোস তা আমার হাতছাড়া হয়ে গেলো। এ সম্পর্কে মাওলানা রূমী রহ.বলেন,

---

১. শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৪১, হাদীস নং ৭২০৭, আদদুররুল মানসূর, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪৬, আযযুহ্দ, আবু দাউদ কৃত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯২, হাদীস নং ২৭১

بر دل سالک ہزاراں غم بود
گر ز باغ دل خلال کم بود

অর্থাৎ, আল্লাহর পথের পথিকের আত্মার বাগান থেকে একটি কুটা পরিমাণ জিনিসও কমে গেলে অর্থাৎ, নেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলো কিন্তু সে নেকী করতে পারেনি তখন তার আত্মার উপর দুঃখের হাজার হাজার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। আফসোস! আমার এই নেককাজটি ছুটে গেলো। নেক কাজ ছুটে গেলে যদি এই পরিমাণ ব্যথা হয় তাহলে গোনাহের কাজ হয়ে গেলে কি পরিমাণ ব্যাথা হবে! তখন তো এরচে' অধিক বেদনা হবে। আল্লাহ তা'আলা এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন যে, গোনাহের কারণে অন্তরে দাগ লাগতে থাকার ফলে গোনাহকে এতো সাধারণ মনে করে, যেমন নাকের উপর মাছি এসে বসলো আর সে তা উড়িয়ে দিলো। গোনাহের জন্য তার কোনো দুঃখ-বেদনাই হয় না। যাইহোক, গোনাহের একটি খারাপ দিক এই যে, তা মানুষকে গাফেল বানিয়ে দেয়। এর ফলে অন্তরে পর্দা পড়ে যায়।

গোনাহের তৃতীয় খারাবি অন্ধকার

আমরা গোনাহের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এজন্য গোনাহের অন্ধকার ও ঘৃণা আত্মা থেকে মুছে গেছে। অন্যথায় প্রত্যেক গোনাহের মধ্যে এমন অন্ধকার ও ঘৃণা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে সঠিক ও পরিপূর্ণ ঈমান দান করেন তাহলে সে এই অন্ধকার ও ঘৃণাকে সহ্য করতে পারবে না। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানুতুবী রহ. বলেন, একবার ভুলক্রমে হারাম আয়ের একটি লোকমা আমার মুখে চলে যায়। এর কারণ এই হয়েছিলো যে, এক ব্যক্তি দাওয়াত করলে তিনি তার ওখানে খানা খেতে যান। পরবর্তীতে জানতে পারেন যে, তার আয় ছিলো হারাম। তিনি বলেন, দুই মাস পর্যন্ত ঐ হারাম খাদ্যের অন্ধকার আমার অন্তরে অনুভব করতাম। এই অন্ধকারের ফলে ঐ দুই মাস অন্তরে বার বার গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকে। কখনো এই গোনাহ করতে মন চাইত, কখনো ঐ গোনাহ করতে মন চাইত। এ সব ছিলো একটি গোনাহের প্রভাব ও অন্ধকার।

গোনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত

আমাদের অন্তরে গোনাহের অন্ধকার এজন্য অনুভূত হয় না যে, আমরা এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি দুর্গন্ধময় ঘর।

তার মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পঁচা জিনিস ঐ ঘরে পড়ে আছে। বাহির থেকে কোনো ব্যক্তি ঐ ঘরে গেলে সেখানে সামান্য সময় দাঁড়ানোও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে, কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ঐ ঘরেই বসবাস করে, তাহলে ঐ দুর্গন্ধ তার অনুভব হবে না। কারণ, সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তার সুগন্ধ আর দুর্গন্ধের বোধশক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে আরামে ঐ বাড়িতে বাস করে। কেউ যদি তাকে বলে, তুমি এমন নোংরা ও দুর্গন্ধ ঘরে বাস করো! তাহলে সে তাকে পাগল বলবে। বলবে, আমি তো খুব আরামে এ বাড়িতে রয়েছি। এখানে কোনো প্রকার কষ্ট নেই। কারণ ঐ ব্যক্তি এই দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঐ দুর্গন্ধ থেকে হেফাজত করেছেন, বরং সুগন্ধ পরিবেশে রেখেছেন, তার অবস্থা তো এমন হবে যে, দূর থেকে সামান্য দুর্গন্ধ আসলেও তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং যাদের আত্মা তাকওয়ার কারণে আয়নার মতো স্বচ্ছ, তারা গোনাহের অন্ধকারকে ও ঘৃণা করেন ও তা খুব বেশি অনুভব করেন। মোটকথা, গোনাহের তৃতীয় বড়ো খারাবি ও পরিণতি অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হওয়া।

গোনাহের চতুর্থ খারাবি বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়া

গোনাহের চতুর্থ খারাবি এই যে, মানুষ যখন গোনাহ করতে থাকে তখন তার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। তার মত উল্টা হয়ে যায়। তার চিন্তা ও বুঝ ভুল পথে পরিচালিত হয়। তখন সে ভালো জিনিসকে খারাপ এবং খারাপ জিনিসকে ভালো মনে করতে আরম্ভ করে। তাকে যদি সঠিক কথাও নরমভাবে বুঝানো হয় তাহলে তা তার মগজে ঢুকবে না। তার সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তার হেদায়েতের কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা অহেতুক কাউকে বিপথগামী করেন না। কোনো মানুষ অব্যাহতভাবে নাফরমানী করতে থাকলে তার অকল্যাণে সঠিক কথা তার বুঝেই আসে না।

গোনাহ শয়তানের বুদ্ধিকে উল্টিয়ে দিয়েছে

দেখুন! ইবলীস শয়তান হলো গোনাহের উৎস, কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, সর্বপ্রথম সেই এই দুনিয়াতে গোনাহ আবিষ্কার করেছে। নিজেও গোনাহে লিপ্ত হয়েছে এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামের মতো মহান

নবীকেও বিপথগামী করেছে। এই গোনাহ করার ফলে তার বুদ্ধি উল্টে গেছে। তাই যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের সামনে সিজদা করার হুকুম দিলেন তখন সে হুকুম না মেনে উল্টা যুক্তি পেশ করতে আরম্ভ করলো যে, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। বাহ্যিকভাবে প্রমাণটি খুব চমৎকার। আগুন উত্তম আর তার তুলনায় মাটি অনুত্তম। কিন্তু তার বুদ্ধিতে ধরেনি যে, আগুনও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং মাটিও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা যখন হুকুম দিচ্ছেন যে, আগুনের উচিত মাটিকে সিজদা করা তাহলে আগুনের শ্রেষ্ঠত্ব কিভাবে থাকলো, আর মাটিই বা অনুত্তম হলো কিভাবে। একথা তার বুঝে আসেনি। পরিণতিতে সে বিতাড়িত হলো। মারদূদ হলো, লাঞ্ছিত হলো। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবার দরজা তো খোলা, মানুষের জন্যও এবং শয়তানের জন্যও। সে যদি বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলাকে বলতো আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দিন। আপনি যা বলেছেন আমি তা করবো, কিন্তু এ কথা বলতে সে আজও প্রস্তুত নয়।

শয়তানের তাওবার শিক্ষণীয় ঘটনা

আমি আমার শাইখের নিকট একটা ঘটনা শুনেছি। যদিও তা বাহ্যত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, তবে ঘটনাটি খুব শিক্ষণীয়। তাহলো যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। তখন পথে শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সে বলে, আপনি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলার জন্য যাচ্ছেন তাই আমার ছোট একটি কাজ করে দিবেন। হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন কি কাজ? শয়তান বললো, এখন তো আমি বিতাড়িত, মারদূদ, মালাউন ও অভিশপ্ত হয়ে গেছি। আমার নাজাতের কোনো পথ দেখছি না। আপনি আল্লাহ তা'আলা কাছে আমার জন্য সুপারিশ করবেন, যেন আমারও তাওবার পথ হয়, নাজাতের কোনো উসিলা হয়। হযরত মূসা আ. বললেন, খুব ভালো। হযরত মূসা আ. তূর পাহাড়ে পৌঁছলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন কথা হলো তখন তিনি শয়তানের বিষয়টি পৌঁছানোর কথা ভুলে গেলেন। চলে আসার সময় আল্লাহ তা'আলা নিজে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাকে কেউ কোনো পয়গাম দিয়েছিলো কি? তখন মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ! হ্যাঁ,

পয়গাম দিয়েছিলো, আমি ভুলে গেছিলাম। আসার পথে আমার ইবলীসের সাথে দেখা হয়। সে খুব অস্থিরতা প্রকাশ করছিলো আর আবেদন করছিলো যে, আমর জন্যও যেন মুক্তির কোনো পথ হয়। হে আল্লাহ! আপনি তো বড়ো দয়ালু, সবাইকে মাফ করে থাকেন। সে তাওবা করছে তাকেও আপনি মাফ করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি কবে বলেছি যে, তাওবার দরজা বন্ধ। আমি তো মাফ করতে প্রস্তুত আছি। তাকে বলুন, তোমার তাওবা কবুল হবে। আর তার পথ হলো, আমি তাকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করো, তখন তুমি আমার কথা মানোনি। এখনও বিষয়টি সহজ। তার কবরে গিয়ে সিজদা করো, আমি তোমাকে মাফ করে দেবো। হযরত মূসা আ. বললেন, ব্যাপারটি তো খুব সহজে সমাধান হলো। এই পয়গাম নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। রাস্তায় শয়তানের সাথে আবার দেখা হলো। জিজ্ঞাসা করলো, আমার মাফের কী ব্যবস্থা হলো? হযরত মুসা আ. তাকে বললেন তোমার ব্যাপারে তো আল্লাহ তা'আলা খুব সহজ পথ বলে দিয়েছেন। তখন তোমার এই ভুল হয়েছিলো যে, আদমকে সিজদা করোনি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আদমের কবরে সিজদা করো তাহলে তোমার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। শয়তান সাথে সাথে উত্তরে বললো, বাহ আমি জীবিতকে সিজদা করি নাই, এখন মৃতকে কিভাবে সিজদা করবো! তার কবরকে কিভাবে সিজদা করবো। এটা আমার দ্বারা হবে না। এই উত্তর এজন্য দিয়েছে যে, তার বুদ্ধি উল্টে গেছে। যাইহোক, গোনাহের বৈশিষ্ট্য হলো, তা মানুষের বুদ্ধিকে উল্টে দেয়, মানুষের মতকে উল্টে দেয়। তখন সঠিক কথা মানুষের বুঝে আসে না।

তোমার হিকমত জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই

কুরআন ও হাদীস সুস্পষ্ট ভাষায় যেসব গোনাহকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, যেসব লোক তাতে লিপ্ত তাদেরকে যদি বলা হয়, এই গোনাহের কাজটা হারাম। তখন সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করতে আরম্ভ করে। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দিতে থাকে। বলে, এই গোনাহকে কেন হারাম করা হয়েছে, এর মধ্যে তো এই উপকার আছে, ঐ কল্যাণ আছে? একে হারাম সাব্যস্ত করার মাঝে কী কল্যাণ আছে? কী হিকমত আছে? তাকে জিজ্ঞাসা করুন, তুমি এই দুনিয়াতে খোদা হয়ে এসেছো, নাকি বান্দা হয়ে? তুমি যদি বান্দা হয়ে এসে থাকো তাহলে নিজের এই প্রশ্নকে নিজের চাকরের প্রশ্নের সাথে তুলনা করে দেখো, যাকে তুমি নিজের বাড়িতে চাকর রেখেছো।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি বাড়ির বাজার করার জন্য একজন চাকর রেখেছেন। আপনি চাকরকে বললেন, বাজারে গিয়ে এতো টাকার অমুক জিনিস ক্রয় করে আনো। এখন চাকর বলতে আরম্ভ করলো, আগে বলুন আমাকে এই সদায় আনতে বলা হচ্ছে কেন? এই পরিমাণ আনতে বলা হচ্ছে কেন? এই অপচয়ের পিছনে কী কল্যাণ আছে? আগে আমাকে এর উত্তর দিন। কোনো চাকর যদি আমাদের কাজের হিকমত আর কল্যাণ জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে কান ধরে বের করে দেওয়ার যোগ্য। চাকুরিচ্যুত করার যোগ্য। কারণ, চাকরের এই অধিকারই নেই যে, সে প্রশ্ন করবে এই জিনিস কেন আনানো হচ্ছে? তাকে চাকর রাখাই হয়েছে এ জন্য যে, তাকে যে কাজের কথা বলা হবে, তা সে করবে। বুঝে আসলেও করবে, বুঝে না আসলেও করবে। কারণ সে চাকর। কাজের কল্যাণ আর রহস্য জিজ্ঞাসা করা চাকরের কাজ নয়।

তুমি চাকর নও বান্দা

এক ব্যক্তিকে আপনি আট ঘণ্টার জন্য চাকর রেখেছেন, সে চাকর আপনার দাস নয়। আপনি তাকে সৃষ্টি করেন নি। সে আপনার বান্দা নয়, আর আপনি তার খোদা নন। সে শুধু বেতনভুক্ত কর্মচারী। সে যদি আপনার কাজের কারণ ও রহস্য জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করে তাহলে তা আপনার সহ্য হয় না। কিন্তু আপনি তো আল্লাহ তা'আলার কর্মচারী নন, কৃতদাস নন, আপনি তো আল্লাহ তা'আলার বান্দা। তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদি আপনাকে কোনো কাজ করতে বলেন আর আপনি বলেন যে, আগে আমাকে কারণ বলুন, রহস্য ও কল্যাণ বলুন, তাহলে আমি এ কাজ করবো। এভাবে রহস্য ও কল্যাণ জানতে চাওয়া তেমনই চরম নির্বুদ্ধিতা, যেমন চরম নির্বুদ্ধিতা ঐ কর্মচারী করছে। বরং তার চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য নির্বুদ্ধিতা। কারণ, ঐ কর্মচারীও মানুষ, আর আপনিও মানুষ। তারও জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, আপনারও জ্ঞান-বুদ্ধি আছে। দুজনের জ্ঞান-বুদ্ধি সমান। কিন্তু কোথায় আল্লাহ তা'আলার রহস্য ও কল্যাণ, আর কোথায় আপনার এই সামান্য বুদ্ধি! এই দুইয়ের মধ্যে কোনো তুলনা হয় না। তারপরও আপনি রহস্য জানতে চাচ্ছেন, কল্যাণ জানতে চাচ্ছেন যে, শরীয়তের এই বিধানের মধ্যে কি কল্যাণ আছে? প্রথমে কল্যাণ বলো, রহস্য বলো, তাহলে আমল করবো, অন্যথায় করবো না। এই দাবির কারণ এই যে, বুদ্ধি উল্টে গেছে। গোনাহের আধিক্য বুদ্ধিকে উল্টে দিয়েছে।

মাহমুদ ও আয়াযের শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন, যা খুবই শিক্ষণীয়। হযরত বলেন, বিখ্যাত বিজয়ী ও সম্রাট মাহমুদ গজনবীর একটি প্রিয় গোলাম ছিলো। তার নাম ছিলো আয়ায। আয়ায যেহেতু বাদশাহের খুব প্রিয় ছিলো, এজন্য মানুষ বলতো, সে খুব অহঙ্কারী। মাহমুদ গজনবী এই গোলামকে অন্য বড়ো বড়ো ব্যক্তিদের উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বাস্তবতাও এমনই ছিলো। মাহমুদ গজনবী বড়ো বড়ো উযীর ও আমীরদের কথা এই পরিমাণ মানতেন না, যেই পরিমাণ আয়াযের কথা মানতেন।

মাহমুদ গজনবী চাইলেন এসব উযীর ও আমীরদেরকে দেখাই, তোমাদের মধ্যে আর আয়াযের মধ্যে কি পার্থক্য? একবার একটি অনেক বড়ো ও মূল্যবান হীরা উপঢৌকন স্বরূপ মাহমুদ গজনবীর কাছে আসে। হীরাটি অত্যন্ত মূল্যবান, অত্যন্ত সুন্দর ও অত্যন্ত জাঁকালো ছিলো। বাদশাহের দরবার বসেছে। সবাই সেই মূল্যবান হীরাটি দেখলো এবং তার প্রশংসা করলো। তারপর মাহমুদ গজনবী ওযীরে আযমকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি হীরাটি দেখেছেন? হীরাটি কেমন? উযীরে আযম বললেন, মহারাজ এটা অত্যন্ত মূল্যবান হীরা। সারা পৃথিবীতে এর মতো হীরা আর নেই। এটা অনেক বড়ো হীরা। বাদশাহ বললেন, হীরাটি মাটিতে ছুড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেলুন। ওযীরে আযম দাঁড়িয়ে করোজোড়ে নিবেদন করলেন, জাহাঁপনা! এটা অনেক মূল্যবান হীরা, এটা আপনার নিকট ঐতিহাসিক উপঢৌকন, আপনি তা ভাঙ্গার নির্দেশ দিচ্ছেন! আমার আবেদন, আপনি এটাকে ভাঙ্গাবেন না। বাদশাহ বললেন, আচ্ছা বসুন। তারপর আরেক উযীরকে ডাকলেন। তাকে বললেন, তুমি এটা ভাঙ্গো। সে উযীরও দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, বাদশাহ সালামত! এটা অনেক দামি হীরা, এটা ভাঙ্গার সাহস আমার হচ্ছে না। এভাবে তিনি অনেক উযীর ও আমীরকে ডেকে হীরাটি ভাঙ্গতে বললেন। কিন্তু সবাই মাফ চাইলো এবং ভাঙ্গতে অপারগতা জানালো।

অবশেষে মাহমুদ গজনবী আয়াযকে ডাকলেন। আয়ায এসে বললো, জি জাঁহাপনা। মাহমুদ গজনবী বললেন, এই যে, হীরাটি রাখা আছে তা ছুড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেলো। আয়ায হীরাটি উঠালো এবং মাটিতে ছুড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেললো। হীরা চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেলো। বাদশাহ যখন দেখলেন, আয়ায

হীরাটি ভেঙ্গে ফেলেছে, তখন তিনি তাকে ধমক দিলেন। তুমি হীরাটি কেন ভাঙ্গলে? এখানে উপবিষ্ট বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান উযীর ও আমীরদেরকে হীরাটি ভাঙ্গতে বলা হলে তারা তা ভাঙ্গার সাহস করেনি। এরা কি পাগল? তুমি তাহলে ভাঙ্গলে কেন? আয়ায প্রথমে বললো, জাহাপনা ভুল হয়েছে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ভাঙ্গলে কেন? আয়ায বললো, আমার অন্তরে চিন্তা জাগলো এটা একটা হীরা। এর মূল্য যতো বেশিই হোক না কেন এটা ভাঙ্গলেও আপনার হুকুম ভাঙ্গা উচিত হবে না। আপনার হুকুমকে হীরার চেয়ে অধিক দামী মনে করে আমি চিন্তা করলাম এই হীরা ভাঙ্গার তুলনায় আপনার নির্দেশ অমান্য করা বেশি খারাপ বিষয়। এজন্য আমি হীরাটি ভেঙ্গে ফেলেছি।

তারপর মাহমুদ গজনবী উযীরদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এই হলো আপনাদের মধ্যে আর আয়াযের মধ্যে পার্থক্য। আপনাদেরকে কোনো কাজের হুকুম দেওয়া হলে তার হিকমত আর রহস্য তালাশ করেন, আর আয়ায হুকুমের গোলাম। তাকে যা বলা হবে, তাই করবে। তার সামনে রহস্য আর কল্যাণের কোনো মূল্য নেই।

বান্দা তো সেই, যে হুকুম পালন করে

মাহমুদ গজনবীর হুকুমের কি মূল্য আছে! তার নিজের বুদ্ধিও সীমিত। তার উযীর ও আয়াযের বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ। এ অবস্থান তো রয়েছে মূলত সেই সত্তার, যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। হীরা ভেঙ্গে যাক, দিল ভেঙ্গে যাক, মানুষের আবেগ-উদ্দীপনা ভেঙ্গে যাক, কামনা-বাসনা ভেঙ্গে যাক, চিন্তা ও কল্পনা ভেঙ্গে যাক, কিন্তু তাঁর হুকুম যেন না ভাঙ্গে। এই মর্যাদা মূলত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। এ কারণে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মধ্যে হিকমত ও রহস্য তালাশ করা নির্বুদ্ধিতা। আর এই নির্বুদ্ধিতার মুল কারণ গোনাহ। যতো গোনাহ করবে, ততো বুদ্ধি উল্টে যাবে। মোটকথা, গোনাহের অকল্যাণে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়।

গোনাহ ছাড়লে নূর লাভ হয়

আল্লাহ তা'আলার দরবারে এসব গোনাহ থেকে সামান্য সময়ের জন্য তাওবা করেই দেখুন! কয়েকদিনের জন্য গোনাহ ছেড়ে দেখুন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কেমন নূর ও বরকত লাভ হয়! তখন এমন সব কথা

বুঝে আসবে, যা পূর্বে বুঝে আসতো না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হারাম করা গোনাহ থেকে বাঁচো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার একটি নিক্তি সৃষ্টি করবেন। যা সুস্পষ্টভাবে তোমাদেরকে বলে দিবে, এটা হক এটা বাতিল। এটা ঠিক, এটা ভুল। আজ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যও মিটে গেছে। কারণ, আমরা গোনাহ করে নিজেদের বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছি।

গোনাহের পঞ্চম ক্ষতি বৃষ্টি বন্ধ হওয়া

গোনাহের পঞ্চম ক্ষতি এই যে, গোনাহের আসল শাস্তি তো আখেরাতে হবে তবে এই দুনিয়াতেও গোনাহের অশুভ প্রভাব গোনাহগারের জীবনের উপর পতিত হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।

গোনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি রোগ সৃষ্টি হওয়া

গোনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি এই যে, মানুষের মধ্যে যখন অশ্লীলতা, নগ্নতা ও অপকর্ম বিস্তার লাভ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সব ব্যাধিতে আক্রান্ত করেন, যেগুলো সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষ কখনো শোনেনি যে, এমন রোগও হয়ে থাকে। এ হাদীসকে সামনে রেখে এইডস রোগের দিকে লক্ষ করুন, আজ সারা পৃথিবীতে যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বে বলে গেছেন এমন সব রোগ দেখা দিবে। প্রত্যেক গোনাহের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর বর্হিপ্রকাশ এই দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেগুলো চোখের সামনে দেখিয়ে দেন। গোনাহের অশুভ পরিণতি এভাবে আচ্ছন্ন করে।

গোনাহের সপ্তম ক্ষতি খুন-খারাবি

হাদীস শরীফে আছে,

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ، فَقِيْلَ: كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: اَلْهَرْجُ، اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ.

'শেষ জামানায় এমন এক সময় আসবে, যখন খুন-খারাবির বিস্তার ঘটবে। মানুষ হত্যা করা হবে, কিন্তু হত্যাকারীও জানবে না কেন সে হত্যা করলো এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না কি কারণে তাকে হত্যা করা হলো? তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামে যাবে।'[১]

আগের জামানায় কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটলে জানা যেতো যে, শত্রুতা ছিলো এজন্য হত্যা করা হয়েছে।

হাদীসটি পড়ুন আর বর্তমান যুগে যে সব হত্যাকাণ্ড ঘটছে সেদিকে দেখুন, মানুষ কিভাবে মরছে! আজ যদি কেউ নিহত হয় আর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন হত্যা করা হয়েছে, কে হত্যা করেছে, তাহলে কারো কাছে তার উত্তর নেই। মনে হয় যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বে বর্তমান যুগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এ কথা বলেছেন। এগুলো আমাদের পাপের ফল ও বদ আমলের পরিণতি। গোনাহের আধিক্য এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

খুন-খারাবির একমাত্র সমাধান

আজ আমরা এ সমস্ত হত্যাকাণ্ড ও খুন-খারাবির বিভিন্ন সমাধান খুঁজছি। কেউ বলছে রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন এবং কেউ বলছে পারস্পরিক আলোচনার প্রয়োজন। বিভিন্ন উপায় আমরা তালাশ করছি। কিন্তু আমাদের জানা নেই যে, এ সব বিপর্যয়ের মূল কারণ গোনাহের বিস্তার ঘটা। কোনো জাতির মধ্যে যখন গোনাহের বিস্তার ঘটে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের বদ আমলের পরিণতি স্বরূপ এই অবস্থার বিস্তার ঘটানো হয়। এজন্য সেদিকে মনযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুস্থ বুদ্ধি দান করুন। এসব গোনাহ ছাড়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের প্রথম কাজ আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজেদের সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করা। বদ আমলের পরিণতি থেকে পানাহ চাওয়া। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কর্মের অশুভ পরিণতি দূর করে দিন।

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫১৭৮

ওযীফার চেয়ে গোনাহ ছাড়ার বিষয়ে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত

মোটকথা, অধিক নফল ইবাদতে নিমগ্ন তো ভালো কাজ, কিন্তু এর চেয়ে অধিক জরুরী কাজ হলো গোনাহ থেকে বাঁচা। আমার কাছে প্রতিদিন অনেক মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের ফোন আসে যে, অমুক কাজের দু'আ বলে দিন, অমুক উদ্দেশ্য সাধনের দু'আ বলে দিন। কতক মহিলার ধারণা প্রত্যেক উদ্দেশ্য সাধনের পৃথক দু'আ রয়েছে, পৃথক ওযীফা আছে। আরে ভাই! এসব দু'আ ও ওযীফার ফযীলত রয়েছে, কিন্তু যাতে গোনাহ না হয় এ বিষয়ে অধিক যত্নশীল হওয়া দরকার। নিজেও গোনাহ থেকে বাঁচুন, নিজের পরিবার-পরিজন এবং সন্তানদেরকেও গোনাহ থেকে বাঁচান। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত মনে রাখবেন এসব ওযীফা কোনো কাজে আসবে না। ওযীফা তখন কাজে আসে, যখন অন্তরে গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির ও তার উদ্দীপনা থাকে। গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যখন গুরুত্ব থাকে তখন এ সমস্ত ওযীফা ও দু'আর দ্বারা অন্তরে শক্তি ও সাহস সঞ্চার হয়। ফলে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়। কিন্তু যদি গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টা না থাকে, গাফলতীর মধ্যে সময় কাটে, সাথে ওযীফা ও নফল চলতে থাকে, তখন এসব ওযীফা দ্বারা কোনো ফায়দা হয় না।

গোনাহের উপর সমীক্ষা চালান

সারকথা হলো, আমাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টা করতে হবে। নিজের জীবনের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমীক্ষা চালাতে হবে। গোনাহের তালিকা তৈরী করতে হবে। কোন কোন কাজ আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে হচ্ছে। তারপর দেখতে হবে যে, এ সমস্ত গোনাহের মধ্যে থেকে কোন কোন গোনাহ অবিলম্বে ছাড়া সম্ভব, সেগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে ছেড়ে দিবে। যে সমস্ত গোনাহ ছাড়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিজের সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা ও ইসতিগফার করবে। আল্লাহ দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বাঁচার সাহস ও তাওফীক দান করুন।

তাহাজ্জুদগুজার থেকে অগ্রগামী হওয়ার উপায়

এক হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যে ব্যক্তির বাসনা রয়েছে যে, আমি ইবাদতগুজার ও তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তির চেয়ে অগ্রগামী হবো, সে যেন নিজেকে গোনাহ থেকে দূরে রাখে। যেমন আমরা আল্লাহ ওয়ালাদের জীবনীতে পড়ি যে, তারা সারারাত ইবাদত করতেন, এতো রাকাত নফল নামায পড়তেন, এতো পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন, এখন কেউ যদি চায় যে, আমি ঐ ইবাদতগুজার ব্যক্তির চেয়ে অগ্রগামী হবো, তাহলে সে যেন নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। গোনাহ থেকে বাঁচার কারণে ইনশাআল্লাহ তারাও মুক্তি লাভ করবে, আপনিও মুক্তি লাভ করবেন। তারাও যদি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন তাহলে এতটুকু মাত্র পার্থক্য হবে যে, তারা উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবেন আর আপনি হবেন নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু মুক্তি লাভের ব্যাপারে উভয়ে সমান হবেন। আর যদি কোনো ব্যক্তি ইবাদতও করতো সাথে গোনাহের কাজও করতো তাহলে আপনি তার চেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবেন। কারণ, আপনি নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়েছেন।

মুমিন ও তার ঈমানের দৃষ্টান্ত

অপর একটি হাদীস হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন মুমিন এবং তার ঈমানের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি ঘোড়া লম্বা রশি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাধা রয়েছে, যার ফলে ঐ ঘোড়া ঘুরতে থাকে কিন্তু একটি সীমানায় গিয়ে ঐ খুঁটি তাকে আটকিয়ে ফেলে। ঐ ঘোড়া সামান্য চক্কর দিয়ে আবার ফিরে এসে ঐ খুঁটির নিকট বসে পড়ে। এভাবে ঐ খুঁটি দুটি কাজ করে। একটি হলো, সে ঘোড়াকে বিশেষ একটি সীমানা থেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। দ্বিতীয় হলো, ঐ খুঁটি ঘোড়াটির আশ্রয়স্থল হয়। ঘোড়া এদিক সেদিক চক্কর লাগিয়ে আবার ঐ খুঁটির কাছে এসেই বসে পড়ে।[১]

এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের খুঁটি হলো তার ঈমান। ঈমানের দাবি হলো, মুমিন ব্যক্তি একটি সীমা পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরবে, চক্কর দিবে, কিন্তু সীমার চেয়ে

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১০৯০৭

আগে বাড়তে চাইলে ঈমান তার রশি টেনে ধরবে। এদিক সেদিক ঘোরার পর অবশেষে মুমিন ব্যক্তি তার ঈমানের খুঁটির কাছে ফিরে আসবে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, মুমিন ব্যক্তির ঈমান এতো শক্তিশালী হয় যে, সে তাকে গোনাহ করতে দেয় না। কখনো ভুলে গোনাহ হয়ে গেলে ফিরে আবার সে ঈমানের খুঁটির কাছে চলে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের এই খুঁটিকে শক্তিশালী করে দিন।

গোনাহ লিখতে বিলম্ব করা হয়

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুজন ফেরেশতা রয়েছে। একজন নেকী লেখে, আরেকজন বদী লেখে। আমি আমার শাইখ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব (কু.সি.) থেকে শুনেছি যে, নেকী লেখক ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, মানুষ যখন নেক কাজ করে তখন সাথে সাথে তা লিখে ফেলবে। আর বদী লেখক ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, মানুষ গোনাহের কাজ করলে তা লেখার পূর্বে নেকী লেখক ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করবে, লিখবো কি লিখবো না? নেকী লেখক ফেরেশতা যেন তার আমীর। সুতরাং মানুষ যখন কোনো গোনাহ করে, তখন বদী লেখক ফেরেশতা নেকী লেখক ফেরেশতার কাছে জিজ্ঞাসা করে, লিখবো কি লিখবো না? নেকী লেখক ফেরেশতা বলে, না এখনই লিখো না। কারণ, এ ব্যক্তি তাওবা করতে পারে, ইস্তিফগার করতে পারে। তাহলে লেখার আর প্রয়োজনই হবে না। ঐ ব্যক্তি যদি আবারো গোনাহ করে এবং পূর্বের গোনাহ থেকে তাওবা না করে, তখন আবারও জিজ্ঞাসা করে, এখন লিখি? নেকী লেখক ফেরেশতা বলে, না আরেকটু দেরি করো। তারপর যখন তৃতীয়বার গোনাহ করে তখন আবারো জিজ্ঞাসা করে, লিখবো কি লিখবো না? তখন নেকী লেখক ফেরেশতা বলে, হ্যাঁ, এখন লিখো। তারপর ঐ গোনাহ তার আমলনামায় লেখা হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি এতো সহজ ব্যবস্থা করেছেন। নেককাজ তো সাথে সাথে লেখা হয়, কিন্তু গোনাহের কাজ লিখতে বিলম্ব করা হয়, হয়তো সে তাওবা করবে।

যেখানে গোনাহ করেছেন, সেখানেই তাওবা করুন

এ কারণে বুযুর্গগণ বলেন, যখনই কোনো গোনাহ সংঘটিত হবে, তখনই অবিলম্বে তাওবা ও ইস্তেগফার করবে। যাতে করে এ গোনাহ তোমার আমল

নামায় লেখাই না হয়। বুযুর্গগণ আরো বলেন, যেই জায়গায় গোনাহ করেছো, সেই জায়গাতেই অবিলম্বে তাওবা ও ইস্তিগফার করো। যাতে করে কিয়ামতের দিন যখন ঐ জায়গা তোমার গোনাহের সাক্ষ্য দিবে, সাথে সাথে যেনো তোমার তাওবারও সাক্ষ্য দেয়। এ ব্যক্তি আমার বুকের উপর গোনাহ করেছিলো, পরবর্তীতে আমার বুকের উপর তাওবাও করেছিলো। এগুলো হলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের উপর আমল যে, ঈমান মুমিনের খুঁটি স্বরূপ। মুমিন যখন এদিক সেদিক চলে যায়, তখন ঘুরে ফিরে আবার নিজের খুঁটির কাছেই চলে আসে।

গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিন

এজন্য প্রথমত গোনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা-চেষ্টা করবে। চিন্তা চেষ্টা ছাড়া গোনাহ থেকে বাঁচা যায় না। চিন্তা-চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো অপারগতার কারণে বা ভুল ক্রমে গোনাহ হয়ে গেলে অবিলম্বে তাওবা করুন। ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। এভাবে করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলার রহমতের কাছে আশা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এই গোনাহ মাফ করে দিবেন। উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব সবচেয়ে বড়ো আপদের কথা। মানুষের মধ্যে চিন্তা-চেষ্টা থাকবে না এবং গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি মনযোগ থাকবে না, বরং গোনাহের কারণে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেই তা সঠিক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে, এটা অত্যন্ত মারাত্মক ও বিপজ্জনক অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা অমাকে এবং আপনাদের সকলকে গোনাহের আপদ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহর ভয় গোনাহের প্রতিষেধক*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ[১]

যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পেলো- একদিন তাকে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে, নিজের একেকটি আমলের জওয়াব দিতে হবে, এই ভয় পোষণ করলো- তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। এ আয়াতের তাফসীরে বিখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, এ আয়াতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার অন্তরে কোনো গোনাহের কাজ করার ইচ্ছা জাগলো আর সাথে সাথে সে আল্লাহর কথা চিন্তা করলো। স্মরণ করলো যে, একদিন আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এ কথা স্মরণ হওয়ার পর সে ঐ গোনাহের ইচ্ছা ত্যাগ করলো, ঐ গোনাহ করলো না। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য দুটি জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩৬-১৬৯, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা আর রহমান, আয়াত-৪৬

এর নাম 'তাকওয়া'

এর আরো তাফসীর করে বলেন, এক ব্যক্তি নির্জনে অবস্থান করছে। তাকে দেখার মতো সেখানে কেউ নেই। সেখানে কোনো গোনাহ করতে চাইলে বাহ্যিকভাবে কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। সেই নির্জন জায়গায় তার অন্তরে গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হলো। কিন্তু সে চিন্তা করলো যে, কোনো মানুষ যদিও আমাকে দেখছে না, কিন্তু আমার আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন। একদিন আমাকে তার সামনে দাঁড়াতে হবে। এ কথা চিন্তা করে সে ঐ গোনাহের কাজ ছেড়ে দিলো। এমন ব্যক্তির জন্যই এ আয়াতে দুই জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। আর এরই নাম তাকওয়া। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করে নিজের প্রবৃত্তির শক্তিশালী ও সুদৃঢ় চাহিদাকে ত্যাগ করার নামই তাকওয়া। সে চিন্তা করে যে, দুনিয়ার মানুষ যদিও আমাকে দেখছে না, কিন্তু একজন আমাকে ঠিকই দেখছেন। সমস্ত তরীকত ও শরীয়তেরও সার-নির্যাস এটাই যে, অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে যে, আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় করলো বা আযাবকে ভয় করলো বা আগুনকে ভয় করলো বরং বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করলো। যার অর্থ এই যে, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। সে চিন্তা করে, এ গোনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা আযাব দেন বা না দেন, কিন্তু আমি আল্লাহর সামনে এই গোনাহ করে কিভাবে দাঁড়াবো? যার অন্তরে কারো প্রতি সমীহ থাকে, তার মারার বা শাস্তি দেওয়ার ভয় না থাকলেও এই সমীহের কারণে তার অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় যে, তার সন্তুষ্টির পরিপন্থী কাজ করে তার সামনে গিয়ে আমি কিভাবে তাকে মুখ দেখাবো? এই ভয়ের নাম তাকওয়া।

আমার অন্তরে আমার ওয়ালেদ মাজেদের প্রতি সমীহ

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. সারাজীবনে এক-দুইবার ছাড়া আমাকে কখনো মারেননি। এক-দুইবার তার থাপ্পড় খাওয়ার কথা মনে আছে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থা এমন ছিলো যে, তার কামরার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় পা কেঁপে উঠতো যে,

আমি কার নিকট দিয়ে যাচ্ছি? এমনটি কেন হতো? কারণ, আমার অন্তরে এই চিন্তা ছিলো যে, তার চোখের সামনে আমার এমন কোনো কাজ যেন ধরা না পড়ে যা তার মর্যাদা, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার আদবের পরিপন্থী। একজন মানুষের জন্য যদি অন্তরে এমন শ্রদ্ধাবোধ থাকতে পারে, তাহলে বিশ্বজগতের স্রষ্টা, যিনি সবকিছুর খালেক এবং মালেক তার ব্যাপারে অন্তরে এই শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই থাকা উচিত যে, মানুষ ভয় করবে আমি তার সামনে এমন কাজ এবং এমন গোনাহ করে কিভাবে দাঁড়াবো, তাকে কিভাবে মুখ দেখাবো? এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى

'আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিলো এবং নিজের প্রবৃত্তিকে মন্দ চাহিদা থেকে বাধা দিয়েছিলো।'[১]

দেখুন জাহান্নাম এবং আযাবকে এই জন্য ভয় করতে হবে যে, তা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধের প্রকাশস্থল। আসল ভয় তো হতে হবে আল্লাহর শ্রদ্ধার কারণে। এক আরব কবি বলেন,

لَا تَسْقِنِيْ مَاءَ الْحَيَاةِ بِذِلَّةٍ

بَلْ تَسْقِنِيْ بِالْعِزِّ كَأْسَ الْحَنْظَلِ

'আমাকে লাঞ্ছিত করে আবেহায়াতও পান করিও না। অর্থাৎ, আমি অপমানিত হয়ে আবেহায়াত পান করতেও রাজি নই। আমাকে তিতা জিনিস পান করাও, কিন্তু সম্মানের সাথে পান করাও।'

মোটকথা, যার অন্তরে আল্লাহর মারেফত রয়েছে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে চায়। আর যেহেতু জাহান্নাম ও আযাব আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রকাশস্থল, এজন্য তাকেও ডরায়। অন্যথায় আসল ভয়ের জিনিস তো হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

দুধের মধ্যে পানি মেশানোর ঘটনা

ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাযি. তাঁর খেলাফত কালে মানুষের অবস্থা জানার জন্য রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতেন। কারো সম্পর্কে যদি জানতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি উপবাসে আছে তাহলে তার সাহায্য

---

১. সূরা নাযে'আত, আয়াত-৪০

করতেন। যদি জানতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ তাহলে তার বিপদ দূর করতেন। কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে তাকে সংশোধন করতেন। একদিন তিনি তাহাজ্জুদের সময় মদীনার অলীগলিতে ঘুরছিলেন। এমন সময় এক ঘর থেকে দুই মহিলার কথার আওয়াজ এলো। আওয়াজে বোঝা গেলো, তাদের একজন বুড়ি এবং একজন যুবতি। বুড়ি মহিলা তার যুবতি মেয়েকে বলছে, তুমি যেই দুধ দোহন করেছো তার মধ্যে পানি মেশাও। তাহলে দুধ বেড়ে যাবে। বেশি দুধ বিক্রয় করতে পারবে। মেয়ে উত্তর দিলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাযি. নির্দেশ জারি করেছেন, কেনো দুধ বিক্রেতা যেন দুধের মধ্যে পানি না মেশায়। তাই আমাদের পানি মেশানো উচিত নয়। উত্তরে মা বললো, আমীরুল মু'মিনীন তো এখানে বসে নেই। তুমি দুধের মধ্যে পানি মেশালে কে দেখবে? এখন অন্ধকার রাত, দেখার মতো কেউ নেই। তিনি তো তার বাড়িতে অবস্থান করছেন। তিনি কি করে জানতে পারবেন তুমি পানি মিশিয়েছো? উত্তরে মেয়ে বললো, আম্মাজান! আমীরুল মু'মিনীন তো দেখছেন না, কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের শাসক আল্লাহ তা'আলা দেখছেন, তাই এ কাজ আমি করবো না।

দরজার বাইরে হযরত ওমর রাযি. তাদের এ কথাবার্তা শুনছিলেন। সকাল বেলা তিনি তথ্য সংগ্রহ করলেন এ মহিলা কে এবং এই মেয়ে কে? তথ্য সংগ্রহ করার পর ঐ মেয়ের সঙ্গে তার ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। এবং ঐ মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিবাহ করালেন। এই বিবাহের ফলে ঐ মেয়ের বংশে তার নাতি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয জন্ম গ্রহণ করেন। যাকে মুসলিমদের পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলা হয়। যাইহোক, ঐ মেয়ের অন্তরে এ কথা জাগে যে, যদিও আমীরুল মু'মিনীন দেখছেন না, কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন। নির্জন নিরিবিলি জায়গায় রাতের অন্ধকারে অন্য কেউ না দেখলেও আল্লাহ তা'আলা ঠিকই দেখছেন। এরই নাম হলো 'তাকওয়া'।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কিছু সঙ্গী সহ মদীনা শরীফের বাইরে কোনো এক অঞ্চলে যান। এক ছাগলের রাখাল তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। সে রোযা রেখেছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. তার দ্বীনদারি পরীক্ষা করার জন্য তাকে বললেন যে, এই ছাগল

পাল থেকে যদি একটি ছাগল তুমি আমার কাছে বিক্রি করো তাহলে তার মূল্যও তোমাকে পরিশোধ করবো এবং এই পরিমাণ গোস্তও তোমাকে দেবো যা দিয়ে তুমি ইফতার করতে পারবে। উত্তরে সে বললো, এই ছাগলগুলো আমার নয়, আমার মনিবের। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি বললেন, তার একটি ছাগল যদি হারিয়ে যায় তাহলে সে কী করবে? এ কথা শুনতেই রাখাল মুখ ঘুরিয়ে নিলো এবং আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বললো,

فَأَيْنَ اللّٰهُ؟ 'আল্লাহ কোথায় গেছেন? এ কথা বলে সে রওয়ানা হয়ে গেলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. রাখালের এই বাক্য আওড়াতে থাকলেন। মদীনা শরীফ গিয়ে রাখালের মনিবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তার থেকে ছাগলগুলো কিনে নিলেন, এবং রাখালকেও কিনে নিলেন। তারপর রাখালকে মুক্ত করে দিয়ে সবগুলো ছাগল তাকে উপঢৌকন দিলেন।[১]

অপরাধ নির্মূল করার উত্তম পন্থা

মনে রাখবেন! যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে সেই অনুভূতি না জাগবে যা ঐ রাখালের অন্তরে ছিলো যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে অপরাধ নির্মূল হতে পারে না। অন্যায় ও অরাজকতা বিলুপ্ত হতে পারে না। অপরাধ নির্মূলের জন্য পুলিশের পাহারা বসানো হোক, বিভিন্ন অধিদপ্তর খোলা হোক, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কারণ পুলিশ ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বেশির চেয়ে বেশি দিনের আলোতে ও লোকালয়ে মানুষকে অপরাধ থেকে বাধা দিতে পারে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে এবং বনের নির্জনতায় অপরাধীকে বাধা দেওয়ার জিনিস মাত্র একটিই আর তা হলো আল্লাহর ভয়। এছাড়া অন্য কোনো জিনিসই বাধা দিতে পারে না। এই ভয় যখন আত্মা থেকে মিটে যায় তখন সমাজের পরিণতি মারাত্মক খারাপ হয়। আজ দেখুন! অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশের পর পুলিশ দেয়া হচ্ছে, অধিদপ্তরের পর অধিদপ্তর বানানো হচ্ছে, আইনের পর আইন বানানো হচ্ছে, কিন্তু আইন আজ বাজারে পানির মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। আদালত কাজ করছে, পুলিশ কাজ করছে, দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করছে, এগুলোর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে, অপরদিকে ঘুষের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঘুষ বন্ধের জন্য যেই কমিশন

১. উস্‌দুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৮

গঠন করা হয়েছে তারাই ঘুষের শিকার। কতো আর এসব অধিদপ্তর ও কমিশন প্রতিষ্ঠিত করবে। সব আইন ও সব ব্যবস্থা ভাঙ্গার ব্যবস্থা রয়েছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো ফর্মূলা আবিষ্কৃত হয়নি যা অপরাধ নির্মূল করতে পারে। হ্যাঁ, আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের ফিকির এমন এক জিনিস যার মাধ্যমে অপরাধ নির্মূল হতে পারে, জুলুম-অত্যাচার বন্ধ হতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভয় ও অনুভূতিই সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে জাগ্রত করেছিলেন। এর ফলে কারো দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন এবং নিজের উপর শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাকুতি মিনতি করে মাফ না চাওয়া পর্যন্ত এবং তাওবা না করা পর্যন্ত তারা শান্তি পেতেন না। অপরাধী নিজে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিজের উপর শাস্তি বাস্তবায়ন করাতো। বলতো, হে আল্লাহর রাসূল! যে কোনো উপায়ে হোক আমাকে পাক করুন। এজন্য যে পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং আখারাতের ফিকির না জন্মাবে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি না জাগবে সে পর্যন্ত দুনিয়া থেকে অপরাধ নির্মূল হতে পারে না। এর জন্য যতো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন।

আমাদের আদালত ও মামলা-মোকদ্দমা

কয়েক বছর ধরে আদালতের সাথেও আমার সম্পর্ক রয়েছে। আইন অনুপাতে চুরি ডাকাতির যতো মামলা রয়েছে তার শেষ আপিল আমাদের আদালতে আসার কথা। কিন্তু প্রথম তিন বছর এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, এ সময়ে চুরি ডাকাতির কোনো মোকদ্দমাই আমাদের আদালতে আসে না। আমি তো অবাক। পরবর্তীতে আমি তথ্য সংগ্রহ করি যে, এ সময়ে আমাদের এখানে চুরি ডাকাতির কি পরিমাণ মামলা এসেছে? তখন জানতে পারি যে, মাত্র তিন চারটি মামলা এসেছে। আমি বললাম, কেউ যদি এই সংখ্যা দেখে যে, এ দেশে তিন বছরে সুপ্রিম কোর্টে চুরি ডাকাতির মাত্র তিন চারটি মামলা দায়ের হয়েছে তাহলে সে মনে করবে যে, এটা তো ফেরেশতাদের জনপদ। এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে যদি পত্রিকা পড়া হয় তাহলে

জানা যায় যে, চুরি ডাকাতির শত শত ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম চুরি ডাকাতির এসব কেস নিচেই চূড়ান্ত হয়ে যায়। মামলা উপরে উঠার কোনো সুযোগ আসে না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

তিন বছর পর ডাকাতির যেই মামলাটি আমার কাছে আসে, সেটি ছিলো এই যে, এক ব্যক্তি কুয়েতে চাকুরি করতো। ছুটিতে করাচী এসে এয়ারপোর্ট থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া নেয়। ট্যাক্সিতে সামানপত্র নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। পথে বাহাদুরাবাদের চৌরঙ্গীতে অশ্বারোহী পুলিশের একটি বাহিনী যাচ্ছিলো। রাত তখন তিনটা বাজে। পুলিশের বাহিনী ট্যাক্সিটি দাঁড় করায়। জিজ্ঞাসা করে কোত্থেকে আসছো এবং কোথায় যাচ্ছো। লোকটি উত্তর দেয় কুয়েত থেকে আসছি এখন এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি যাচ্ছি। পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, তুমি সেখান থেকে কি কি সামানা এনেছো? সে উত্তর দেয়, যেই সামানা এনেছি কাস্টমের লোকেরা তা যাচাই করেছে। এর সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? অবশেষে এক পুলিশ বন্দুক তাক করে বলে, তোমার কাছে যা আছে তা দিয়ে দাও।

এই প্রথম মামলা আমার কাছে আসে। যেই পুলিশ চুরি ডাকাতি থেকে বাঁচানোর জন্য টহল দিচ্ছিলো সেই পুলিশ বন্দুক তাক করে অন্যের মাল ছিনিয়ে নিচ্ছে। যারা আইনের রক্ষক এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকারী তারাই নিরাপত্তা হরণ করছে। এর একমাত্র কারণ আত্মা থেকে আল্লাহর ভয় মিটে গেছে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ ভুলে গেছে যে, আমাকে একদিন মরতে হবে এবং মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন আসছে। সেখানে আমার সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। এর ফলে আজ খুন-খারাবি, নিরাপত্তাহীনতা, অশান্তি ও অস্থিরতা আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে।

শয়তান কীভাবে বিপথগামী করে

মনে রাখবেন! এই অনুভূতি মুহূর্তেই বিলুপ্ত হয়ে যায় না, বরং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। তা এভাবে যে, শয়তান মানুষকে ভুল পথে নেওয়ার জন্য প্রথমেই বড়ো গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। উদাহরণস্বরূপ, শয়তান প্রথমবারেই কোনো মানুষকে এ কথা বলে না যে, তুই গিয়ে ডাকাতি কর। কারণ, তাহলে মানুষ তৎক্ষণাৎ তা অস্বীকার করবে। বলবে, ডাকাতি করা

খুব খারাপ কাজ, আমি তা করবো না। বরং শয়তান মানুষকে প্রথমে ছোট ছোট গোনাহে লিপ্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, তাকে বলে নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টিপাত করো, এতে মজা লাগবে। যখন ধীরে ধীরে ছোট গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন শয়তান তাকে বলে যে, অমুক গোনাহ যখন করেছিলে তখন তো মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়নি, আল্লাহ তা'আলার কাছে যাওয়ার কথা স্মরণ হয়নি, তাই এখন দ্বিতীয় গোনাহটিও করো। এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যখন ছোট ছোট গোনাহে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন শয়তান তাকে বলে, এতগুলো গোনাহ যেহেতু তুমি করেছো, এবার বড়ো একটা গোনাহ করলে সমস্যা কি? এভাবে ধীরে ধীরে সে মানুষকে বড়ো বড়ো গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

যুবকদেরকে টিভি নষ্ট করে দিয়েছে

বর্তমানে আপনারা দেখছেন, যুবকরা হাতে পিস্তল নিয়ে ঘুরছে। পিস্তল দেখিয়ে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে, কারো প্রাণ হরণ করছে, কারো মাল লুট করছে। এ সব কাজ কি আগে করতো? জবাব হলো, না। এর সূচনা এভাবে হয়েছে যে, প্রথমে তরুণদেরকে বলা হয়েছে, সারা দুনিয়া টিভি দেখছে, তুমিও দেখো। ফিল্ম দেখো। এভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে এর প্রভাব তাদের মস্তিষ্কে বসে গেছে। একবার যখন এই দুঃসাহস হয়েছে যে, আল্লাহকে ভুলে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর অনুভূতি আত্মা থেকে বিলুপ্ত করে আমি এই গোনাহের কাজ করছি, ফিল্ম দেখছি, তাই এবার আরেকটু সম্মুখে অগ্রসর হই। শয়তান অন্তরে একথা ঢেলে দেয় যে, অমুক সিনেমায় তুমি অমুক দৃশ্য দেখেছিলে, এবার তুমি নিজেও তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করো। এভাবে ধীরে ধীরে তাকে বড়ো বড়ো গোনাহে লিপ্ত করে।

ছোট গোনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তি বড়ো গোনাহ করে থাকে

মনে রাখবেন! বড়ো গোনাহ সবসময় ছোট গোনাহের পর হয়ে থাকে। শয়তানের পক্ষ থেকে প্রথমে ছোট গোনাহ করার দুঃসাহস করানো হয়। তারপর ধীরে ধীরে তাকে বড়ো গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। বর্তমানে যুবকদের অন্তরে চিন্তা জাগ্রত হয়েছে যে, আমাদেরকে চিরদিন এই দুনিয়ায় থাকতে হবে, এখান থেকে কখনোই যেতে হবে না। কারণ, গোনাহে অভ্যস্ত

হওয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলার সামনে জওয়াব দেওয়ার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই বড়ো থেকে বড়ো গোনাহের রাস্তা সুগম হয়েছে। দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এবার যেই গোনাহের ইচ্ছা হয় তা-ই করাও। আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে,

اَلشَّرُّ يَبْدَأُهُ فِي الْأَصْلِ أَصْغَرُهُ

অর্থাৎ, বড়ো খারাপ কাজের সূচনা সবসময় ছোট খারাপ কাজ থেকে হয়ে থাকে। সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলে উঠে। এজন্য কখনো কোনো গোনাহকে ছোট মনে করে করবে না যে, এটা তো ছোট গোনাহ; ঠিক আছে করে ফেলি। কারণ, এটা শয়তানের আধার। সে আপনাকে তার জালে ফাঁসানোর জন্য এবং আপনার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য এবং আপনার আত্মা থেকে আল্লাহ তা'আলার ভয় ও আখেরাতের ফিকির মুছে ফেলার জন্য আপনার সামনে এই আধার দিয়েছে। তাই গোনাহ ছোট হোক বা বড়ো, আল্লাহর ভয়ে তা ত্যাগ করুন।

এই গোনাহ সগীরা, না কবীরা?

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, মানুষ খুব আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক গোনাহটি সগীরা, না কবীরা? এভাবে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, সগীরা গোনাহ হলে করবে। আর কবীরা হলে তা করতে কিছুটা ভয় অনুভব হয়। হযরত বলতেন, সগীরা ও কবীরা গোনাহের দৃষ্টান্ত হলো একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও একটি বড়ো অঙ্গার। কাউকে কি কখনো দেখেছেন, ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ছোট মনে করে সিন্দুকের ভিতর রেখে দিয়েছে? কোনো বুদ্ধিমান মানুষ এ কাজ করবে না। কারণ, সিন্দুকের মধ্যে রাখার পর তা আগুনে পরিণত হবে। সিন্দুকের সবকিছু জ্বালিয়ে দিবে এবং সিন্দুককেও জ্বালিয়ে দিবে। বরং পুরো বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গোনাহের অবস্থাও একই। গোনাহ ছোট হোক, বা বড়ো; তা আগুনের স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। স্বেচ্ছায় যদি তুমি একটি গোনাহ করো তাহলে হতে পারে ঐ একটি গোনাহ তোমার সারা জীবনের পুঁজিকে ভস্ম করে দিবে। এজন্য এই চিন্তায় পড়ো না যে, গোনাহ ছোট না বড়ো। বরং এটা দেখো যে, গোনাহ কি না? এ কাজ নাজায়েয কি না? আল্লাহ তা'আলা এটা নিষেধ করেছেন কি না? যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা এটা নিষেধ করেছেন, তখন আল্লাহর সামনে জওয়াব

দেওয়ার অনুভূতিকে জাগ্রত করে চিন্তা করো যে, এই গোনাহ করে আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে কিভাবে মুখ দেখাবো? মোটকথা, এই আয়াতের ফযীলত লাভ করার পদ্ধতি এই যে, যখনই মানুষের অন্তরে গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হবে, তখনই আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা অন্তরে চিন্তা করবে এবং এর মাধ্যমে গোনাহ ছেড়ে দিবে।

গোনাহের চাহিদা হলে এ কথা চিন্তা করুন!

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন, মানুষ যদি আল্লাহর কথা চিন্তা করতে চায় তাহলে অনেক সময় আল্লাহর চিন্তা ও কল্পনা অন্তরে আসতে চায় না। কারণ, মানুষ তো কখনো আল্লাহকে দেখেনি। আর কল্পনা করা যায় এমন জিনিসের, যাকে মানুষ দেখেছে। এ কারণে আল্লাহর কথা কল্পনা করতে কষ্ট হয়। এজন্য যখন গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হবে তখন অন্য একটি জিনিসের কথা কল্পনা করবে। আর তা হলো, আমি যেই গোনাহ করার ইচ্ছা করছি ঐ গোনাহ করার সময় যদি আমার বাবা আমাকে দেখে বা আমার সন্তান আমাকে দেখে বা আমার ওস্তাদ আমাকে দেখে বা আমার ছাত্র আমাকে দেখে বা আমার বন্ধু-বান্ধব আমাকে দেখে, তাহলে তখনও কি এই গোনাহের কাজ আমি করবো?

উদাহরণস্বরূপ, নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টিপাত করার চিন্তা অন্তরে জাগছে। তখন চিন্তা করবে যে, এ সময় যদি আমার শাইখ আমাকে দেখেন বা আমার বাবা আমাকে দেখেন বা আমার সন্তান আমাকে দেখে তাহলে কি তখনও নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টিপাত করবো। বলাবাহুল্য যে, দৃষ্টিপাত করবো না। কারণ, আমার ভয় রয়েছে যে, এদের কেউ যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখে তাহলে তারা আমাকে খারাপ মনে করবে। তাহলে যখন সাধারণ পর্যায়ের মানুষের সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে নিজের কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করি, দৃষ্টিকে সংযত করি; তাহলে প্রত্যেক গোনাহের সময় এ কথা চিন্তা করুন যে, আল্লাহ তা'আলা, যিনি মালিকুল মুল্‌ক, যিনি তাদের সকলের স্রষ্টা ও মালিক, তিনি আমাকে দেখছেন। এ কথা চিন্তা করার দ্বারা ইনশাআল্লাহ অন্তরে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

গোনাহের স্বাদ ক্ষণস্থায়ী

মানুষ যখন গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন প্রথম প্রথম গোনাহ থেকে বাঁচতে তার কষ্ট হয়। গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয় না। কিন্তু গোনাহ থেকে

বাঁচার চিকিৎসা এটাই যে, জোরপূর্বক নিজেকে গোনাহ থেকে দূরে রাখবে। আল্লাহর খাতিরে গোনাহের বাসনাকে নিষ্পেষিত করবে। যখন সে আল্লাহর খাতিরে নিজের কামনাকে দমন করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমানের এমন মধুরতা দান করবেন যে, তার তুলনায় গোনাহের স্বাদ কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বাঁচার মধুরতা দান করুন।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. বলতেন, গোনাহের স্বাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন চুলকানিগ্রস্থ ব্যক্তির চুলকানিতে স্বাদ লাগে। কিন্তু তা সুস্থতার স্বাদ নয়। অসুস্থতার স্বাদ। অধিক চুলকানোর কারণে ঐ জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হবে। ক্ষত এবং জ্বলার কারণে যেই কষ্ট হবে, তার তুলনায় চুলকানির স্বাদের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু চুলকানো থেকে যদি দূরে থাকে আর চিন্তা করে যে, চুলকানোর পর অধিক কষ্ট হবে। এজন্য না চুলকিয়ে যদি তার উপর মলম লাগাই এবং তিতা ঔষধ সেবন করি তাহলে ঔষধ সেবনে কষ্ট হলেও পরিণতিতে চুলকানি থেকে মুক্তি লাভ হবে। তারপর সুস্থতার স্বাদ অর্জন হবে। সুস্থতার স্বাদ চুলকানির স্বাদের চেয়ে হাজার গুণ উন্নত হবে। ঠিক একইভাবে গোনাহের স্বাদ একেবারেই মূল্যহীন। ধোঁকার জিনিস। এই স্বাদকে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিন। এর পরিবর্তে তাকওয়ার স্বাদ অর্জন করুন। তারপর দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কতো উর্ধ্বে নিয়ে যান। প্রবৃত্তির এসব চাহিদা সৃষ্টিই করা হয়েছে নিষ্পেষিত করার জন্য এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এ কথার হাকীকত আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিন।

যৌবনকালে ভয় ও বৃদ্ধকালে আশা

একজন মুমিন আল্লাহর প্রতি ভয়ও পোষণ করবে, আবার একই সঙ্গে আশাও পোষণ করবে। তবে বুযুর্গগণ বলেছেন, যৌবনকালে ভয়ের প্রাবল্য ভালো। কারণ, যৌবনকালে যখন হাত-পা সচল থাকে, শক্তি সবল থাকে, সব ধরনের কাজ করতে মানুষ সক্ষম হয়, তখন অন্তরে গোনাহের চাহিদা হয় বেশি। গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী জিনিস বেশি হয়ে থাকে। এজন্য এসময় তার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা অধিক কল্যাণকর। যাতে এ ভয় তাকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। তবে যখন মানুষ বৃদ্ধ হয়ে শেষ বয়সে উপনীত

হয় তখন আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা প্রবল হওয়া উচিত। যাতে সে নিরাশার শিকার না হয়।

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত

বর্তমানে মানুষ মনে করে যে, আল্লাহর ভয় অর্জনযোগ্য কোনো বিষয় নয়। অনেকে বলে, আল্লাহ তো আমাদের, তাঁকে আবার কিসের ভয় করতে হবে। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে কারীমে তিনি বারবার বলেছেন, তিনি গাফুরুর রাহীম। তাহলে আর তাঁকে ভয় করতে হবে কেন? বলাবাহুল্য যে, চিন্তা-চেতনা এমন হলে আল্লাহর ভয় অর্জনের অনুভূতিই থাকবে না। এর পরিণতিতে বর্তমানে মানুষ গাফলতির মধ্যে ও গোনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে জীবন যাপন করছে। মনে রাখবেন! ভয় ছাড়া দুনিয়ার কোনো কাজ এবং কোনো কারবার চলতে পারে না। ছাত্রের যদি পরীক্ষায় ফেল হওয়ার ভয় না থাকে তাহলে সে কখনোই পরিশ্রম করবে না। এই ভয়ই তার দ্বারা পরিশ্রম করায়। তার দ্বারা পড়িয়ে নেয়। কারো যদি চাকুরিচ্যুত হওয়ার ভয় না থাকে তাহলে সে তার দায়িত্ব সম্পাদন করবে না। বসে বসে সময় নষ্ট করবে। কাজ করার পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করবে না। সন্তানের যদি পিতার ভয় না থাকে, কর্মচারীর কর্মকর্তার ভয় না থাকে, জনগণের আইনের ভয় না থাকে তাহলে এর ফলে বেআইনি, অরাজকতা ও জুলুম-অত্যাচার দেখা দিবে। সে অবস্থায় কোনো মানুষেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে না। বর্তমানে আপনারা যেই নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতার প্লাবণ দেখছেন, কারো প্রাণ নিরাপদ নয়, কারো সম্পদ নিরাপদ নয় এবং কারো সম্মানও নিরাপদ নয়। ডাকাতি হচ্ছে, চুরি হচ্ছে। বর্তমানে মানুষ মশা-মাছির চেয়ে অধিক মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই যে, একে তো আল্লাহর ভয় আত্মা থেকে উঠে গেছে। দ্বিতীয়ত, আইনের ভয় উঠে গেছে। বর্তমানে দুই পয়সার বিনিময়ে আইন বিক্রি হচ্ছে। পয়সা ব্যয় করো আইনের হাত থেকে বেঁচে যাবে। এরই ফলে পুরো সমাজে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলন

উপমহাদেশে যখন ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তখন মুসলিম ও হিন্দুরা সংঘটিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল ও হরতাল চলছিলো। হিন্দু মুসলিম উভয়ে এই

আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এজন্য কতক সময় মুসলিমদের দ্বারা হিন্দুদের কাজ নেওয়া হচ্ছিলো এবং কতক বিষয়ে ইসলাম ও হিন্দু মতের পার্থক্য বিলুপ্ত হচ্ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, মিছিল বের হলে মুসলিমরাও মাথায় তিলক লাগাতো এবং মন্দিরে গিয়ে তাদের আনুষ্ঠানিকতায় অংশ গ্রহণ করতো। এ ধরনের গর্হিত কাজ এ আন্দোলনে হচ্ছিলো। এ আন্দোলনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছিলো তা হযরত থানভী রহ.-এর পছন্দনীয় ছিলো না। ফলে তিনি এই আন্দোলন থেকে পৃথক থাকেন এবং নিজের ভক্ত, মুরীদ ও সম্পৃক্তদের বলেন, আমার মতে এ আন্দোলনে অংশ নেওয়া ঠিক নয়।

লাল টুপির ভয়

একবার এ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত থানভী রহ.-এর খেদমতে এসে নিবেদন করেন, হযরত! আপনি এ আন্দোলনে অংশ নিলে অতি দ্রুত ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে। আপনি এ আন্দোলন থেকে পৃথক থাকার কারণে ইংরেজদের শাসন এখনো টিকে আছে। তাই আপনি আমাদের সঙ্গে এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হোন। উত্তরে হযরত থানভী রহ. বলেন, আপনারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার সাথে আমি একমত নই। তাই আমি তাতে কি করে অংশ নেই? আমাকে বলুন, কয়েক বছর ধরে আপনারা এ আন্দোলন চালাচ্ছেন, বিক্ষোভ করছেন, হরতাল করছেন, মিটিং মিছিল ও সমাবেশ করছেন, এ দ্বারা এ পর্যন্ত আপনারা কি ফল পেয়েছেন? প্রতিনিধি দলের একজন বললো, হযরত এখনো পর্যন্ত স্বাধীনতা তো লাভ হয়নি তবে বড়ো একটি ফল হাতে এসেছে। তা হলো, আমরা মানুষের আত্মা থেকে লাল টুপির ভয় বের করে দিয়েছি। সে যুগে পুলিশরা লাল টুপি পরতো। তাই লাল টুপি বলে এখানে পুলিশ উদ্দেশ্য ছিলো। অর্থাৎ, এখন কারো অন্তরে পুলিশের ভয় নেই। পূর্বে তো এই অবস্থা ছিলো যে, পুলিশ এলে সারা মহল্লা ভয়ে কেঁপে উঠতো। এখন আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং হরতাল করে মানুষের আত্মা থেকে লাল টুপির ভয়ে বের করে দিয়েছি। এটা অনেক বড়ো সফলতা লাভ হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলে ইংরেজদের থেকেও মুক্তি লাভ হবে।

তখন হযরত থানভী রহ. অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত কথা বলেন। তিনি বলেন, আপনারা মানুষের মন থেকে লাল টুপির ভয় বের করে দিয়ে অত্যন্ত

খারাপ কাজ করেছেন। কারণ, এর ফলে চোর ডাকাতরা খুব আনন্দ বোধ করবে। চোর চুরি করতে লাল টুপির ভয় করবে না। ডাকাত ডাকাতি করতে লাল টুপির ভয় থাকবে না। কমপক্ষে আপনারা লাল টুপির ভয় বের করে সেখানে নিজেদের সবুজ টুপির ভয় বসিয়ে দিতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তা বড়ো সফলতা হতো। কিন্তু আপনারা লার টুপির ভয় তো বের করে দিয়েছেন, কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য ভয় প্রবেশ করাননি। এর ফলে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। মানুষের জান-মাল ও মানসম্মান ঝুঁকির শিকার হবে। আপনারা এটা কোনো ভালো কাজ করেননি। এ কাজের জন্য আমি আপনাদের প্রশংসা করতে পারছি না।

আত্মা থেকে ভয় বের হয়ে গেছে

এ কথাটি হযরত থানভী রহ. ৬০ বছর পূর্বে বলেছিলেন, এখন এ কথার বাস্তবতা খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করুন! সেই ভয় আত্মা থেকে বের হওয়ার ফলে সমাজের উপর বিশৃঙ্খলার প্লাবন আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। সে সময় কোনো জনপদে একজন মানুষও নিহত হলে সারা দেশ কেঁপে উঠতো। হত্যাকাণ্ড কি করে হলো, তার তদন্ত শুরু হয়ে যেতো। আজ মানুষের প্রাণ মশা-মাছির চেয়েও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ, আত্মা থেকে ভয় বের হয়ে গেছে।

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন

মোটকথা, ভয় এমন এক জিনিস, যার উপর সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। এই ভয়ের অভাবে নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা ও অরাজকতার বাজার উত্তপ্ত হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বার বার বলেছেন, اِتَّقُوا اللهَ اِتَّقُوا اللهَ 'তাকওয়া অবলম্বন করো।' তাকওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা যেমন ভয় ছাড়া অচল, একইভাবে দ্বীনের ভিত্তিও আল্লাহর ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ না করুন, এই ভয় আত্মা থেকে বের হয়ে গেলে বা তা হ্রাস পেলে গোনাহ ব্যাপক আকার ধারণ করবে। যেমন বর্তমানে আমরা নিজ চোখে দেখছি। কুরআনে কারীমের কোথাও জান্নাতের আলোচনা আছে, কোথাও জাহান্নামের আলোচনা আছে, কোথাও আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর কুদরতের আলোচনা আছে, যাতে করে প্রত্যেক মুসলিম এসব বিষয়ে বার

বার চিন্তা করে। এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়। এবং এগুলোর মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে।

নির্জনে আল্লাহর ভয়

পুলিশের ভয়, আইনের ভয়, শাস্তির ভয় বা জেলের ভয় এমন জিনিস যা শুধুমাত্র অন্য মানুষের সামনে অপরাধ করতে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু যখন আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থান করে নেয় তখন বনের নির্জনে এবং রাতের অন্ধকারে, যখন আর কেউ দেখার থাকে না, সেখানেও সেই ভয় মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। মনে করুন! রাতের অন্ধকার বিরাজ করছে, বনের নির্জনতা বিরাজ করছে, দেখার মতো কেউ উপস্থিত নেই, তখন যদি কোনো ঈমানদার গোনাহ থেকে বাঁচে তাহলে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কিছুই নাই যা তাকে গোনাহ থেকে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহর ভয়ই তাকে গোনাহ থেকে বিরত রাখছে।

রোযা অবস্থায় আল্লাহর ভয়

আল্লাহর এই ভয়ের অভিজ্ঞতা দেখুন, এযুগেও মানুষ যতো বড়ো ফাসেক হোক, ফাজের হোক, গোনাহগার হোক যদি রমাযান মাসে রোযা রাখে, প্রচণ্ড গরম পড়ছে, তীব্র পিপাসা লাগছে, জিহ্বা বের হয়ে আসছে, বদ্ধ কক্ষ, নির্জন কক্ষ, পাশে অন্য কোনো মানুষ নেই, কক্ষের মধ্যে ফ্রিজ রয়েছে, ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি রাখা আছে। তখন এই প্রচণ্ড পিপাসা অবস্তায় ঠাণ্ডা পানি পান করতে মানুষের মন চায়। কিন্তু বর্তমানে এই অধপতিত যুগেও কি কোনো মুসলিম এমন আছে, যে এ সময় ফ্রিজ থেকে পানি বের করে পান করবে? কখনোই সে পান করবে না। অথচ সে পানি পান করলে কোনো মানুষই জানতে পারবে না। কেউ তাকে তিরস্কার করবে না। দুনিয়াবাসীদের সামনে সে রোযাদার বলেই পরিগণিত হবে। সন্ধ্যায় বাইরে বের হয়ে মানুষের সাথে ইফতারি খেলে কেউ জানতেও পারবে না যে, সে রোযা ভেঙ্গেছে। এতদসত্ত্বেও সে পানি পান করবে না।

এবার বলুন, সেটি কোন জিনিস যা তাকে বদ্ধ কক্ষে পানি পান করতে বাধা দিলো। আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু আমাদের রোযা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে এ জন্য এ অভ্যাসের পরিণতিতে সেই ভয় কার্যকর হয়েছে।

সর্বত্র আল্লাহর এই ভয় সৃষ্টি করুন

শরীয়তের দাবী হলো যেভাবে রোযার অবস্থায় বন্ধ কক্ষে আল্লাহর ভয় আপনাকে পানি পান করা থেকে বাধা দিচ্ছে ঠিক একইভাবে কুদৃষ্টির যদি প্রচণ্ড চাহিদা হয়, হারাম জায়গায় দৃষ্টি পড়তে চায়, তখন সে প্রচণ্ড চাহিদাকেও আল্লাহর ভয়ে দমন করে নিজের দৃষ্টিকে আটকে রাখুন। একইভাবে গীবত করতে বা মিথ্যা বলতে প্রচণ্ড চাহিদা হচ্ছে তো যেভাবে রোযার অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে পানি পান করা থেকে বিরত ছিলেন এমনিভাবে এখানেও গীবত এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকুন। এটা হলো আল্লাহর ভয়। এই জিনিস যখন অন্তরে সৃষ্টি হয় তখন মানুষ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর মর্জির খেলাফ কাজ করে না। শরীয়তে এই আল্লাহর ভয়ই কাম্য।

জান্নাত কার জন্য?

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজের নফসকে মন্দ কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।'[১]

কি বিস্ময়কর শব্দ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন! তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পরওয়ারদেগারের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করলো যে, আমাকে একদিন আমার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে তখন কোন মুখ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবো। আর এই ভয় তার এতো তীব্র হলো যে, এই ভয়ের ফলে সে তার নফসের অবৈধ চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকলো, তাহলে এমন ব্যক্তির ঠিকানা হবে জান্নাত। এমন ব্যক্তির জন্যই জান্নাত তৈরী করা হয়েছে।

জান্নাতের চর্তুদিকে কষ্টের আবরণ রয়েছে

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ

---

১. সূরা নাযেয়াত, আয়াত: ৪০-৪১

'জান্নাতকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব জিনিস দ্বারা পরিবেষ্টন করেছেন যা মানুষের কাছে খারাপ লাগে।'[১]

অর্থাৎ, কষ্টকর ও পরিশ্রমের কাজ যা মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে, এমন সব জিনিস দ্বারা জান্নাতকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। আপনি এসব কষ্টকর কাজ করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। এজন্য বলা হয়েছে যে, অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন, এর ফলে নাজায়েয কামনা বাসনার উপর আমল করা থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। পরিণতিতে জান্নাত লাভ হবে। এই ভয় এই পর্যায়ের হতে হবে, যেন নিজের সব কাজ, সব কথার মধ্যে এই ভয় লেগে থাকে যে, এটা আমার মালিকের মর্জির খেলাফ যেন না হয়। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের ভয়ের অবস্থা এই ছিলো যে, তাদের ঐ সময় পর্যন্ত শান্তি লাভ হতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিজের উপর শাস্তি বাস্তবায়ন না করাতেন।

ইবাদতের উপরেও ইস্তিগফার করা উচিত

এই ভয় যখন আরো উন্নতি করে তখন তা শুধু গোনাহ না করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এই বিষয়েও ভয় সৃষ্টি হয় যে, আমরা যে ইবাদত করছি তা আল্লাহ তা'আলার শান মোতাবেক হচ্ছে কি? ইবাদত আল্লাহর তা'আলার সামনে পেশ করার উপযুক্ত হচ্ছে কি? এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমূলক আমল করেও ভয় করছে যে, এ আমল আল্লাহ তা'আলার শান মোতাবেক যদি না হয়, তার মধ্যে যদি কোনো বেয়াদবি হয়ে যায়! এজন্য বুযুর্গগণ বলেছেন, একজন মুমিনের কাজ হলো, আমল করতে থাকবে এবং ভয় করতে থাকবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

'তাদের পার্শ্বদেশ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাগ থাকে এবং তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়।'[২]

তারা আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত যখন করতে থাকে, তখনও তাদের আত্মা আল্লাহর ভয় থেকে খালি থাকে না। বরং ভয়ের সাথে নিজের প্রভুকে ডাকতে থাকে যে, জানা তো নেই আমার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করার যোগ্য হলো কি না?

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৪৯, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৮২

২. সূরা সাজদা, আয়াত-১৬

নেক বান্দাগণের অবস্থা

অপর এক জায়গায় নেক বান্দাগণের আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

'আল্লাহর নেক বান্দাগণ রাতের বেলায় কম ঘুমিয়ে থাকেন, আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকেন, তাহাজ্জুদ আদায় করতে থাকেন, কিন্তু যখন ভোর বেলা হয় তখন তারা ইস্তেগফার করেন।'[১]

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ভোর রাত তো ইস্তিগফার করার সময় নয়, কারণ ইস্তিগফার তো হয় কোনো গোনাহের পর। এরা তো সারারাত আল্লাহ তা'আলার দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত করেছেন। কোনো গোনাহ তো করেননি। তাহলে এরা ইস্তিগফার করতেন কেন? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব লোক নিজের ইবাদতের ব্যাপারেই ইস্তিগফার করতেন। যেমন ইবাদত করা উচিত ছিলো তেমন ইবাদত করা আমার দ্বারা হয়নি। ইবাদতের যেই হক আদায় করা উচিত ছিলো, আমার দ্বারা সেই হক আদায় করা সম্ভব হয়নি।

মোটকথা, আল্লাহর এসব নেক বান্দাদের শুধু গোনাহের ভয় হয় না বরং ইবাদত ভুল হওয়ারও ভয় হয়ে থাকে যে, এই ইবাদত আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে যায়।

মারেফাত অনুপাতে আল্লাহর ভয় হয়ে থাকে

ভয়ের ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, আল্লাহ তা'আলার মারেফাত যতো বেশি হবে আল্লাহ তা'আলার ভয়ও ততো বেশি হবে। আর অজ্ঞতা যে পরিমাণ থাকবে, ভয়ও সেই পরিমাণ কম হবে। দেখুন! ছোট একটি বাচ্চা, যে এখনো নির্বোধ, তার সামনে যদি বাদশা আসে, উজির আসে বা বাঘ আসে, সে কোনো প্রকার ভয় করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বাদশার মর্যাদা জানে, সে বাদশার সামনে যেতে কাঁপতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হযরত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নবীগণের পর সবচে' বেশি ছিলো। এজন্য তাঁদের মধ্যে আল্লাহর তা'আলার ভয়ও বেশি ছিলো।

---

১. সূরা যারিয়াত, আয়াত: ১৭-১৮

হযরত হানযালা রাযি.-এর ভয়

হযরত হানযালা রাযি. একবার পেরেশান হয়ে দৌড়াতে থাকলেন। কাঁপতে কাঁপতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন,

نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ!

'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে মুনাফিক হলে? হযরত হানযালা রাযি. নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার মজলিসে বসা থাকি এবং জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা শুনি, আখেরাতের আলোচনা শুনি, তখন অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হয়। আত্মা বিগলিত হয়। দুনিয়া বিমুখতা সৃষ্টি হয়। আখেরাতের ফিকির পয়দা হয়। কিন্তু যখন বাড়িতে যাই, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির সাথে মিলিত হই, জীবনের কাজ কর্মে লিপ্ত হই, তখন মনের সেই অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। বরং দুনিয়ার মহব্বত আমাদের আত্মার উপর আচ্ছন্ন করে নেয়। তাই এখানে এসে এক অবস্থা, আর বাইরে গিয়ে অন্য অবস্থা, এটা তো মুনাফিক হওয়ার আলামত। উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً

অর্থাৎ, হে হানযালা! ভয় করার কিছু নেই। সময় ভেদে এমন হয়ে থাকে। আত্মা কখনো বেশি বিগলিত হয়, আর কখনো কম হয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে এর উপর ভিত্তি নয়। আসল ভিত্তি হলো আমলের উপর। মানুষের কোনো আমল যেন শরীয়ত বিরোধী না হয়।'[১]

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর ভয়

হযরত ফারুকে আযম রাযি. নিজকানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শুনেছিলেন,

عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৩৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৩৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২২৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৯৪৯

'ওমর জান্নাতে যাবে।'[১]

তিনি এ ঘটনাও শুনেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি যখন মেরাজে যান এবং সেখানে জান্নাত ভ্রমণ করেন তো জান্নাতের মধ্যে আমি একটা শানদার মহল দেখি। সেই মহলের পাশে এক মহিলা বসে ওযু করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই মহল কার? আমাকে বলা হলো, এটা ওমরের মহল। সেই মহল এতো শানদার ছিলো যে, আমার মন চাচ্ছিলো ভিতরে গিয়ে মহলটি দেখি। কিন্তু হে ওমর! তোমার আত্মমর্যাদবোধের কথা আমর স্মরণ হলো যে, তুমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ। এজন্য আমি ঐ মহলে আর প্রবেশ করলাম না। ফিরে এলাম। হযরত ওমর ফারুক রাযি. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন, এবং নিবেদন করলেন,

وَعَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغَارُ!

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আত্মসম্মানবোধ দেখাবো!'[২]

দেখুন! হযরত ওমর ফারুক রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে নিজে জান্নাতের সুসংবাদ শুনেছেন। জান্নাতের মধ্যে নিজের মহলের বিবরণ শুনেছেন। এরপরও তাঁর অবস্থা এই ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর খেদমতে তাশরীফ নিয়ে যান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে মুনাফিকদের তালিকা বলে দিয়েছিলেন যে, মদীনায় অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। হযরত ওমর ফারুক রাযি. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে হুযাইফা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলুন, এই তালিকার মধ্যে আমার নাম নেই তো?[৩]

তাঁর চিন্তা জেগে ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন আবার না হয়ে থাকে

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৮০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৪৩

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১০৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮১১৫

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯

যে, আমার পরবর্তী আমলের কারণে এসব সুসংবাদ হাতছাড়া হয়ে গেছে। দেখুন! হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর এই আশঙ্কা লেগে আছে। যাইহোক, যে ব্যক্তির মারেফাত যতো বেশি হবে, তার ভয়ও ততো বেশি হবে। ন্যূনতম এই ভয় অন্তরে অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন হতে পারে না।

ভয় সৃষ্টি করার উপায়

এই ভয় সৃষ্টি করার পদ্ধতি এই যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থেকে ফজরের নামাযের পর অথবা রাতে ঘুমানোর পূর্বে কিছু সময় নির্ধারণ করবে। তখন এ কথা চিন্তা করবে যে, আমি মৃত্যু বরণ করছি, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত আছি। আপনজন আত্মীয়-স্বজন আমার চর্তুপাশে জমায়েত হয়ে আছে। আমার প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কাফন পরানোর পর দাফন করা হচ্ছে। ফেরেশতারা প্রশ্নোত্তর করার জন্য আসছে। আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাকে পেশ করা হয়েছে। এসব কথা মনযোগ দিয়ে চিন্তা করতে থাকবে। যখন মানুষ প্রতিদিন এসব কথা চিন্তা করবে, তখন ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আত্মা থেকে গাফলতের পর্দা সরে যেতে আরম্ভ করবে। আমরা মৃত্যুর ব্যাপারে গাফেল তাই আমাদের উপর গাফলত ছেয়ে আছে। নিজ হাতে নিজের প্রিয় লোকদেরকে মাটি দিয়ে আসছি। নিজের কাঁধে জানাযা বহন করছি। স্বচক্ষে দেখছি যে অমুক ব্যক্তি বসে বসে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। নিজ চোখে দেখি যে, যেই দুনিয়া সঞ্চয় ও অর্জন করতে সকাল সন্ধ্যা দৌড় ঝাপ করছিলো, পরিশ্রম করছিলো, কষ্ট করছিলো, কিন্তু যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলো, তখন তার দিকে মুখ ফিরিয়েও তাকালো না। এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, মৃত্যুর এ ঘটনা তার সাথেই ঘটেছে, আমাকেও যে একদিন এভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে, সে দিকে মনযোগ যায় না। এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

অর্থাৎ, সমস্ত স্বাদকে বিনাশকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো। মৃত্যুকে ভুলো না, বরং তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো। মোটকথা, প্রতিদিন সকাল বা সন্ধ্যায় সামান্য সময় এ বিষয়গুলো চিন্তা করবে, তাহলে এর মাধ্যমে কিছু না কিছু পরিমাণ কাঙ্খিত সেই ভয় অবশ্যই জন্ম নিবে।[১]

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৯, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ১৮০১

তাকদীর প্রবল হয়ে দেখা দেয়

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে একজন জান্নাতের আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে আর জান্নাতের মাঝে এক হাতের দূরত্ব থাকে। তখন তার উপর ভাগ্যের লিখন প্রবল হয়ে দেখা দেয়, আর সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের কাজ শুরু করে দেয়, এমনকি সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। অপরদিকে একব্যক্তি সারাজীবন জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে অবশেষে তার আর জাহান্নামের মাঝে এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, তখন তার উপর ভাগ্যের লিখন প্রবল হয়ে দেখা দেয়, ফলে সে জান্নাতের আমল করতে শুরু করে, এমনকি সে জান্নাতে চলে যায়।[১]

নিজের আমল নিয়ে গর্ব করবেন না

এই হাদীস দ্বারা শিক্ষা লাভ হয় যে, কোনো ব্যক্তি নিজের আমল নিয়ে গর্ব করবে না যে, আমি অমুক আমল করছি। কারণ, এসব আমল ধর্তব্য নয়। ধর্তব্য হলো জীবনের শেষ আমল। যেমন এক হাদীসে এসেছে,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

'শেষ অবস্থায় সে কেমন আমল করেছিলো তাই ধর্তব্য।'[২]

অর্থাৎ, কোনো আমলের অশুভ পরিণতি যেন জাহান্নামীদের আমলের দিকে নিয়ে না যায়। এজন্য নেক আমল করা অবস্থায়ও ভয় করা উচিত।

মন্দ আমলের অশুভ পরিণতি

একটি বিষয় খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, ঐ ব্যক্তির দ্বারা জাহান্নামের কাজ জোরপূর্বক করানো হবে না, যাতে সে এর ফলে জাহান্নামে চলে যায়। বরং এ সমস্ত আমল সে নিজ ইচ্ছাতেই করবে। বাধ্য হয়ে করবে না। কিন্তু এসব আমলের অশুভ পরিণতি এমন হয় যে, তার পিছনের সমস্ত নেক আমলের ছওয়াব এবং পুরস্কার শেষ হয়ে যায় এবং মন্দ আমলের দিকে

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৮৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৬২, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৮৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১৭৬৮

মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। কতক গোনাহের অশুভ পরিণতি এমন হয় যে, তার ফলে মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় গোনাহের অশুভ পরিণতির ফলে তৃতীয় গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে সে গোনাহের মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যে, তার ফলে তার বিগত জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বুযুর্গগণ বলেছেন, কোনো গোনাহকেই ছোট মনে করে করবে না। কারণ জানা তো নেই, এই ছোট গোনাহ আপনার জীবনের সমস্ত আমলকে খতম করে দিতে পারে। আর কোনো গোনাহকে ছোট মনে করে করা সেই গোনাহকে বড়ো গোনাহ বানিয়ে দেয়। আর তার নগদ পরিণতি এই হয় যে, সেই গোনাহ অন্য গোনাহকে আকর্ষণ করতে থাকে, ধীরে ধীরে সে অন্যান্য গোনাহে লিপ্ত হতে থাকে।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের দৃষ্টান্ত

হযরত থানভী রহ. বলেন, ছোট গোনাহের দৃষ্টান্ত ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো, আর বড়ো গোনাহের দৃষ্টান্ত বড়ো আগুন বা বড়ো অঙ্গারের মতো। এখন কোনো ব্যক্তি যদি চিন্তা করে যে, এটা তো ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, বড়ো আগুন তো আর নয় তাই তা আমার সিন্ধুকের মধ্যে রেখে দেই। তাহলে পরিণতিতে সেই ছোট স্ফুলিঙ্গই পুরো সিন্ধুক এবং কাপড় জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবে।

বুযুর্গদের সাথে বেয়াদবি করার বিপদ

এমনিভাবে আল্লাহওয়ালাদের অসম্মান করা, তাদের শানে বেয়াদবি করা, তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়া এটা এমন এক জিনিস, যা অনেক সময় মানুষের মত ও চেতনাকে বদলে দেয়। এজন্য কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে আপনার মতোবিরোধ থাকলে সেই মতোবিরোধকে তার সীমানার মধ্যে রাখুন। কিন্তু আপনি যদি তাঁর শানে গোস্তাখি করেন, বেয়াদবি আরম্ভ করেন, তাহলে এর অশুভ পরিণতিতে আপনি গোনাহের মধ্যে ফেসে যেতে পারেন।

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর একটি পুস্তিকা রয়েছে, যার নাম 'দরসে ইবরাত'। এর মধ্যে তিনি অনেক বড়ো এক বুযুর্গের শিক্ষণীয় একটি ঘটনা লিখেছেন। যিনি সারাজীবন শাইখ, বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা ছিলেন, হঠাৎ করে তার মনের গতি ফিরে যায়। ফলে তিনি খারাপ কাজে লিপ্ত হন। তো অনেক সময় এই ছোট গোনাহের আপদে এরূপ হয়ে থাকে। এজন্য বলা হয় যে, কোনো গোনাহকেই ছোট মনে করে

করো না। কারণ, এমন যেন না হয় যে, ঐ গোনাহের পরিণতিতে আপনার শেষ অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো। এজন্য সকল বুযুর্গ সব সময় শেষ পরিণতি ভালো হওয়ার জন্য দু'আ করেছেন।

নেক আমলের বরকত

পক্ষান্তরে অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তির আমল খারাপ, গোনাহের মধ্যে লিপ্ত, হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা নেক আমলের তাওফীক দিলেন এবং এই তাওফীকও লাভ হয় কোনো নেক আমলের পরিণতিতে। যেমন প্রথমে কোনো ছোট নেক আমলের তাওফীক লাভ হলো। তারপর তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা অধিক নেক আমলের তাওফীক দান করলেন এবং এর পরিণতিতে তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে গেলো। এ কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا

'তোমাদের মধ্যে কেউই যেন, কোনো নেক আমলকে ছোট মনে না করে।'[১]

জানা তো নেই, হয়তো সেই নেক আমলটিই আপনার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিবে। তার কারণে আপনি সব ঘাঁটি পার হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মাফ করে দিবেন। আল্লাহওয়ালাদের এমন অসংখ্য ঘটনা আছে যে, ছোট একটি নেক আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। এজন্য ছোট আমলকেও তুচ্ছ মনে করতে নেই। আমি একটি পুস্তিকা লিখেছি, 'আসান নেকিয়াঁ' নাম দিয়ে। যার মধ্যে আমি এমন ছোট ছোট আমল লিখে দিয়েছি, হাদীস শরীফে যেগুলোর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কোনো মানুষ এসব নেক আমল করলে পরিণতিতে তার নেক আমলের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি ঘটতে পারে। প্রত্যেক মুসলমানেরই এই পুস্তিকাটি অবশ্যই পড়া উচিত এবং নিজের জীবনে এসব নেক আমল করার চেষ্টা করা উচিত।

তাকদীরের হাকীকত

কতক মানুষ এই হাদীসের ভিত্তিতে বলে যে, তাকদীরে যখন লিখে দেয়া হয়েছে কোন ব্যক্তি বেহেশতী এবং কোন ব্যক্তি জাহান্নামী, তাহলে আমল

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৬০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৩৮৯

করার দ্বারা লাভ কি? তাই তো হবে যা তাকদীরে লেখা আছে। ভালো করে বুঝুন এই হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, আপনি সেই আমলই করবেন যা তাকদীরে লেখা আছে। বরং এই হাদীসের অর্থ হলো, তাকদীরে তাই লেখা আছে যা আপনি স্বেচ্ছায় করবেন। কারণ তাকদীর হলো আল্লাহর ইলমের নাম। আর আল্লাহ তা'আলার আগে থেকেই জানা আছে আপনি স্বেচ্ছায় কোন কাজ করবেন। তাই আল্লাহ তা'আলা সে সবই লাওহে মাহফূযে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু আপনার জান্নাতে যাওয়া বা জাহান্নামে যাওয়া মূলত আপনার ইচ্ছাকৃত আমলের ভিত্তিতেই হবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। সেই ইচ্ছার ভিত্তিতে মানুষ আমল করতে থাকে। এখন চিন্তা করার বিষয় হলো তাকদীরে তো সব কিছুই লিখে দেয়া হয়েছে এজন্য হাত বেঁধে বসে থাকা ঠিক নয়।

সুতরাং যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন,

فَفِيْمَا الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!

'যখন এই ফয়সালা হয়ে গেছে যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী আর অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী তো আমল করে কি লাভ?' তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ

'আমল করতে থাকো, কারণ প্রত্যেক মানুষ সেই আমলই করবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য তোমরা নিজ ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমল করতে থাকো।[১]

নিশ্চিন্ত হবেন না

এই হাদীস এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এ কথা চিন্তা না করে যে, আমি বড়ো বড়ো ওযীফা ও তাসবীহ পাঠ করছি, নফল পড়ছি পুরো শরীয়তের উপর আমল করে চলছি, এজন্য আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। আরে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মানুষের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। বরং সব সময়

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৮৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৬২, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৮৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯

এই ভয় লেগে থাকা উচিত যে, এমন আবার না হয় যে, আমার অবস্থা বদলে গেলো। মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

اندریں راہ می تراش و می خراش

تادم آخر دم فارغ مباش

অর্থাৎ, এ পথে সব সময় পরিশ্রম করতে থাকতে হবে। সব সময় নিজের নফসের নেগরানী করতে থাকতে হবে যে, এ নফস ভুল পথে আবার না চলে। বড়ো বড়ো মানুষ নিশ্চিন্ত হওয়ার ফলে তাদের পদস্খলন ঘটেছে। এজন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের বেফিকির হওয়া উচিত নয়।

জাহান্নামের সবচে' হালকা আযাব

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হালকা আযাব যে ব্যক্তির হবে তা হবে এই যে, তার পায়ের তলায় দুটি অঙ্গার রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু তার তীব্রতা এতো বেশি হবে যে, এর ফলে তার মগজ বলকাইতে থাকবে। আর সে ব্যক্তি মনে করবে হয়তো বা আমাকেই সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাকে সবচেয়ে হালকা আযাব দেওয়া হচ্ছে।[১]

কতক বর্ণনায় এসেছে এই আযাব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের হবে। কারণ তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেননি। এজন্য তাকে এই শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

মোটকথা, এই হাদীস দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যখন সবচেয়ে হালকা আযাবের কারণে এই অবস্থা হবে যে, ঐ অঙ্গারের পরিণতিতে সে ব্যক্তির মগজ টগবগ করতে থাকবে তাহলে যার জন্য কঠিন আযাবের ধমকি আছে তার অবস্থা কি হবে? জাহান্নামের এই আযাবের কথা মানুষ মাঝে মাঝে চিন্তা করবে তাহলে এর ফলে মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হবে এবং অন্তরে তাকওয়া বদ্ধমূল হবে।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৭৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬১, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫২৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৫০৪

জাহান্নামীদের স্তর

এক হাদীস শরীফে জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কতক জাহান্নামীর অবস্থা এই হবে যে, জাহান্নামের আগুন তার গিরা পর্যন্ত পৌছবে। যে ব্যক্তির শুধু তালুর নিচে অঙ্গার রেখে দেওয়া হবে তার অবস্থা উপরের হাদীসে শুনলেন, তাহলে যার আগুন গিরা পর্যন্ত পৌছবে তার কি অবস্থা হবে? আর কতক জাহান্নামী এমন হবে যে, জাহান্নামের আগুন তার হাঁটু পর্যন্ত পৌছবে। আর কতক জাহান্নামী এমন হবে যে, আগুন তার কোমর পর্যন্ত পৌছবে এবং কতক এমন হবে যে, তার পাঁজর পর্যন্ত আগুন পৌছবে। জাহান্নামীদের এভাবে বিভিন্ন স্তর হবে। আল্লাহ তা'আলা আপন দয়ায় আমাদের সকলকে তা থেকে হেফাজত করুন।

হাশরের ময়দানে মানুষের অবস্থা

এটা তো হলো জাহান্নামের অবস্থা, কিন্তু জাহান্নামে যাওয়ার পূর্বে মানুষ যখন হাশরের ময়দানে অবস্থান করবে তখন কি অবস্থা হবে এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দন্ডায়মান হবে, এমনকি এক মানুষের কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। যেন গরমের তীব্রতার কারণে এতো বেশি ঘাম বের হবে যে, তার কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌছে যাবে। অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মানুষের এ পরিমাণ ঘাম প্রবাহিত হবে যে, তা সত্তর হাত মাটির নিচ পর্যন্ত চলে যাবে। আর ঐ ঘাম মানুষকে ঢেকে নিবে এমনকি তার কান পর্যন্ত পৌছে যাবে।[১]

জাহান্নামের বিশালতা

অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি একটি জিনিস পড়ার আওয়াজ পেলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো এটা কিসের পতনের আওয়াজ? আমরা নিবেদন করলাম, আল্লাহ এবং

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৭৯৮

তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে একটি পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, আজ সেই পাথর তার তলদেশে পৌঁছলো। এটা সেই পাথর পড়ার আওয়াজ।[১]

পূর্বের মানুষ একে অতিরঞ্জন মনে করতো যে, সেই পাথর সত্তর বছর ধরে চলে এর তলদেশে পৌঁছেছে! কিন্তু এখন সাইন্সের উন্নতি হয়েছে। সুতরাং সাইন্স বলে, অনেক নক্ষত্র এমন রয়েছে যা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তার আলো পৃথিবীর দিকে আসছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারেনি। যখন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বিশালতা এই পরিমাণ তাহলে এতে অস্বাভাবিক কি আছে যে, একটি পাথর জাহান্নামের মধ্যে সত্তর বছর সফর করে তার তলদেশে পৌঁছবে। মোটকথা, এই হাদীস দ্বারা জাহান্নামের বিশালতা বলা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এসব হাদীসের সারকথা হলো, মানুষ মাঝে মধ্যে নিজের মৃত্যু এবং জান্নাত জাহান্নামের এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে। এতে করে ধীরে ধীরে আত্মা বিগলিত হবে এবং অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে। এর ফলে নেক আমল করা সহজ হবে এবং গোনাহ ছাড়া সহজ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের অন্তরে এই ভয় সৃষ্টি করে দিন এবং সমস্ত গোনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত এবং তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৭৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৪৮৪

মুজাহাদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

'এবং যেসব লোক আমার জন্য চেষ্টা করবে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পৌছে দেবো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।'[১]

গত জুমায় মুজাহাদা সংক্রান্ত যেসব কথা তুলে ধরেছিলাম তার সারকথা এই ছিলো যে, মুজাহাদার অর্থ প্রবৃত্তির চাহিদার মোকাবেলা করে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর হুকুম মোতাবেক চলার চেষ্টা করা। একে বলে মুজাহাদা। আজ এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। যাতে এ বিষয়টি ভালোভাবে মন-মগজে বসে যায় যে, মুজাহাদা কেনো করতে হয়, এর প্রয়োজনীয়তা কী এবং এর হাকীকত কী?

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৬-২৬২, ১৭ই মে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার আসরের নামাযের পর বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সূরা আনকাবূত, আয়াত-৬৯

দুনিয়াবী কাজে মুজাহাদা

দ্বীনের কাজ মুজাহাদা ছাড়া চলে না, বরং দুনিয়ার কাজও মুজাহাদা ছাড়া হয় না। কোনো ব্যক্তি যদি জীবিকা অর্জন করতে চায় তার জন্য তাকে দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়। তার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করতে হয়, নিষ্পেষিত করতে হয়। কারণ প্রবৃত্তির চাহিদা হলো ঘরে বসে আরামে শুয়ে থাকা। কিন্তু সে চিন্তা করে আমি যদি শুয়ে থাকি তাহলে জীবিকা অর্জন করবো কি করে? উপার্জন করবো কি করে?

শিশুকাল থেকে মুজাহাদার অভ্যাস গড়া

শিশুকাল থেকেই সন্তানকে মুজাহাদার অভ্যাস গড়তে হয়। শিশুকে প্রথমে তার মনের বিরুদ্ধে পড়ার জন্য পাঠানো হয়। পড়তে যেতে তার মন চায় না, কিন্তু তাকে তার মনের বিরুদ্ধে পড়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এটা মুজাহাদা। এজন্য শিক্ষা অর্জনের জন্য, জীবিকা উপার্জনের জন্য, বরং দুনিয়ার সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে নিজের মনের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। কোনো মানুষ যদি চিন্তা করে যে, আমি আমার মনের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবো না, তাহলে সে না দুনিয়ার কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে, আর না দ্বীনের কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

জান্নাতে মুজাহাদা থাকবে না

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন। একটি জগত এমন, যেখানে আপনার সব চাহিদা পুরা হবে। সেখানে আপনার চাহিদার বিরুদ্ধে কিছু করার প্রয়োজন হবে না। মন যা চাইবে তাই হবে। সেখানে মানুষ নিজের মন মোতাবেক কাজ করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। স্বাধীন থাকবে। সেখানে তাকে সব সুযোগ দেওয়া হবে। সেই জগতের নাম জান্নাত। যার সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

'যা কিছু তোমাদের মন চাইবে তা পাবে এবং যা কিছু তোমরা দাবী করবে তাও লাভ করবে।'[১]

---

১. সূরা হামীম সাজদা, আয়াত-৩১

কতক বর্ণনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে যে, বসে বসে মন চাইলো আনারের জুস পান করবো। এখন সেখানে না আনার আছে, না আনারের গাছ আছে, না জুস বের করার লোক আছে, কিন্তু বাস্তবে ঘটবে এই যে, যখন আপনার মনে জুস পান করার চিন্তা জাগবে সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে আনারের জুস বের হয়ে আপনার নিকট পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এই ক্ষমতা দান করবেন যে, যেই জিনিস মন চাইবে তাই লাভ হবে। সেখানে আপনার কোনো চাহিদা দমন করার প্রয়োজন হবে না। কোনো বাসনার বিরুদ্ধাচরণ করার প্রয়োজন হবে না। কোনো প্রকার মুজাহাদার প্রয়োজন হবে না। সেখানে আপনার কোনো বাসনা নিষ্পেষিত করা, কোনো চাহিদা দমন করা, অথবা কোনো বাসনার বিরুদ্ধাচরণ করার প্রয়োজন হবে না। এককথায়, কোনো প্রকার মুজাহাদার-ই প্রয়োজন হবে না। এই জগত হলো জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে নিজ দয়ায় সেই জগত দান করুন। আমীন।

জাহান্নামের জগত

দ্বিতীয় জগত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সব কাজ মনের বিরুদ্ধে হবে। সব কাজ দুঃখ কষ্ট দিবে। সব কাজ বেদনায় লিপ্ত করবে। সব কাজে বিপদ হবে। কোনো আরাম, কোনো শান্তি, কোনো সন্তুষ্টি ও কোনো আনন্দ থাকবে না। তা হলো দোযখের জগত। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে তা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এটি দুনিয়ার জগত

তৃতীয় জগত ঐটা, যার মধ্যে মনের অনুকূল কাজও হয়, আবার মনের প্রতিকূল কাজও হয়। আনন্দও লাভ হয়, বেদনাও লাভ হয়।, কষ্টও পাওয়া যায়, আরামও পাওয়া যায়। এ জগতে কারো কষ্টও নিখাদ নয় এবং কারো আরামও নিখাদ নয়। প্রত্যেক আরামের মধ্যে কষ্টের কোনো না কোনো কাঁটা লেগে আছে এবং প্রত্যেক কষ্টের মধ্যে আরামের কোনো না কোনো দিক রয়েছে। এটা হলো দুনিয়ার জগত। এই দুনিয়ায় আপনি বড়ো থেকে বড়ো পুঁজিপতি, বড়ো থেকে বড়ো সম্পদশালী, বড়ো থেকে বড়ো উপকরণের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমার কখনো কোনো কষ্ট হয়েছে কি? বা তুমি সারা জীবন কি আরাম ও শান্তিতে আছো? একজন ব্যক্তিও এমন পাওয়া

যাবে না, যে বলবে যে, আমার কখনোই কোনো কষ্ট হয়নি। কখনোই কোনো কাজ আমার মনের বিরুদ্ধে হয়নি। আরে! এটা হলো দুনিয়ার জগত, জান্নাত নয়। এখানে আরামও থাকবে, কষ্টও থাকবে। এই দুনিয়াকে এ জন্যই বানানো হয়েছে। কেউ যদি চায় আমার কেবলই আরাম লাভ হোক, কোনো প্রকারের কষ্টই না হোক; তাহলে এটা কখনোই হবে না। সারা জীবনেও হবে না। এক কবি বলেন,

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

'জীবন ও বেদনার বন্ধন মূলত অভিন্ন।
মৃত্যুর পূর্বে মানুষ বেদনা থেকে
মুক্তি লাভ করবে কি করে?'

এই দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্যই বানিয়েছেন। এখানে আপনার অন্তরে শান্তিও লাভ হবে আবার আত্মা বিদীর্ণকারী অবস্থাও সৃষ্টি হবে। এজন্য মৃত্যু পর্যন্ত বেদনা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। অন্যেরা তো পরের কথা, আম্বিয়া কেরাম - যাঁরা আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, তাঁদেরও কষ্ট হয়েছে। বরং কতক সময় সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁদের বেশি কষ্ট হয়েছে। তাদেরও মনের বিরুদ্ধে ঘটনা দেখা দিয়েছে। এ দুনিয়াতে কোনো মানুষই এ থেকে বাঁচতে পারে না। মানুষ কাফের হলেও মনের বিরুদ্ধে কাজ হবে, মুমিন হলেও মনের বিরুদ্ধে কাজ হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করুন

এ দুনিয়াতে মনের বিরুদ্ধে অবস্থা আসবেই। মনের বিরুদ্ধে কাজ করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি তো এই যে, মনের বিরুদ্ধে কাজ করেও, ব্যথা উঠিয়েও এবং কষ্ট সহ্য করেও আখেরাতে তার বিনিময়ে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। আখেরাতে কোনো প্রতিদান লাভ হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে কাজ করবে এবং নফসের চাহিদাকে নিষ্পেষিত করবে, যাতে তার আখেরাত গঠিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। সুতরাং আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত হলো, এ দুনিয়াতে তো মনের বিরুদ্ধে কাজ হয়েই থাকে, তাই এই অঙ্গীকার

করুন যে, মনের বিরুদ্ধে সেই কাজ করবো, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন।

যেমন, নামাযের সময় হয়েছে, মসজিদ থেকে ডাক আসছে, কিন্তু মসজিদে যেতে মন চাচ্ছে না। অলসতা জাগছে। এমতাবস্থায় আপনি মনের চাহিদা অনুপাতে আমল করলেন। বিছানায় শুয়ে থাকলেন। ইতিমধ্যে দরজায় করাঘাত হলো। জানা গেলো, দরজায় এমন এক ব্যক্তি এসেছে, যার জন্য বাইরে যাওয়া জরুরী। তার খাতিরে বিছানা ছাড়লেন। বাইরে বের হলেন। ফলে মনের বিরুদ্ধে কাজ করতে হলো। চাহিদার বিরুদ্ধে কাজ করতে হলো। কষ্ট করতে হলো। আরাম লাভ হলো না। তাই মানুষ চিন্তা করবে যে, কষ্ট থেকে বাঁচা তো আমার ক্ষমতাধীন নয়। তাহলে আমি কেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট সহ্য করবো না? একথা চিন্তা করে উঠে নামাযের জন্য যাবে।

এ সময় যদি বাদশাহের পয়গাম আসে

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) আমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী কথা বলতেন। একবার বলেন, ভাই, তোমার যদি নামাযে যেতে অলসতা লাগে বা দ্বীনের অন্য কোনো কাজ করতে অলসতা লাগে, যেমন ফজরের নামাযের জন্য বা তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠতে অলসতা লাগছে, চোখ খুলে গেছে কিন্তু ঘুমের প্রাবল্য রয়েছে। বিছানা ছাড়তে মন চাচ্ছে না। তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো যে, এই ঘুমের প্রাবল্যের অবস্থায় যদি তোমার নিকট রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এই পয়গাম আসে যে, তিনি তোমাকে এই মুহূর্তে অনেক বড়ো সম্মাননা দিতে চান। তাহলে কি তখন ঐ ঘুম এবং অলসতা থাকবে? বলা বাহুল্য যে, ঐ ঘুম ও অলসতা দূর হয়ে যাবে। কেন? এ জন্য যে, তোমার অন্তরে ঐ সম্মাননার মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। যার ফলে তুমি মনের বিরুদ্ধে কাজ করতে তৈরী হয়ে যাবে এবং চিন্তা করবে যে, কিসের গাফলতি! কিসের ঘুম! এই সম্মান লাভের জন্য দৌড়ে যাও। এই মওকা যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং এর জন্য ঘুম ও বিশ্রাম ত্যাগ করে সাথে সাথে বের হয়ে পড়বে। এজন্য যখন তুমি দুনিয়ার একজন বাদশাহের পক্ষ থেকে সম্মান লাভের জন্য ঘুম ছাড়তে পারো, আরাম ছাড়তে পারো, তাহলে আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তা'আলাকে রাজী করার জন্য, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরাম ও ঘুম

ছাড়তে পারবে না কেন? কোনো না কোনো কারণে যখন ঘুম এবং আরাম ছাড়তেই হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তা ছাড়বো না কেন?

আল্লাহর সান্নিধ্য চেষ্টাকারীদের জন্য

হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম এই পয়গামই দিয়েছেন যে, নিজেকে নফসের বিরুদ্ধে এমন কাজ করতে অভ্যস্ত করো যা আল্লাহ তা'আলাকে রাজী করবে। এর নামই হলো 'মুজাহাদা'। যেসব কষ্ট এবং যেসব ব্যথা অনিচ্ছাকৃতভাবে আসে, বাহ্যিকভাবে তার দ্বারা কোনো লাভ হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যারা আমার খাতিরে মুজাহাদা করবে এবং আমার খাতিরে নফসের বিরুদ্ধে কাজ করবে, অবশ্যই আমি তাদের হাত ধরে আমার রাস্তায় পরিচালিত করবো।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

'এবং যেসব লোক আমার জন্য চেষ্টা করবে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পৌছে দেবো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।'[১]

অর্থাৎ, পথে সে একা থাকবে না, বরং যে ব্যক্তি এ পথে চলবে, সে মুহসিনীনদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা মুহসিনীনদের সঙ্গী হয়ে যান।

সে কাজ সহজ হয়ে যাবে

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা কীভাবে তার সঙ্গী হয়ে যান? এভাবে যে, শুরুতে নফসের বিরোধিতা করতে খুব কষ্ট মনে হয়। মনের বিরুদ্ধে কাজ করতে খুব কঠিন মনে হয়। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তাঁকে রাজি-খুশি করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে, তখন ঐ পথই তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে সহজ করে দেন। এক ব্যক্তির নামাযের অভ্যাস নেই। নামায পড়তে তার খুব কষ্ট হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া তার জন্য কঠিন লাগে। কিন্তু সে যদি তার মনের বিরুদ্ধে নামায পড়তে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন নামায পড়তে কোনো প্রকার কষ্ট হয় না। বরং তাকে যদি বলা হয় যে, হাজার টাকা নাও আর আজকের নামায ছেড়ে দাও। বলুন, সে কি তা ছাড়তে কখনো রাজী হবে? মোটেই না। যে ব্যক্তি

---

১. সূরা আনকাবূত, আয়াত-৬৯

একবার নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে কখনো হাজার টাকার বিনিময়েও এক ওয়াক্ত নামায ছাড়তে রাজী হবে না। এ কারণে যে, যেই কাজকে প্রথমে সে মুশকিল মনে করছিলো, কিছু দিনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সে কাজ সহজ করে দিয়েছেন।

সম্মুখে অগ্রসর হও

পুরো দ্বীনের একই অবস্থা। মানুষ যদি বসে বসে চিন্তা করতে থাকে, তাহলে তা তার জন্য কঠিন হয়ে দেখা দিবে। কিন্তু দ্বীনের পথে চলতে আরম্ভ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সহজ করে দেন। হযরত থানভী রহ. এর একটি দৃষ্টান্ত দিতেন। একটি লম্বা সড়ক সোজা সামনে চলে গেছে। তার দুই দিকে গাছের সারি দাঁড়ানো। ডান দিকেও, বাম দিকেও। কোনো ব্যক্তি যদি ঐ সড়কের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখে তাহলে সে দেখতে পাবে গাছের দুই সারি সামনে গিয়ে একত্রিত হয়ে গেছে এবং সামনে পথ রুদ্ধ। কোনো নির্বোধ ব্যক্তি যদি মনে করে যে, যেহেতু সামনে গিয়ে গাছের সারি পরস্পরে মিলিত হয়ে গেছে তাই এ সড়কের উপর দিয়ে চলা সম্ভব নয়। তাহলে এ ব্যক্তি কখনোই সড়ক অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না এবং গন্তব্যে পৌছতেও সক্ষম হবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তিই গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হবে, যে ব্যক্তি পথ বন্ধ দেখা সত্ত্বেও সম্মুখে অগ্রসর হবে। কারণ, সম্মুখে পা বাড়ালে সে দেখতে পাবে যে, বাস্তবে রাস্তা বন্ধ নয়, বরং চোখ তাকে ধোঁকা দিচ্ছিলো। সে যতো সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে ততো পথ উন্মুক্ত হতে থাকবে। এ জন্য দ্বীনের পথে যারা চলতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, দূর থেকে কঠিন মনে করে বসে পড়ো না। আল্লাহর উপর ভরসা করে সম্মুখে পা বাড়াও। সম্মুখে অগ্রসর হলে আল্লাহ তা'আলা রাস্তা সহজ করে দিবেন। কিন্তু সবসময় হিম্মত করে কাজ করার প্রয়োজন হবে এবং মনের বিরুদ্ধে কাজ করার সংকল্প করতে হবে। এরই নাম হলো 'মুজাহাদা'।

জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকাও মুজাহাদা

প্রকৃত মুজাহাদা তো হলো, নাজায়েয ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে নিজে বাঁচানো এবং নিজের উপর চাপ সৃষ্টি করে তা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রবৃত্তি স্বাদ, কামনা-বাসনা ও আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এতো বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, তাকে যদি

আল্লাহর পথের দিকে এবং শরীয়তের দিকে ঘুরাতে চাওয়া হয় তাহলে সহজে সে ঘুরবে না, বরং কষ্ট হবে। এ জন্য এই নফসকে বশে আনার জন্য, আয়ত্ত করার জন্য এবং আল্লাহ পাকের বাতানো বিধানের অধীন বানানোর জন্য কিছু বৈধ ও জায়েয কাজ থেকেও তাকে বিরত রাখতে হবে। কারণ, জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকলে নফস স্বাদ ত্যাগ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তখন তার জন্য নাজায়েয কাজ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যাবে। সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় একেও 'মুজাহাদা' বলা হয়।

যেমন খুব পেট পুরে খাওয়া গোনাহের কাজ নয়, কিন্তু সূফীয়ায়ে কেরাম বলেন, খুব পেট পুরে খেয়ো না। কারণ, এর ফলে নফস গাফেল হয়ে যাবে। স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। নফসকে অভ্যস্ত করার জন্য কিছুটা কম খাও, এটাও 'মুজাহাদা'।

জায়েয কাজে মুজাহাদা কেন?

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব রহ.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, হযরত এটা কেমন কথা যে, সূফীয়ায়ে কেরাম কতক জায়েয কাজেও বাধা দিয়ে থাকেন এবং সেগুলো ছাড়িয়ে থাকেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উত্তরে বললেন, দেখো! এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এই কিতাবের পৃষ্ঠা। এটাকে মোড়াও। সে মোড়ালো। এর পর বললেন, এটাকে সোজা করো। এখন ঐ পৃষ্ঠা আর সোজা হচ্ছিলো না। অনেক চেষ্টা করা হলো কিন্তু ঐটা আবারো ঘুরে যাচ্ছিলো। তখন হযরত বললেন, একে সিধা করার পদ্ধতি এই যে, পৃষ্ঠাটাকে উল্টা দিকে মোড়াও। তাহলে সে সিধা হয়ে যাবে, সোজা হয়ে যাবে। অতঃপর বললেন, এই নফসের কাগজও গোনাহের দিকে ঘুরে আছে, নাফরমানীর দিকে ঘুরে আছে, একে যদি সোজা করতে চাও তাহলে সোজা হবে না। একে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দাও, অল্প একটু জায়েয কাজও ছাড়িয়ে দাও। যার ফলে এটা সোজা হয়ে যাবে এবং পথে আসবে। এটাও মুজাহাদা।

চারটি মুজাহাদা

সূফীয়ায়ে কেরামের নিকট চারটি জিনিসের মুজাহাদা খুব বিখ্যাত।

১. খানা কম খাওয়া।

২. কথা কম বলা।
৩. কম ঘুমানো।
৪. মানুষের সঙ্গে কম মেলামেশা করা।

কম খাওয়া একটি মুজাহাদা

এক নম্বর, কম খাওয়া। পূর্বের যুগের সূফীয়ায়ে কেরাম কম খাওয়ার ব্যাপারে অনেক সাধনা করতেন। মুজাহাদা করাতেন। এমনকি উপবাসে থাকতে হতো। কিন্তু হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, বর্তমান যামানা এই ধরনের মুজাহদার উপযোগী নয়। মানুষ এমনিতেই কমজোর। এখন যদি মানুষ কম খায় তাহলে আরো রোগ ব্যাধি দেখা দিবে। ফলে আগে যেসব ইবাদত করতো তা থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য তিনি বলেন, এ যুগে মানুষ যদি একটি নিয়ম যথারীতি মেনে চলে তাহলে কম খাওয়ার উদ্দেশ্য লাভ হবে। তা হলো, খানা খাওয়ার সময় এমন একটা অবস্থা হয় যখন মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, আর খাবো কি খাবো না? ঐ দ্বিধা দ্বন্দ্ব যখন দেখা দিবে তখনই খানা ছেড়ে দিবে, এতে করে কম খাওয়ার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে।

এই যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে, আর খাবো কি খাবো না এটা মূলত বিবেক ও স্বভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কারণ, খানা খেতে মজা লাগছে তাই নফস আরো মজা নিতে চায়। আর বিবেক চায়, অতিরিক্ত খানা আর না খাক। এখন অতিরিক্ত খানা খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রবৃত্তি ও বিবেকের মাঝে তখন লড়াই হয়ে থাকে। এই লড়াইয়ের নাম হলো 'দ্বিধা-দ্বন্দ্ব'। তাই এমন ক্ষেত্রে নফসের চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করে বিবেকের চাহিদা অনুপাতে কাজ করবে।

ওজনও কম হলো এবং আল্লাহও রাজী হলেন

এ বিষয়টি আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এবং হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব রহ.-এর নিকট অনেক বার শুনেছি। ওয়াযের মধ্যেও পড়েছি। কিন্তু পরবর্তীতে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের লেখা চোখে পড়লো। তাতে তিনি লিখেছেন,

আজকাল মানুষ নিজেদের শরীরের ওজন কমানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কেউ রুটি ছেড়ে দেয়, কেউ বা দুপুরে খানা ছেড়ে

দেয়। বর্তমান যুগের পরিভাষায় যাকে ডায়েটিং বলা হয়। ইউরোপে এর খুব প্রচলন। এটা সেখানে মহামারীর মতো বিস্তার লাভ করেছে। এর উদ্দেশ্য হয় দেহের ওজন কমানো। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ঔষধ খেয়ে ওজন কমানোর প্রচলন খুব বেশি। এর ফলে অনেক সময় মানুষ মারাও যায়।

এরপর ঐ ডাক্তার লিখেছেন, আমার মতে ওজন কমানোর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি এই যে, মানুষ কোনো বেলার খানা খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিবে না এবং পরিমাণ কম করবে না, বরং সারা জীবন এই নিয়ম মেনে চলবে যে, ক্ষুধার চেয়ে একটু কম খেয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিবে। এরপর ঐ ডাক্তার ঠিক একথাই লিখেছেন যে, খানা খেতে খেতে যখন এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে, আর খাবো কি খাবো না, ঐ সময় খাওয়া ছেড়ে দিবে। যে ব্যক্তি এ অনুপাতে কাজ করবে তার কখনোই শরীরে ওজন বৃদ্ধি পাবে না এবং পাকস্থলীর রোগ হবে না এবং তার ডায়েটিং করার প্রয়োজনও দেখা দিবে না।

এ কথাটি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. অনেক বছর পূর্বে লিখে গেছিলেন। এখন ওজন কমানোর জন্য এর উপর আমল করুক বা আল্লাহ তা'আলাকে রাজী করার জন্য এ মশওয়ারা মোতাবেক কাজ করুক। কিন্তু নফসের চিকিৎসাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য যদি এ কাজ করেন তাহলে এ কাজে আপনি সফল হবেন, পুরস্কার পাবেন এবং ওজনও কমে যাবে। আর যদি শুধু ওজন কমানোর জন্য এ কাজ করেন তাহলে ওজন হয়তো কমবে, কিন্তু ছওয়াব পাবেন না।

প্রবৃত্তিকে স্বাদ উপভোগ থেকে দূরে রাখতে হবে

হযরত থানভী রহ. আমাদের জন্য কাজটি কতো সহজ করে দিয়েছেন। অন্যথায় পূর্বের যুগে সূফীয়ায়ে কেরাম এ উদ্দেশ্যে কতো ধরনের সাধনা যে করাতেন তার শেষ নেই। সূফীয়ায়ে কেরামের নিকট লঙ্গরখানা থাকতো। লঙ্গরখানায় ঝোল পাকানো হতো। খানকার মুরীদদের জন্য হুকুম ছিলো, এক পেয়ালা ঝোলের মধ্যে আরো এক পেয়ালা পানি মিশিয়ে তারপর খাবে। যাতে নফসকে স্বাদ উপভোগের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে। এছাড়া তাদের দ্বারা উপবাসও করানো হতো। কিন্তু ঐ যামানা ছিলো ভিন্ন। আর বর্তমান যামানা ভিন্ন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যেমন যুগ পরিবর্তনের ফলে চিকিৎসার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে, একইভাবে হাকীমুল উম্মত (কু.সি.)

আমাদের যুগ ও প্রকৃতি অনুপাতে ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করেছেন। তিনি আমাদের জন্য অল্প খাওয়ার এই ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করেছেন। যার দ্বারা কম আহার করার উদ্দেশ্য লাভ হবে।

অধিক আহারের মাতলামী

এমনভাবে পেট পুরে খাওয়া যে, পেটে আর কোনো জায়গাই অবশিষ্ট থাকে না, ফিকহের দৃষ্টিতে যদিও নাজায়েয ও হারাম নয়, কিন্তু এটা মানুষের জন্য দৈহিক ও আত্মিক অনেক রোগ সৃষ্টির কারণ। কারণ, যতো নাফরমানী ও গোনাহের কাজ আছে, সব ভরাপেটে মাথায় আসে। পেট ভরা না থাকলে গোনাহ ও নাফরমানীর কথা মাথায় ঢুকবে না। এজন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, পরিপূর্ণ খাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবে। এরই নাম হলো কম খাওয়ার মুজাহাদা।

কম কথা বলা একটি মুজাহাদা

দ্বিতীয় বিষয় হলো, কম কথা বলা। সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের জিহ্বা কেচির মতো চলতেই থাকে। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, যা মুখে আসছে; বলছি। এটা ঠিক নয়। এ জন্য জিহ্বাকে লাগাম না লাগানো এবং নিয়ন্ত্রণ না করা পর্যন্ত সে গোনাহ করতে থাকবে। মনে রাখবেন! হাদীস শরীফে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'মানুষকে অধমুখে জাহান্নামে ফেলার জিনিস হলো এই জিহ্বা।'[১]

এ জন্য জিহ্বাকে মুক্ত ছাড়া হলে এবং তাকে বাধা দেওয়া না হলে এ জিহ্বা মিথ্যা বলবে, গীবত করবে, মানুষকে কষ্ট দিবে। কথা দ্বারা মানুষকে কষ্ট দিবে। এসব গোনাহের কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

জিহ্বার গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে

এ জন্য মানুষকে কথা কম বলার মুজাহাদা করতে হয়। জিহ্বা দিয়ে অহেতুক কথা বলবে না। প্রয়োজন মোতাবেক কথা বলবে এবং কথা বলার

---

১. আল মু'জামুল কাবীর, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৪, হাদীস নং ১৬৬২৬

পূর্বে চিন্তা করবে যে, এ কথা বলা আমার জন্য সমীচীন কি না? এটা তো কোনো গোনাহের কথা নয়? বিনা কারণে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ কথা কম বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তখন কথা বলতে মন চাইবে, কিন্তু নিজের কামনা বাসনাকে দমন করার ফলে তার জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, এখন সে মিথ্যা বলা, গীবত করা এবং অন্যান্য গোনাহে লিপ্ত হবে না।

বৈধ বিনোদনের অনুমতি

অহেতুক আসর জমানো, যাকে বর্তমান পরিভাষায় গল্প-শল্প বলা হয়। কোনো দোস্তের সাথে সাক্ষাত হলো, ব্যস তাকে বললো, আসো, একটু গল্প করি। এই গল্পের আসর অবশ্যই মানুষকে গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, শরীয়ত আমাদেরকে অল্প-বিস্তর বিনোদনেরও অনুমতি দিয়েছে। বরং শুধু অনুমতিই নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

رَوِّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَاعَةً

'আত্মাসমূহকে কিছু বিরতি দিয়ে আরাম দাও।'[১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার উপর জীবন কোরবান করুন। আমাদের মেজাজ, আমাদের প্রকৃতি, আমাদের প্রয়োজন তাঁর চেয়ে বেশি আর কে চেনে? তিনি জানতেন, মানুষকে যদি বলা হয় আল্লাহর যিকির ছাড়া কিছু করো না, সারাক্ষণ কেবল যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকো, তাহলে মানুষ তা করতে পারবে না। কারণ এরা তো ফেরেশতা নয়, এরা তো মানুষ। এদের কিছুটা আরামেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিছুটা বিনোদনেরও প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য বিনোদনের উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলা, হাসি মজাক করা শুধু জায়েযই নয়, বরং পছন্দনীয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। কিন্তু এর মধ্যে অধিক ডুবে যাওয়া, এর জন্য ঘণ্টাকে ঘণ্টা বরবাদ করা, মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করা তো মানুষকে

---

১. কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭, হাদীস নং ৫৩৫৪, কাশফুল খফা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৩, হাদীস নং ১৪০০, সবুলুল হুদা অর রশাদ ফী সীরাতিল খায়রিল 'ইবাদ, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৯৪, জামেউ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাযলিহী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮, হাদীস নং ৪৮৩, জামেউল আহাদীস, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৪৮, হাদীস নং ১২৭৮৯

অবশ্যই গোনাহের দিকে নিয়ে যাবে। এজন্য বলা হচ্ছে, তোমরা কম কথা বলার অভ্যাস করো, এটাও একটা মুজাহাদা।

মেহমানের সাথে কথা বলা সুন্নাত

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি আসতেন। সে কথা বলতে খুব পছন্দ করতো। যখনই আসতো তখনই এদিক সেদিকের কথা শুরু করে দিতো এবং থামতো না। আমাদের সব বুযুর্গেরই নিয়ম ছিলো যখন কোনো মেহমান তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো তাকে তারা ইকরাম করতেন, তার কথা শুনতেন এবং যথাসাধ্য তার চাহিদা পুরা করার চেষ্টা করতেন। একজন ব্যস্ত মানুষের জন্য এ কাজ খুব কঠিন। যাদের কাজ ব্যস্ততায় ভরা তারা বুঝবেন যে, এ কাজ কতো কঠিন। কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিলো যে, যখন তাঁর নিকট কেউ সাক্ষাৎ করতে আসতো এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করতো তখন তিনি অন্যদিকে মুখ ফেরাতেন না। সে নিজে মুখ না ফেরানো পর্যন্ত তার কথা শুনতে থাকতেন। সুতরাং হাদীস শরীফের শব্দ হলো-

حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ

'সে নিজে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।'[১]

এ কাজটি খুবই কঠিন। কারণ, কতক মানুষ লম্বা কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। তাদের কথা পুরা মনযোগ সহকারে শোনা এক কঠিন কাজ। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণে আমাদের বুযুর্গগণ আগমনকারীদের কথা শুনতেন এবং তাদেরকে পরিতৃপ্ত করতেন।

ইসলাহের একটি পদ্ধতি

কিন্তু কোনো মানুষ ইসলাহের উদ্দেশ্যে আসলে তখন তাকে ধরতেন। মোটকথা, সে ব্যক্তি এসে কথা বলতে আরম্ভ করতো। হযরত ওয়ালেদ

---

১. আশশামাইলুল মুহাম্মাদিয়া, ইমাম তিরমিযী কৃত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৭, হাদীস নং ৩৩১, কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৪, হাদীস নং ১৮৫৩৫, আশশিফা বি-তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২০, দালাইলুন নুবুওয়্যাত, বাইহাকী কৃত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৯, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৪, আল মু'জামুল কাবীর, তবরানী কৃত, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩০

ছাহেব বিনম্রভাবে তার কথা শুনতেন। একদিন সে ব্যক্তি এসে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট বায়াতের আবেদন করলো যে, হযরত আমি আপনার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক করতে চাই। আমার জন্য কোনো ওযীফা এবং কোনো তাসবীহ বলে দিন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, তোমার জন্য কোনো ওযীফা এবং কোনো তাসবীহ নেই। তোমার কাজ হলো, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করো। এর উপর তালা লাগাও। তুমি যে সবসময় কথা বলতে থাকো, তোমার জিহ্বা থামে না, এটা ঠিক নয়। আগামীতে যখনই আসবে একেবারে চুপ করে বসে থাকবে। কোনো কথাই মুখ দিয়ে বের করবে না। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ঐ ব্যক্তির উপর তো কিয়ামত বয়ে যায়। তার জন্য চুপ করে বসে থাকার এই মুজাহাদা হাজার মুজাহাদার চেয়েও কঠিন ছিলো। এখন বার বার তার মনের মধ্যে কথা বলার চাহিদা সৃষ্টি হয়, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে সে চুপ থাকতে বাধ্য হয়। এই চিকিৎসার ফলে আল্লাহ তা'আলা তার তরীকতের পুরো পথ অতিক্রম করিয়ে দেন। কারণ, হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বুঝেছিলেন যে, তার মূল রোগ এটাই। যখন এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আসবে তখন সব কাজ সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক উপরে পৌছে দেন। প্রত্যেকের রোগ ভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্য মুরীদের অবস্থা দেখে শাইখ চিকিৎসা নির্ধারণ করেন যে, তার জন্য কোন চিকিৎসা উপকারী। যাইহোক, কথা কম বলাও একটা মুজাহাদা।

কম ঘুমানোও মুজাহাদা

তৃতীয় মুজাহাদা হলো কম ঘুমানো। পূর্ব যুগে না ঘুমানোর মুজাহাদা করা হতো। সুতরাং প্রসিদ্ধ আছে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. ইশার ওযু দিয়ে ফজরের নামায পড়তেন। কিন্তু বুযুর্গগণ বলেন, কম ঘুমানোর সীমানা হলো মানুষের দিন রাতে কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা অবশ্যই ঘুমানো উচিত। ৬ ঘণ্টার চেয়ে কম করবে না। অন্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং হযরত থানভী রহ. বলতেন, অসময়ে ঘুমানোর যদি অভ্যাস থাকে তাহলে তা বন্ধ করে দিবে। এটাও কম ঘুমানোর অন্তর্ভুক্ত। এটাও মুজাহাদা।

মানুষের সাথে সম্পর্ক কমানো

চতুর্থ মুজাহাদা হলো মানুষের সাথে মেলামেশা কমানো। কারণ, মানুষের সম্পর্ক যতো বাড়ে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ততো বাড়ে। অভিজ্ঞতা

অর্জন করে দেখে নাও। আজকাল তো সম্পর্ক বাড়ানো যথানিয়মে একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। যাকে পাবলিক রিলেশন বলা হয়। যার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের সাথে অধিক সম্পর্ক গড়ো, নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব বিস্তার করো এবং নিজের কাজ হাসিল করো। কিন্তু আমাদের বুযুর্গগণ বলতেন, অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক বাড়াবে না, বরং কমাবে।

দিল একটি আয়না

আল্লাহ তা'আলা মানুষের আত্মাকে একটি আয়না স্বরূপ বানিয়েছেন। যেই ছবি মানুষের সামনে অতিবাহিত হয় তার প্রতিচ্ছবি অন্তরে বসে যায়। মানুষের সাথে সম্পর্ক যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তার সামনে ভালো মানুষও আসে, খারাপ মানুষও আসে। খারাপ কাজে লিপ্ত মানুষের সঙ্গে মিলিত হলে তার প্রতিবিম্ব মানুষের অন্তরে পড়ে। এতে আত্মা খারাপ হয়ে যায়। এজন্য বলেন যে, অন্য মানুষের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয়ভাবে মিশবে না। অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যতো কম হবে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক ততো বৃদ্ধি পাবে। মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

تعلق حجاب است و بے حاصلی
چون پیوندہا بگسلی واصلی

অর্থাৎ, মাখলুকের সাথে অধিক সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক কায়েম করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ও পর্দা। দুনিয়ার মহব্বত যতো বৃদ্ধি পাবে এর সঙ্গে মহব্বত, ওর সঙ্গে মহব্বত, আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত ততো কমে যাবে। তবে বান্দার যেসব হক রয়েছে তা অবশ্যই আদায় করবে। তার মধ্যে ত্রুটি করবে না। কিন্তু বিনা কারণে সম্পর্ক বাড়ানো উচিত নয়। এরই নাম হলো কম মেলামেশা করা।

যাইহোক, এসব মুজাহাদা এজন্য করানো হয়, যাতে আমাদের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নাজায়েয কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ছেড়ে দেয়। এজন্য প্রত্যেক মানুষের এসব মুজাহাদা করা উচিত। মুজাহাদা কোনো রাহবারের তত্ত্বাবধানে করা উত্তম। নিজের মর্জি মতো এবং নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক করা ঠিক নয়। কারণ, মানুষ যদি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সে কতটুকু খাবে আর কতটুকু খাবে না, কতটুকু ঘুমাবে আর কতটুকু ঘুমাবে না, কতো মানুষের সাথে মেলামেশা করবে, আর কতো মানুষের সাথে মেলামেশা করবে

না। তাহলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিবে। কিন্তু যখন কোনো রাহবারের পথ প্রদর্শনে এ কাজ করবে তখন ইনশাআল্লাহ এর উপকারিতা লাভ হবে এবং প্রত্যেক কাজ ভারসাম্যের মধ্যে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ পদ্ধতি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, যখন তিনি কোনো নতুন কাপড় পরতেন, তা পাগড়ি হোক, জামা হোক বা চাদর হোক, তখন ঐ কাপড়ের নাম রাখতেন এবং এই দু'আ পড়তেন,

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩২-১৪৩, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, আসরের নামাযের পর বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী

'হে আল্লাহ আপনার শোকর যে, আপনি আমাকে এই পোষাক দান করেছেন। আমি আপনার কাছে এই পোষাকের কল্যাণ কামনা করছি এবং যেই কাজের জন্য একে বানানো হয়েছে তার মধ্যে উত্তম কাজ প্রার্থনা করছি এবং আমি এই পোষাকের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে সব খারাপ কাজের জন্য একে বানানো হয়েছে তার মন্দ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।'[১]

প্রত্যেক সময়ের দু'আ ভিন্ন

পোষাক পরার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করতেন। এটা তাঁর সুন্নাত। কারো যদি এই শব্দমালা মুখস্থ না থাকে তাহলে নিজ ভাষাতেই পোষাক পরিধানের সময় এসব কথা বলবে। উম্মতের উপরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিরাট ইহসান ও দয়া এই যে, তিনি পদে পদে আল্লাহ জাল্লা শানুহূর নিকট দু'আর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা সীমাহীন মুখাপেক্ষী হলেও চাওয়ার পদ্ধতি জানি না। কি চাইতে হবে এবং কীভাবে চাইতে হবে তাও আমাদের জানা নেই?

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পদ্ধতিও শিখিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে এভাবে চাও। সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য কাজ মানুষকে সম্পাদন করতে হয়। প্রায় প্রত্যেক আমলের জন্য পৃথক দু'আ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, সকাল বেলা যখন ঘুম থেকে জাগবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যখন ইস্তেঞ্জার জন্য যাবে, তখন এই দু'আ পাঠ করবে। এস্তেঞ্জা শেষ হলে বাইরে এসে এই দু'আ পাঠ করবে। যখন ওযু শুরু করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। ওযুর মাঝে এই দু'আ পাঠ করতে থাকবে। ওযু শেষ করে এই দু'আ পাঠ করবে। যখন নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। অতঃপর মসজিদে ইবাদত করতে থাকবে। মসজিদ থেকে যখন বাইরে বের হবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যখন বাজারে যাবে তখন এই দু'আ পাঠ করবে। যেন প্রত্যেক নড়া-চড়া, চলা-ফেরা, ওঠা-বসার বিষয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে, এই সব দু'আ এভাবে পাঠ করবে।

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৬৮৯, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫০৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১০৮১৮

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, নড়া-চড়ার সময় পৃথক পৃথক দু'আ কেন শিক্ষা দিলেন? এটা মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার এক অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার সহজতম এবং সংক্ষিপ্ততম পথ হলো, সব সময় মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে থাকবে এবং দু'আ করতে থাকবে। কুরআনে কারীম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, অধিক পরিমাণে তাঁর যিকির করো।'[1]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সবচে' উত্তম আমল কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, সবচে' উত্তম আমল হলো,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, তোমার জিহ্বা সবসময় যেন আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। সবসময় যেন আল্লাহর যিকির অব্যাহত থাকে।'[2]

সারকথা হলো, কুরআনে কারীমও অধিকহারে যিকির করার হুকুম দিয়েছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদীস শরীফে তার ফযীলতের বর্ণনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা যিকিরের মুখাপেক্ষী নন

এখন প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অধিক পরিমাণে যিকির করার হুকুম দিলেন কেন? আল্লাহ তা'আলার কি আমাদের যিকির দ্বারা কোনো লাভ হয়? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার কি এ কথায় মজা

---

১. সূরা আহযাব, আয়াত-৪১

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩২৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭০২০

লাগে যে, আমার বান্দা আমার যিকির করছে? এর দ্বারা কি তাঁর স্বাদ লাভ হয়? তার কোনো উপকার হয়? বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যার মারেফত আছে, তাঁর উপর যার ঈমান আছে, সে এ কথা কল্পনাও করতে পারে না। কারণ, সমস্ত জগত সবসময় প্রতি মুহূর্তে যদি আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাকে তাহলে তাঁর বড়ত্ব, তাঁর প্রতিপত্তি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সামান্যতম বৃদ্ধি পাবে না। আর যদি নাউযুবিল্লাহ সারা জগত মিলে এ কথার অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে না, আল্লাহ তা'আলাকে বিস্মৃত হবে, যিকির থেকে গাফেল থাকবে, গোনাহ্র কাজে লিপ্ত থাকবে, নাফরমানীর মধ্যে লিপ্ত থাকবে তাহলেও আল্লাহর বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে সামান্যতম হ্রাস পাবে না। আল্লাহর মহান সত্ত্বা তো বেনিয়াজ, অমুখাপেক্ষী, আল্লাহুসসামাদ। তিনি আমাদের যিকির থেকেও অমুখাপেক্ষী, আমাদের সিজদা থেকেও অমুখাপেক্ষী, আমাদের তাসবীহ থেকেও অমুখাপেক্ষী, আমাদের যিকিরের-ও তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফলত সমস্ত গোনাহের মূল

তাহলে যে, অধিকহারে আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে বলা হচ্ছে? এর দ্বারা মূলত আমাদেরই লাভ। কারণ, দুনিয়াতে যতো অপরাধ, যতো অপকর্ম এবং যতো মন্দ কাজ সংঘটিত হচ্ছে, এর সবগুলোর মূল যদি দেখা হয় তা হবে আল্লাহ তা'আলার থেকে গাফলত। যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়, আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন গোনাহে লিপ্ত হয়। তবে যদি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ অন্তরে থাকে, আল্লাহর যিকির অন্তরে থাকে এবং আল্লাহর সামনে জওয়াব দেওয়ার অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত থাকে যে, একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, তখন আর গোনাহ সংঘটিত হবে না।

চোর যখন চুরি করে তখন সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে। আল্লাহর স্মরণ যদি তার অন্তরে থাকতো তাহলে চুরি করতো না। ব্যভিচারকারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকে। আল্লাহর স্মরণ থেকে যদি গাফেল না হতো তাহলে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারতো না। এ বিষয়টিই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ[১]

অর্থাৎ, যখন ব্যভিচারকারী ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। সে সময় ঈমানদার না থাকার অর্থ হলো, সে সময় তার ঈমান উপস্থিত থাকে না। আল্লাহ তা'আলার স্মরণ এবং তাঁর যিকির উপস্থিত থাকে না। যখন চোর চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। অর্থাৎ, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ তার অন্তরে থাকে না। যদি ঐ সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ অন্তরে থাকতো তাহলে সে গোনাহে লিপ্ত হতো না। এ জন্য সমস্ত মন্দ কাজ, সমস্ত অন্যায় অত্যাচার, সমস্ত দুর্নীতি যা দুনিয়াতে ঘটছে সব কিছুর ভিত্তি হলো আল্লাহর যিকির থেকে গাফলতি।

আল্লাহ কোথায় গেছেন!

হযরত ওমর ফারুক রাযি. একবার সফরে যাচ্ছিলেন। বনের মধ্যে সফর ছিলো। তখন বর্তমান যুগের মতো হোটেলের ব্যবস্থা ছিলো না। যখন ক্ষুধা লাগলো এবং পাথেয় শেষ হয়ে গেলো তখন তিনি জনপদ তালাশ করলেন। পাশে কোনো জনপদ থাকলে সেখানে গিয়ে খানা খাবেন। তালাশ করে দেখলেন ছাগলের একটি পাল বিচরণ করছে। তিনি নিকটে গিয়ে রাখালকে তালাশ করলেন। তার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি মুসাফির। আমার ক্ষুধা লেগেছে। বকরীর দুধ বের করে আমাকে দাও এবং আমার থেকে তার দাম নিয়ে নাও। যাতে আমি দুধ পান করে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারি। এটা ঐ যামানার কথা যখন হযরত ওমর রাযি. অর্ধেক পৃথিবীর অধিক এলাকার শাসক ছিলেন, বাদশাহ ছিলেন। উত্তরে রাখাল বললো, জনাব! আমি আপনাকে অবশ্যই দুধ দিতাম। কিন্তু ব্যাপার হলো, এ ছাগলগুলো আমার নয়। এগুলো আমার মালিকের ছাগল। তিনি আমাকে শুধু চরানোর জন্য দিয়েছেন। এজন্য এ ছাগলগুলো আমার নিকট আমানত। দুধও আমার নিকট আমানত। এজন্য মালিকের অনুমতি ছাড়া এর দুধ দেওয়ার অধিকার আমার নেই। আমি অক্ষম। হযরত ওমর রাযি.-এর অন্তরে চিন্তা জাগলো এ

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৭৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৪৯, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৭৮৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৬৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯২৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৮৫৫

রাখালের একটু পরীক্ষা নেই। হযরত ওমর রাযি. রাখালকে বললেন, আমি তোমাকে একটি ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি। তুমি সেই অনুপাতে কাজ করলে তোমারও লাভ আমারও লাভ। রাখাল বললো সেটা কি? হযরত ওমর রাযি. বললেন, তুমি এক কাজ করো, একটা বকরী আমার কাছে বিক্রি করে তার মূল্য আমার থেকে নিয়ে নাও। এর দ্বারা আমার লাভ এই হবে যে, বকরীটাকে আমি সাথে রাখবো এবং যখন প্রয়োজন হবে তার দুধ পান করবো। আর তোমার লাভ এই হবে যে, তুমি বকরীর দাম পেয়ে যাবে। আর মালিক যখন জিজ্ঞাসা করবে বকরী কি হয়েছে? তখন তুমি বলবে, বাঘে নিয়ে গেছে। কারণ, এ ধরনের ঘটনা বনের মধ্যে ঘটেই থাকে। এজন্য সে বিশ্বাস করবে। এতে তোমারও কল্যাণ হবে, আমারও কল্যাণ হবে। রাখাল এ ব্যবস্থা শুনে সাথে সাথে বললো,

يَا هٰذَا فَأَيْنَ اللّٰهُ؟

'তাহলে আল্লাহ কোথায় গেছেন!'[১]

অর্থাৎ, এসব কাজ করলে আমার মালিক তো দেখবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো দেখবেন। এসব কিছু মূলত মিথ্যা এবং ধোঁকা। আল্লাহর সামনে কি উত্তর দেবো?

যিকির থেকে গাফলতির ফলে অপরাধ বেড়ে গেছে

এটা হলো আল্লাহর যিকির, আল্লাহর স্মরণ, যা অন্তরে এমনভাবে বসে গেছে যে, বনের নির্জনেও এবং রাতের অন্ধকারেও আত্মা আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে শূন্য হয়নি। যাইহোক, হযরত ওমর ফারুক রাযি. রাখালের উত্তর শুনে বললেন, তোমাদের মতো মানুষ যতোদিন এ পৃথিবীতে থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হয়ে জওয়াব দেওয়ার অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে জুলুম হবে না। কারণ, জওয়াবদিহিতার অনুভূতি নির্জনেও মানুষের অন্তরে পাহারা বসিয়ে থাকে। আর এ অনুভূতি অবশিষ্ট না থাকলে কী পরিণতি হয়, তা আপনারা দেখছেন। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন অধিদপ্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে,

---

১. উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২৮, ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর সফরের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ ভলিউমেই ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

আদালতে অন্তহীন এক ধারা চলছে, সৈন্য নিয়োজিত আছে, গলিতে গলিতে পাহারা বসানো আছে, এর পরেও ডাকাতি হচ্ছে, মানুষের জান-মাল ও সম্মানের উপর আক্রমণ হচ্ছে? অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কেন হচ্ছে? এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ অন্তরে না বসানো পর্যন্ত অপরাধের মূল বিলুপ্ত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হওয়ার অনুভূতি অন্তরে না থাকলে অপরাধের মূল বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহর ভয়ের বাতি অন্তরে না জ্বালানো পর্যন্ত হাজার পাহারা বসান, হাজার সৈন্য নিয়োগ দেন, কিন্তু অপরাধ বন্ধ হবে না। চোখের আড়াল হলেই অপরাধ সংঘটিত হবে। বরং যেই চোখ হেফাজতের জন্য নিয়োজিত ছিলো সেই চোখই অপরাধ করছে। মানুষের জান মালের নিরাপত্তার জন্য যাকে বসানো হয়েছিলো, সেই মানুষের জান মালের উপর ডাকাতি করছে। এ জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর যিকির এবং তাঁর স্মরণ অন্তরে না থাকবে জওয়াবদিহিতার অনুভূতি অন্তরে না থাকবে, সে পর্যন্ত অপরাধ নির্মূল হবে না।

অপরাধ নির্মূল করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অপরাধ তো নির্মূল করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুলিশ ছিলো না, অধিদপ্তর ছিলো না, আদালত ছিলো না, সেনাবাহিনী ছিলো না। কারো দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধী নিজে এসে কেঁদে কেঁদে বলতো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন, যাতে আখেরাতের শাস্তি থেকে বেঁচে যাই। আমাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলুন। ব্যাস, মূল কারণ এটাই ছিলো যে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ভয় অন্তরে বসে গেছিলো। এজন্য বলা হচ্ছে যে, অধিকহারে আল্লাহ তা'আলার যিকির করো। অন্যথায় আমাদের যিকির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোনো উপকার হয় না। যতো যিকির করবে ততোই আল্লাহ তা'আলার সামনে জওয়াব দেওয়ার অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত হবে। অতঃপর গোনাহ, নাফরমানি ও অপরাধ থেকেও বেঁচে যাবে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো।

মৌখিক যিকিরও উপকারী ও কাম্য

মানুষ বলে, যদি শুধু মুখে আল্লাহ আল্লাহ করা হয়, সুবহানাল্লাহ বলা হয় বা আলহামদুলিল্লাহ বলা হয় এবং আত্মা অন্য জায়গায় থাকে, মন-মগজ

অন্য জায়গায় থাকে তাহলে এতে কি লাভ? মনে রাখবেন! মুখে যিকির করা হলো প্রথম সিঁড়ি। এই সিঁড়ি অতিক্রম না করলে অন্যান্য সিঁড়িতে কি করে পৌছবেন। সারা জীবনেও পৌছতে পারবেন না। আর যদি এই সিঁড়ি অতিক্রম করেন এবং মুখে আল্লাহ আল্লাহ করেন তাহলে কমপক্ষে একটি সিঁড়ি তো অতিক্রম হলো। এরপর আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সিঁড়িও অতিক্রম করিয়ে দিবেন। এ জন্য এই যিকিরকে বেকার মনে করবেন না। এ যিকিরও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। আমাদের পুরো দেহ না হোক কমপক্ষে দেহের একটি অঙ্গ তো আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল আছে। যদি এতে লেগে থাকেন, মশগুল থাকেন তাহলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এটাই উন্নতি লাভ করবে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের হাকীকত

যাইহোক, আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর যিকির অন্তরে বসার নামই হলো তাআল্লুক মাআল্লাহ। অর্থাৎ, সব সময় আল্লাহ তা'আলার সথে কিছু না কিছু সম্পর্ক বজায় রাখা। সূফীয়ায়ে কেরামের সিলসিলায় যতো সাধনা, যতো মুজাহাদা, যতো ওযীফা ও যিকির আছে, সবকিছুর সারকথা এবং মূল উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক মজবুত করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক মজবুত হলে মানুষ থেকে আর গোনাহ সংঘটিত হয় না। বরং মানুষ তখন নিজের সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত উত্তম থেকে উত্তম পন্থায় সম্পাদিত করে। তখন মানুষের মধ্যে উত্তম গুণাবলী লাভ হয় এবং মন্দ চরিত্র থেকে মুক্তি লাভ করে। এ সব কিছু আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ হয়।

সব সময় চাইতে থাকুন

আল্লাহ তা'আলার সাঙ্গে এই সম্পর্ক অর্জনের জন্য সূফীয়ায়ে কেরাম লম্বা চওড়া মুজাহাদা করতেন হতো, সাধনা করানো হতো। কিন্তু আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব বলতেন, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক লাভের জন্য আমি তোমাদেরকে অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ একটি পথ বলছি, তা হলো সবসময় আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে থাকো এবং চাওয়ার অভ্যাস গড়ো। সবকিছু আল্লাহর কাছে চাও। যেই দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, পেরেশানী, প্রয়োজন, অভাব আছে, সব আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে থাকো। গরম

লাগলে বলো, হে আল্লাহ গরম দূর করে দিন। বিদ্যুৎ চলে গেলে বলো, হে আল্লাহ বিদ্যুৎ দান করুন। ক্ষুধা লাগলে বলো, হে আল্লাহ ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে দিন। ঘরে প্রবেশ করলে বলো, হে আল্লাহ ঘরে যেন ভালো দৃশ্য সামনে আসে। শান্তি এবং নিরাপত্তার খবর যেন পাই। কোনো পেরেশানীর কথা যেন না আসে। অফিসে প্রবেশ করার পূর্বে বলো, হে আল্লাহ অফিসে যাচ্ছি সব অবস্থা ঠিক করে দিন, মনের মতো করে দিন। সেখানে কোনো বিরূপ অবস্থা যেন সামনে না আসে। কোনো কষ্টকর পরিস্থিতি যেন সামনে না আসে। বাজারে যাচ্ছো তো বলো, হে আল্লাহ অমুক জিনিস ক্রয় করতে যাচ্ছি, উপযুক্ত মূল্যে তা দান করুন। সব সময় এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হও এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়ার অভ্যাস গড়ো।

এটি একটি ছোট ব্যবস্থাপত্র

যদিও বাহ্যিকভাবে এটা ছোট একটা বিষয়, কারণ এটা সীমাহীন সহজ কাজ। এ জন্য আমাদের নিকট এর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্রের উপর আমল করে দেখুন, আল্লাহ তা'আলার কাছে চেয়ে দেখুন। সবসময় আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ চাইতে থাকুন। যে বিষয়ই সামনে আসবে, যে সমস্যাই দেখা দিবে তা আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করুন, বলুন, হে আল্লাহ এ কাজ করে দিন। এটা যদি অভ্যাস করতে পারেন তাহলে কোনো মুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়া থেকে খালি যাবে না। যেমন সামনের দিক থেকে এক ব্যক্তি আপনার সাথে দেখা করতে আসছে, আপনি মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হন এবং বলুন, হে আল্লাহ এ ব্যক্তি যেন ভালো খবর নিয়ে আসে, কোনো খারাপ খবর যেন না নিয়ে আসে। হে আল্লাহ এ ব্যক্তি যে কথা বলতে চায় তার ভালো ফল দান করুন। ডাক্তারের কাছে ঔষধের জন্য যাচ্ছেন তো বলুন, হে আল্লাহ ডাক্তারের অন্তরে সঠিক ব্যবস্থাপত্র ঢেলে দিন। সঠিক ঔষধ তার অন্তরে ঢেলে দিন। প্রত্যেক বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়ার অভ্যাস করুন। এটা ছোট্ট ব্যবস্থাপত্র। হযরত ডা. ছাহেব বলতেন, এই ছোট্ট ব্যবস্থার উপর আমল করে দেখো কি থেকে কি হয়ে যায়! এর কারণে মানুষ কতো উর্ধ্বে উঠে যায়!

যিকিরের জন্য কোনো শর্ত নেই

মাসনূন দু'আসমূহের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত আমাদেরকে এই ব্যবস্থাপত্রের দিকে অগ্রসর করছেন যে, যখনই কোনো

সমস্যা দেখা দিবে তখনই আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইবে এবং দু'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা চাওয়াকে এবং প্রার্থনাকে এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্য কোনো শর্ত নেই। যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়া যায়। ওযুর শর্ত নেই, কিবলামুখী হওয়ার শর্ত নেই, এমনকি গোসল ফরয হলেও দু'আ করা নিষেধ নয়। যদিও এ অবস্থায় কুরআনে কারীম তিলাওয়াত জায়েয নেই। কিন্তু দু'আ করা যায়। এমনকি পেশাব পায়খানার সময় মৌখিকভাবে তো কোনো যিকির করা উচিত নয়, কিন্তু তখনও মনে মনে যিকির করতে কোনো বাধা নেই। যাইহোক, আল্লাহ তা'আলা যিকিরকে এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্য কোনো শর্ত আরোপ করেননি। এর জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি দেননি। সুযোগ সুবিধা হলে ওযুর সাথে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করুন। যদি এমন সুযোগ না থাকে তাহলে ওযুর শর্ত নেই, হাত উঠানোর শর্ত নেই, মুখে বলার শর্ত নেই, অন্তরে অন্তরে আল্লাহর কাছে চান- হে আল্লাহ! আমার এ কাজটি করে দিন।

হযরত থানভী (কু.সি.) বলেন, যখন কোনো মানুষ প্রশ্ন করতে এসে বলে, হযরত একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, তখন সাথে সাথে মনে মনে আল্লাহর দিকে মনযোগী হয়ে দু'আ করি, হে আল্লাহ! জানা নেই এই ব্যক্তি কি জিজ্ঞাসা করবে? হে আল্লাহ তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার অন্তরে ঢেলে দিন এবং কখনোই এর ব্যতিক্রম হয় না। সব সময় আমি এর উপর আমল করি।

মাসনূন দু'আর গুরুত্ব

প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়ার পদ্ধতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শিখিয়েছেন যে, চাওয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গা বলে দিয়েছেন যে, এই এই জায়গায় অবশ্যই চাও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বিরাট দয়ার জন্য নিজেকে কতাওবান করুন যে, তিনি দু'আ করাও শিখিয়েছেন। আরে! তুমি কি চাইবে, কিভাবে চাইবে, কোন শব্দে চাইবে, তোমার তো চাওয়ার পদ্ধতিও জানা নেই। এই চাওয়ার পদ্ধতিও আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা চাও, এভাবে চাও, এই ভাষায় চাও। এ সবকিছু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। এখন আমাদের কাজ হলো এ সমস্ত দু'আ মুখস্থ করা এবং যথা সময়ে মনযোগ

সহকারে এসব দু'আ করা। আমাদের কাজ মাত্র এতোটুকু। সব কাজ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গেছেন। উম্মতের সামনে পাকানো রুটি দিয়ে গেছেন। এখন উম্মতের কাজ হলো রুটি উঠিয়ে গলাধঃকরণ করা। আমাদের দ্বারা এতোটুকু কাজও হয় না। ওলামায়ে কেরাম দু'আয়ে মাছুরা এবং মাসনূন দু'আর নামে অসংখ্য কিতাব লিখে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে এসব দু'আ একত্রিত করেছেন। যাতে প্রত্যেক মুসলিম সহজে এগুলোকে মুখস্থ করতে পারে। আগের যুগে মুসলিম পরিবারের রেওয়াজ ছিলো যখন বাচ্চারা কথা বলতে আরম্ভ করতো, তখন সর্ব প্রথম এসব দু'আ শিখানো হতো যে, বেটা বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খাও, খানা খাওয়ার পর এই দু'আ পড়ো, বিছানায় গিয়ে এই দু'আ পড়ো, কাপড় পরে এই দু'আ পড়ো; এর ফলে এ সব কাজের জন্য ক্লাস করার প্রয়োজন পড়তো না। আর শিশুকালের স্মরণশক্তি এমন হয় যে, পাথরের উপর অঙ্কন করার মতো সারা জীবন মনে থাকে। বয়স বেড়ে গেলে মুখস্থ করা সহজ নয়। যাইহোক, এই কাজ করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিম একে গণীমত মনে করবে। এ সমস্ত মাসনূন দু'আ লম্বা চওড়া নয়। বরং ছোট ছোট দু'আ। প্রতিদিন এসব দু'আর মধ্যে থেকে একটি করে মুখস্থ করুন। এরপর দেখুন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কি পরিমাণ নূর এবং বরকত দান করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সব সময় তাঁর যিকিরে মশগুল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ওয়াসওয়াসার প্রতিকার *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, অন্তরে কুফর, শিরক এবং ফিসক ও ফুজুরের যে সব ওয়াসওয়াসা আসে তার বিধান কি? উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

ذَاكَ مَحْضُ الْإِيْمَانِ

'এ সব ওয়াসওয়াসা নিখাদ ঈমানের আলামত।'[1]

এসবের কারণে ঘাবড়াবে না এবং নিরাশ হবে না। এসবের কারণে অধিক পেরেশন হবে না। কারণ এটা নিখাদ ঈমানের আলামত।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৫৬-১৭৫, আসরের নামাযের পর জামে মসজিদ বাইতুল মোকাররম, করাচী

১. কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ১২৫৮, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৯, মাজমাউয জাওয়াইদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২, জামিউল আহাদীস, হাদীস নং ১২৪৭৩, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৪৭৯৬, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং ৮৫৪২, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৪৯, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, হাদীস নং ১৭৯৬, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৩৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫০, হাদীস নং ৩৫৯

এক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কতক সময় আমাদের অন্তরে এমন সব চিন্তা এবং ওয়াসওয়াসা আসে যে, সেগুলো মুখে উচ্চারণ করার তুলনায় জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়া অধিক পছন্দনীয়। অর্থাৎ, এসব চিন্তার কথা মুখে আনা আগুনে জ্বলে যাওয়ার চেয়ে অধিক খারাপ লাগে। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো ঈমানের আলামত।[১]

শয়তান ঈমান চোর

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে বলতেন যে, ওয়াসওয়াসা হলো শয়তানের কাজ। শয়তানই মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে। শয়তান হলো ঈমান চোর। সে আপনার ঈমানের উপর ডাকাতি করতে চায়। যে ঘরে সম্পদ থকে, চোর এবং ডাকাত সেই ঘরে ডাকাতি করে। যদি সম্পদই না থাকে তাহলে ডাকাত ডাকাতি করবে না। তাই শয়তান যে আপনাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে এবং আপনাদের অন্তরে প্রবেশ করছে তা এ কথার আলামত যে, আপনাদের অন্তরে ঈমানের দৌলত রয়েছে। যদি ঈমানের দৌলত না থাকতো তাহলে এই ডাকাত আপনাদের ঘরে প্রবেশ করতো না। এজন্য ওয়াসওয়াসার কারণে ঘাবড়াবেন না। আপনি যে বলছেন, আমার অন্তরে এমন সব ওয়াসওয়াসা আসে তা প্রকাশ করার তুলনায় জ্বলে মরে যাওয়া অধিক পছন্দনীয়। এ কথা আপনার ভিতর থেকে আপনার ঈমান বলছে। আপনার ঈমান বলছে যে, এ কথা মুখে প্রকাশ করা যাবে না। অন্তরে ঈমান না থাকলে এমন হতো না। এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, এটা তো একান্ত ঈমানের আলামত।

ওয়াসওয়াসার কারণে পাকড়াও করা হবে না

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

'আল্লাহ তা'আলার শোকর যে তিনি শয়তানের ষড়যন্ত্র এবং জালকে ওয়াসওয়াসার সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, এর চেয়ে সামনে অগ্রসর হতে দেননি।'[২]

---

১. কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৪৪০, হাদীস নং ১২৬৩

২. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৪, সুনানে আবু দাউদে এ বর্ণনাটি এভাবায় এসেছে-

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, শয়তানের চেষ্টা তোমার উপর এর চেয়ে অধিক কার্যকর হয় না।

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا

'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের অন্তরে উদিত ওয়াসওয়াসাসমূহ মাফ করে দিয়েছেন।'[১]

অর্থাৎ, এগুলোর জন্য পাকড়াও করবেন না, তবে সে অনুপাতে আমল করলে পাকড়াও করা হবে।

আকীদা সম্পর্কে অনাহূত চিন্তা

ওয়াসওয়াসা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক হয়ে থাকে আকীদা সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা। অর্থাৎ, শয়তান আল্লাহ তা'আলার জাত ও আখেরাতের বিষয়ে অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, জানা নেই আখেরাত আসলেও আছে কি নাই। এ ধরনের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন যে, তুমি নিজের আকীদা ঠিক রাখলে এরপর এ সমস্ত অনাহূত চিন্তা বা ওয়াসওয়াসা যতই আসুক না কেন, এ জন্য ইনশাআল্লাহ পাকড়াও করা হবে না এবং এসব চিন্তার কারণে মানুষ কাফেরও হবে না। এ সব চিন্তার কারণে কতক মানুষ মনে করে যে আমি শয়তান হয়ে গেছি, আমি কাফের হয়ে গেছি। মনে রাখবেন এসব ওয়াসওয়াসা অন্তরে আসার দ্বারা কিছু হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ নিজের মন, নিজের জিহ্বা এবং নিজের আমলে মুমিন থাকে। এ জন্য এ ব্যাপারে মানুষের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

গোনাহের চিন্তা

দ্বিতীয় হলো, গোনাহ করার এবং পাপ কাজ করার ওয়াসওয়াসা ও খেয়াল আসা। যেমন অন্তরে এই খেয়াল আসলো যে, অমুক গোনাহটি করি। কোনো গোনাহের দিকে মন ধাবিত হলো এবং তার দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ إِلَى الْوَسْوَسَةِ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৪৮

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৪৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৮৮, সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২০৩০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৪৫

হলো। যদি অন্তরে শুধু চিন্তা আসে তবে এজন্য ইনশাআল্লাহ পাকড়াও করা হবে না, যে পর্যন্ত চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা অনুপাতে কাজ না করবে। কিন্তু যদি গোনাহের চাহিদা অনুপাতে আমল করে তাহলে এটা পাকড়াও যোগ্য হয়ে যাবে। এ জন্য পাকড়াও করা হবে। তাই যখনই কোনো গোনাহের খেয়াল বা ওয়াসওয়াসা আসবে যে অমুক গোনাহটি করি, অবিলম্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাইবে যে, হে আল্লাহ! আমার অন্তরে এই গোনাহের চিন্তা আসছে, আমি আপনার কাছে এ থেকে পানাহ চাচ্ছি। আপনি আমাকে এই গোনাহ থেকে রক্ষা করুন। এভাবে এই অনাহূত চিন্তা ও ওয়াসওয়াসাকে প্রতিহত করবে।

মন্দ চিন্তার সময় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে যে, তিনি যখন পরীক্ষায় আক্রান্ত হন এবং সেই পরীক্ষার ফলে অন্তরে গোনাহের কিছু ওয়াসওয়াসা আসে- কারণ তিনি তো মানুষই ছিলেন- তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই দু'আ করেন,

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

'যদি আপনি আমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত না করেন তাহলে আমার আত্মাও তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে, আর যারা অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হয়ে যাবো।'[১]

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি যদি ঐসব মহিলার চক্রান্তকে আমার থেকে দূর করে না দেন তাহলে আমিও তো একজন মানুষ আমি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবো। ফলে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হবো। এ জন্য ঐসব মহিলাদের চক্রান্তকে আমার থেকে দূর করে দিন। যখনই কোনো গোনাহের চিন্তা বা ওয়াসওয়াসার চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হবে সাথে সাথে আল্লাহ দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর নিকট আশ্রয় চাইবে যে, হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে এই গোনাহ থেকে হেফাজত করুন। এবং তখন নিজের হিম্মতকে জীবন্ত করবে যে, আমি গোনাহের এই চাহিদার উপর আমল করবো না। যদি এ কাজ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ এসব অনাহূত চিন্তা এবং ওয়াসওয়াসার কারণে কোনো ক্ষতি হবে না।

---

১. সূরা ইউসূফ, আয়াত-৩৩

নামাযের মধ্যে উদিত বিভিন্ন চিন্তার বিধান

ওয়াসওয়াসার তৃতীয় প্রকার যদিও মুবাহ বা বৈধ। কারণ তা কোনো গোনাহের চিন্তা নয়। কিন্তু সে চিন্তা মানুষকে ইবাদত এবং আনুগত্যের দিকে মনোযোগী হওয়া থেকে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন, নামাযের নিয়ত বাঁধার সাথে সাথে সারা দুনিয়ার চিন্তা চক্রের মতো ঘুরতে আরম্ভ করে। সে সব গোনাহের চিন্তা না হলেও- যেমন খানা-পিনার চিন্তা, বিবি-বাচ্চার চিন্তা, নিজের রুজির চিন্তা, ব্যবসার চিন্তা এ সমস্ত চিন্তা মৌলিকভাবে গোনাহের নয়- কিন্তু এ সব চিন্তার করণে মন নামাযের দিকে ধাবিত হতে পারে না। এ সব চিন্তার কারণে খুশুর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তাই এসব চিন্তা যেগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে আসে এবং তার মধ্যে মানুষের ইচ্ছার কোনো দখল থাকে না, ইনশাআল্লাহ সেগুলোর কারণে পাকড়াও করা হবে না, বরং তা মাফ। তবে নিজে ইচ্ছা করে নামাযের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা জাগ্রত করবে না এবং সে দিকে মনযোগ দিবে না। বরং 'আল্লাহু আকবার' বলে যখন নামায শুরু করবে তখন মনকে নামাযের দিকে আকৃষ্ট করবে, মনযোগী করবে। যখন ছানা পড়বে তার দিকে ধ্যান দিবে এবং যখন সূরায়ে ফাতেহা পড়তে আরম্ভ করবে তখন তার দিকে মনযোগ দিবে। এরপর মনযোগ দেওয়া সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে মন অন্যদিকে যদি সরে যায় এবং বিভিন্ন অনাহূত চিন্তা জাগতে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ এজন্য পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যেই মাত্র সর্তক হবে যে, আমি তো অন্য মনস্ক হয়ে গেছি, তখন পুনরায় নামাযের দিকে মনকে ফিরিয়ে আনবে। নামাযের শব্দ এবং যিকিরের দিকে ফিরিয়ে আনবে। বারবার এইভাবে করতে থাকবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ এ সব চিন্তার আগমন হ্রাস পেতে থাকবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খুশু দান করবেন।

নামাযের অবমূল্যায়ন করবেন না

যাইহোক, নামাযের মধ্যে যে সব চিন্তা আসে সেগুলোর কারণে অনেক মানুষ খুব বেশি পেরেশন হয় এবং মনে করে যে, আমার নামায তো ওঠা-বসা মাত্র। এর মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। মনে রাখবেন! নামাযের এমন অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। আরে এটা তো আল্লাহ তা'আলার দয়া যে, তিনি আপনাকে নামায পড়ার তাওফীক দান করেছেন। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করুন এবং এ সব চিন্তার কারণে নিজের নামাযকে

বেকার মনে করবেন না। নামাযের তাওফীক পাওয়া তো আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। এ সব অনিচ্ছাকৃত চিন্তার কারণে ইনশাআল্লাহ আপনাকে পাকড়াও করা হবে না। তবে সেচ্ছায় নামাযের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা আনবে না।

ইমাম গাযালী রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত ইমাম গাযালী রহ. অনেক উঁচু মাপের আলেম এবং সূফী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক উঁচু মাকাম দান করেছিলেন। তার এক ভাই নিখাদ সূফী মেজাজের লোক ছিলেন। ইমাম গাযালী রহ. যখন ইমামতি করতেন এবং নামায পড়াতেন, তখন তার এই ভাই তার পিছনে নামায পড়তেন না। একজন তার মায়ের কাছে অভিযোগ করলো যে, ইনি তো তার পিছনে নামায পড়েন না। মা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি তার পিছনে নামায পড়ো না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, তার নামাযই বা কি হয়! আমি তার পিছনে কী নামায পড়বো! কারণ, যখন সে নামায পড়ায় তার মন মগজে তখন হায়েয নেফাসের মাসআলা বিরাজ করতে থাকে। এজন্য এটা তো নাপাক নামায। আমি তার পিছনে নামায পড়ি না। তিনি তো ছিলেন ইমাম গাযালী রহ.-এর মা। উত্তরে তিনি বললেন, তোম. . ভাই তো নামাযের মধ্যে মাসআলা নিয়ে চিন্তা করে, আর নামাযের মধ্যে মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা জায়েয। আর তুমি নামাযের মধ্যে তোমার ভাইয়ের দোষ তালাশ করতে থাকো। দেখতে থাকো যে, তার নামায সঠিক না অঠিক। নামাযের মধ্যে এমন করা নিঃসন্দেহে হারাম। এজন্য বলো, সে উত্তম না তুমি উত্তম? যাই হোক, ইমাম গাযালীর মা-ও বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন যে, নামাযের মধ্যে মাসআলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা কোনো গোনাহের কাজ নয়। এজন্য স্বেচ্ছায় এমন চিন্তা আনা, যা ইবাদত এবং আনুগত্যের অংশ, তাও নামাযের খুশুর পরিপন্থী নয়।

কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করার বিধান

সুতরাং কুরআনুল কারীম পড়ার সময় তার আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং সেদিকে মনযোগ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। এখন যদি নামাযের তিলাওয়াতের সময় কুরআনে কারীমের বিভিন্ন রহস্য ও হিকমতের মধ্যে কারো মনযোগ নিবদ্ধ হয়, তবে এটা জায়েয এবং ইবাদতেরই একটি অংশ।

এজন্য ইবাদত সংক্রান্ত কোনো চিন্তা নামাযের মধ্যে ইচ্ছা করেও আনা যায়। তবে যে সব চিন্তা ইবাদতের অংশ নয়- যেমন দুনিয়ার বিষয় বিভিন্ন চিন্তা যে, কীভাবে উর্পাজন করবো, কীভাবে খরচ করবো ইত্যাদি- এ সব চিন্তা স্বেচ্ছায় নামাযের মধ্যে আনবে না। আপনা আপনি আসলে আসতে দিবে। এতে নামাযের খুশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। হ্যাঁ, যখন বুঝতে পারবে যে, অন্তরে বিভিন্ন চিন্তা উদিত হচ্ছে, তখন তা অব্যাহত রাখবে না। সেগুলোকে অব্যাহত রাখা এবং তার দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা নাজায়েয। এ কারণে যখন সর্তক হবে, তখন পুনরায় নামাযের দিকে মনকে আকৃষ্ট করবে।

সেজদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ.-এর খেদমতে এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলো, হযরত আমি খুব পেরেশান। কারণ আমার নামায কোনো কাজের নয়। যখন আমি সেজদা করি তখন আমার মন-মগজে এমন সব খাহেশাত এবং খারাপ চিন্তার ভিড় জমে যে, আল্লাহর পানাহ! তো সেটা সেজদা কি করে হলো! সেটা তো শুধুমাত্র মাটিতে ঠোকর মারা হলো। আমি খুব পেরেশান যে, কীভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি? আমাদের হযরত বললেন, তুমি যে সেজদা করো, তোমার মতে সেই সেজদা কেমন? সে বললো, হযরত বড়ো নাপাক এবং বড়ো গান্দা সেজদা। কারণ, এর মধ্যে বিভিন্ন নাপাক খাহেশাতের চিন্তা জাগ্রত হয়। হযরত বললেন, এই নাপাক এবং গান্দা সেজদা তো আল্লাহর জন্য করা উচিত নয়। ঠিক আছে, এমন একটা সেজদা তুমি আমাকে করো। কারণ, আল্লাহ তা'আলার জন্য তো অনেক পবিত্র ও উঁচু মানের সেজদা হওয়া উচিত। এটা তো নাপাক সেজদা। এই জন্য এটা আমার মতো নাপাক মানুষের সামনেই করো। তখন সে ব্যক্তি বলতে আরম্ভ করলো, তাওবা! তাওবা! আপনাকে কী করে সেজদা করবো? হযরত বললেন, ব্যাস, এতে বোঝা গেলো এই সেজদা আল্লাহর জন্যই। এই কপাল তো অন্য কারো সামনে ঝোঁকার নয়। এই সেজদার মধ্যে যতো ধরনের নোংরা চিন্তাই জাগ্রত হোক না কেন। কিন্তু এই কপাল ঝুঁকালে একমাত্র আল্লাহর সামনেই ঝুঁকবে। এজন্য এই সেজদা আল্লাহর জন্যই। আর এ সব খারাপ চিন্তা যা অনিচ্ছাকৃতভাবে আসছে, ইনশাআল্লাহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ।

বিভিন্ন চিন্তা এবং ওয়াসওয়াসা আসার মধ্যেও হিকমত রয়েছে

দেখুন! আমাদের মতো মানুষের নামাযের মধ্যে যদি এসব চিন্তা এবং ওয়াসওয়াসা না আসে। আমরা যদি খুব খুশু খুযুর সঙ্গে নামায পড়তে পারি। আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা অন্তরে না আসে। আমাদের মতো মানুষের এ রকম মাকাম লাভ হলে আল্লাহই ভালো জানেন যে, আমাদের মন-মগজে তখন কী রকম অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি হবে! তখন আমরা মনে করবো যে, আমরা তো অনেক উপরে পৌছে গেছি। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন,

صَلَّى الْحَايِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ

'এক (জোলা) লোক দুই রাকাত নামায পড়ে ওহির অপেক্ষায় বসে থাকলো।'

আমাদের মধ্যেও যদি কারো এমন খুশু-খুযুওয়ালা নামায লাভ হয়, তাহলে আল্লাহ না করুন সে পয়গাম্বর বা মাহদি হওয়ার দাবি করে বসবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পাত্র অনুপাতে মাকাম দান করে। এজন্য বিভিন্ন চিন্তা আসার মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন হিকমত এবং কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

নেক কাজ এবং গোনাহের ইচ্ছার উপর পুরস্কার

যাইহোক, এ হাদীসের সার কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে আত্মার চিন্তার উপর পাকড়াও করা হবে না। কারণ, আল্লাহর রহমত বিস্ময়কর। তিনি গোনাহের বিষয়ে এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যদি অন্তরে গোনাহ করার আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং মনে মনে ইচ্ছাও করে যে, আমি এই গোনাহ করবো, তবে সে ইচ্ছা সংকল্প ও পোক্ত না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। বরং যদি বারবার গোনাহের খেয়াল আসতে থাকে আর মানুষ সেই খেয়ালকে প্রতিহত করতে থাকে এবং সে অনুপাতে আমল না করে তাহলে ইনশাআল্লাহ গোনাহ না করার কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে ছওয়াব ও পুরস্কার লাভ হবে। কারণ, গোনাহের চিন্তা জাগা সত্ত্বেও সে গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এবং নেকীর বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার মূলনীতি এই যে, যদি কোনো নেক কাজের চিন্তা অন্তরে জাগে এবং তা করতে ইচ্ছা করে যে, আমি

অমুক নেক কাজটি করবো, যদিও নেক কাজটি করার জন্য পোক্ত ইরাদা করেনি, তবুও শুধু ইচ্ছা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছওয়াব দান করবেন। যেমন ইচ্ছা করলো যে, আমার যদি মাল হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় এ পরিমাণ মাল দান করবো। তো এর জন্যও তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে। বা ইচ্ছা করলো যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সুযোগ হলে জিহাদ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবো। তো এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও শহীদদের মধ্যে গণ্য করবেন। হাদীস শরীফে এসেছে,

مَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

'কোনো ব্যক্তি যদি আত্মা থেকে শাহাদাত কামনা করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মধ্যেই গণ্য করবেন, যদিও বিছানাতে তার মৃত্যু হয়।'[১]

যাইহোক, নেক কাজের ব্যাপারে নিয়ম হলো, পোক্ত ইরাদা করার পূর্বেও আল্লাহ তা'আলা নেকী দান করেন এবং গোনাহের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, পোক্ত ইরাদা না করা পর্যন্ত পাকড়াও করা হবে না। এটা আল্লাহ তা'আলার রহমতের ব্যাপার।

বিভিন্ন চিন্তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

যাইহোক, গোনাহের পোক্ত ইরাদা করা থেকে বাঁচা উচিত। কিন্তু গোনাহের যে সব ওয়াসওয়াসা ও চিন্তা আসে তার পরোয়া করা উচিত নয়। বরং নিজের কাজে লেগে থাকা উচিত। এসব চিন্তার কারণে কাজ ছেড়ে দিবে না। হযরত রহ. বলতেন যে, এসব চিন্তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক ব্যক্তিকে বাদশা দাওয়াত দিলো। এখন এই ব্যক্তি দ্রুত বাদশার সাক্ষাতে যাচ্ছে। কোনো ব্যক্তি যদি সে সময় তার জামায় পাড়া দেয় বা হাত ধরে তাকে চলার পথে বাধা দেয় এবং তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে, তাকে উত্ত্যক্ত করে, তাহলে বলুন, এ ব্যক্তি কি যারা তাকে পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫৩২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৭৭, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৩১১১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৯৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৭৮৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১০৯৪

ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, না তার সফর অব্যাহত রাখবে? এ ব্যক্তি যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তাহলে কখনোই বাদশার দরবারে পৌছতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে এ কথা চিন্তা করে যে, এ লোক তো পাগল, বেওকুফ, সে আমার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, আমাকে তো এখনই বাদশার দরবারে যেতে হবে এবং তার সাথে সাক্ষাতের মর্যাদা লাভ করতে হবে, তাহলে সে ওদিকে মনযোগই দিবে না।

ইচ্ছা করে চিন্তা নিয়ে আসা গোনাহ

হযরত থানভী রহ.-কে এক ব্যক্তি চিঠিতে লেখে যে, হযরত! আমি যখন নামাযে দাঁড়াই তখন বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসতে থাকে এবং এ কারণে পেরেশানী হয় যে, আমার নামায তো কিছুই হয় না। হযরত তার উত্তরে লেখেন যে, চিন্তা আসা গোনাহ নয়, চিন্তা আনা গোনাহ। অর্থাৎ যদি ঐ সব চিন্তা নিজে নিজে আসে তবে এটা গোনাহ নয়। জেনে বুঝে ইচ্ছা করে অন্তরে চিন্তা আনা এটা গোনাহ।

বিভিন্ন চিন্তা আসার প্রতিকার

বিভিন্ন চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা আসার প্রতিকার এই যে, এসব চিন্তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং মনযোগ দিবে না। যখন মনযোগ দিবে না তখন ইনশাআল্লাহ এসব চিন্তা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। নিজের কাজ করতে থাকবে। যখন নামাযের নিয়ত বাঁধবে তখন নিজের মনকে নামাযের দিকে ধাবিত করবে। হযরত থানভী রহ. তাঁর ওয়ায ও মালফূযাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নামায সত্ত্বাগতভাবেই কাম্য। এজন্য যদি অনিচ্ছাকৃত চিন্তা আসতে থাকে তো এ কারণে নামাযের অবমূল্যায়ন করো না। বেশিরভাগ নামাযী প্রশ্ন করে থাকে যে, আমরা নামায পড়ি, কিন্তু নামাযের মধ্যে মজাই আসে না। বা এরকম বলে থাকে যে, আগে তো নামাযের মধ্যে খুব স্বাদ উপভোগ হতো, এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। তার উত্তর এই যে, ভাই! নামায এ জন্য ফরয করা হয়নি যে, এর মধ্যে আপনি মজা পাবেন, স্বাদ উপভোগ করবেন। বরং এটা তো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং বন্দেগীর একটি তরীকা। তাই নামাযের মধ্যে স্বাদ উপভোগ হলে তা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। আর যদি স্বাদ উপভোগ না হয় তাহলে এ কারণে নামাযের ফযীলত মোটেও কম হবে না। আপনি যদি নামাযের

রুকন, শর্ত ও আদবসমূহ পূরণ করেন এবং সুন্নাত মোতাবেক নামায আদায় করেন তাহলে সারাজীবনেও স্বাদ উপভোগ না হলে আপনার কোনো ক্ষতি নেই। নামাযের মধ্যে স্বাদ উপভোগ হলেও নামায পড়তে হবে এবং স্বাদ উপভোগ না হলেও নামায পড়তে হবে।

মন না লাগলেও নামায পড়তে হবে

যদি নামাযের মধ্যে স্বাদ উপভোগ না হয় এবং নামায পড়তে কষ্ট অনুভব হয় কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি নামায পড়তে থাকেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনাকে অধিক ছওয়াব দেওয়া হবে। কারণ নামায পড়তে মন চাচ্ছে না, নফস দুষ্টামি করছে, কিন্তু আপনি জোর জবরদস্তি আল্লাহর ইবাদতের খাতিরে এবং তার আনুগত্যের খাতিরে নফসের উপর চাপ সৃষ্টি করে নামায পড়লেন। তো ইনশাআল্লাহ এই নামাযে আপনি অধিক ছওয়াব লাভ করবেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব গাঙ্গুহী রহ. বলেন, যে ব্যক্তির সারা জীবনেও নামাযের মধ্যে স্বাদ আসেনি তারপরেও সে নামায ছাড়েনি, বরং নিয়মিতভাবে নামায পড়েছে, আমি তাকে দুইটি মুবারকবাদ দিচ্ছি। একটি এই যে, নামাযের মধ্যে মজা না আসা সত্ত্বেও সে নামায পড়তে থেকেছে, ইনশাআল্লাহ এ কারণে তার বেশি ছওয়াব হবে। আর দ্বিতীয়টি এই যে, নামাযের মধ্যে স্বাদ লাগলে সন্দেহ ছিলো যে, হয় তো সে নফসের স্বাদের কারণে নামায পড়েছে। কিন্তু যখন নামাযের মধ্যে স্বাদই আসেনি, তখন এই সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। তাই জানা গেলো যে, সে শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যই নামায পড়েছে। তাই এর মধ্যে ইখলাস অধিক ছিলো। এ কারণে আরো অধিক ছওয়াব হয়েছে। এজন্য নামাযের মধ্যে স্বাদ এলো কি এলো না এবং স্বাদ পেলাম কি পেলাম না, সে চিন্তা করবে না।

মানুষ আমলের জন্য আদিষ্ট

অনেকেই চিঠিতে লেখেন, এমন এক সময় ছিলো যখন নামায পড়তে অসাধারণ স্বাদ এবং অপূর্ব অনুভূতি সৃষ্টি হতো। তাছাড়া নামাযের মধ্যে দুনিয়ার কোনো খবর থাকতো না। এখন সেই স্বাদ নেই, সেই উপভোগ হয় না। শয়তান তো আমাকে মরদূদ বানিয়ে দেয়নি? ভালো করে বুঝুন! এগুলো অনিচ্ছাকৃত অবস্থা। এর মধ্যে মানুষের ইচ্ছার কোনো দখল নেই। স্বাদ উপভোগ হওয়া আর না হওয়া মানুষের ক্ষমাতভুক্ত নয় এবং মানুষ তার জন্য

আদিষ্টও নয়। মানুষ তো কেবল আমলের জন্য আদিষ্ট। দেখার বিষয় হলো, আমল করেছে কি না। আমল করে থাকলে তখন দেখার বিষয় হলো, সেই আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক করেছে কি না। যদি এভাবে আমল করে থাকে তাহলে কোনো ধরনের স্বাদ উপভোগ হোক বা না হোক নামাযের দায়িত্ব পালন হয়েছে এবং আপনার সে আমল কবুল হয়েছে। এর কারণ হলো, এ সমস্ত ভাব ও অনুভূতি আসে আর যায়। আমল কবুল হওয়া এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয় এবং এগুলোর উপর নাজাতও নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণীতে আমলের তাওফীক হচ্ছে এজন্য তাঁর শোকর আদায় করতে থাকুন।

ভাব না উদ্দেশ্য, না ক্ষমতাভুক্ত

যেসব লোক হজ্ব বা উমরাহ করার জন্য হারামাইন শরীফাইনে যান, সাধারণত তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের ভাবের উদয় হয়। যেমন এটা খুব প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহর ঘরের উপর যখন প্রথম দৃষ্টি পড়ে, তখন খুব কান্না আসে বা হাসি পায় বা অন্যান্য ভাবের সৃষ্টি হয়। যখন মুলতযামের কাছে যায় তখন সেখানেও খুব কান্না আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এ সব কাইফিয়াত বা ভাব সৃষ্টি হয়, কিন্তু এসব কাইফিয়াত মানুষের ক্ষমতাভুক্ত নয়, ইচ্ছাধীন নয়। লাভ হলে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত, আর লাভ না হলে এ কারণে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং কিছু লোক এ কারণে পেরেশান হয় যে, আমি উমরাহ করলাম বা হজ্ব করতে গেলাম সেখানে আমার আত্মা পাথর হয়েছিলো। আমার কান্নাও এলো না, চোখের পানিও বের হলো না, অন্য কোনো ভাবেরও সৃষ্টি হলো না, মনে হয় আমি যেন মরদূদ হয়ে গেছি। আমার উপর শয়তানের প্রভাব প্রবল হয়েছে, ইত্যাদি। এ ধরনের বিভিন্ন চিন্তা অন্তরে আসে। মনে রাখবেন! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ কারণে বিতাড়িত করবেন না যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনার কান্না এলো না কেন এবং এ কারণে পাকড়াও করবেন না। তবে শর্ত হলো, ঠিকভাবে আমল করতে হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক আমল করতে হবে। এর পরে কান্না আসুক বা না আসুক, ভাবের সৃষ্টি হোক চাই না হোক ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে সে হজ্ব ও উমরাহ কবুল হয়েছে এবং তার কারণে ছওয়াব লাভ হয়েছে।

আমল সুন্নাত অনুপাতে হওয়া উচিত

হযরত থানভী রহ. অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিষয়টি বলেছেন যে, কাইফিয়াত বা ভাবের উপর ভিত্তি নয়, ভিত্তি হলো আমলের উপর। যদি সুন্নাত মোতাবেক আমল হয়ে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

অর্থাৎ, হে আত্মা! সিরাতে মুস্তাকীমের উপর তোমার পা থাকলে তুমি গোমরাহ হবে না। যতো চিন্তা ও ওয়াসওয়াসাই আসুক না কেন। ভাবের উদয় হোক বা না হোক এবং স্বাদ লাগুক বা না লাগুক।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামায

আমার হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন, আমীন। তিনি একদিন বললেন যে, এক ব্যক্তি অবসর জীবন অতিবাহিত করছে। তার খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা আছে। ব্যাংক ব্যালেন্স আছে। জীবিকা উপার্জনের কোনো চিন্তা নেই। চাকুরিতে যেতে হয় না। ব্যবসা করতে হয় না। দোকান খুলতে হয় না। আযান হওয়ার সাথে সাথে সে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে চলে যায়। অত্যন্ত এতমিনানের সঙ্গে ভালোভাবে ওযু করে। এরপর মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকাত নামায পড়ে। এরপর সুন্নাত নামায আদায় করে। এরপর জামাতের অপেক্ষায় বসে যিকির করতে থাকে। যখন জামাত আরম্ভ হয় অত্যন্ত খুশু-খুযুর সঙ্গে নামায আদায় করে। তার মন-মগজ পুরোটাই নামাযমুখী হয়ে থাকে। নামাযের মধ্যে যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তার মজা লাগে। যখন যিকির করে তার মধ্যে স্বাদ পায়। রুকু সিজদাতেও স্বাদ পায়। এভাবে পুরো নামায অত্যন্ত প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে আদায় করে। এরপর নামাযের পরবর্তী সুন্নাত আদায় করে। এরপর এতমিনানের সাথে মনযোগ সহকারে দু'আ করে। এরপর ঘরে ফিরে আসে। এরপর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে যে, কখন আযান হবে। কখন মসজিদে যাবো। এক মানুষ তো হলো এরকম।

ফেরিওয়ালার নামায

অপর ব্যক্তির বিবি-বাচ্চা আছে। তার উপর বিভিন্ন ধরনের দায় দায়িত্ব এবং বিভিন্ন জনের হক আছে। সে সব হক আদায় এবং নিজের ও নিজের

বিবি-বাচ্চার পেট পালার জন্য ফেরি করে মাল বিক্রি করে। আওয়াজ দিয়ে দিয়ে মাল বিক্রি করে। এখন মানুষ তার ঠেলাগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে মাল ক্রয় করছে। ইতিমধ্যে আযান হয়ে গেলো। এখন সে তাড়াতাড়ি মানুষের সাথে লেনদেন শেষ করার চেষ্টা করছে। এমনকি যখন জামাতের সময় হয়ে গেলো তখন সে জলদি করে ঠেলা গাড়িটি একদিকে রেখে এবং তার উপর কাপড় দিয়ে দৌড়ে মসজিদে চলে গেলো। জলদি জলদি ওযু করলো। ইমামের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। জলদি নিয়ত বাঁধলো। এখন তার মন-মগজ বিভিন্ন দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। একদিকে গাড়ির চিন্তা, অপরদিকে গ্রাহকদের চিন্তা। কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে সে নামায আদায় করলো। এরপর সুন্নাত আদায় করে দ্রুত গিয়ে ঠেলা গাড়ির পাশে দাঁড়ালো, এ হলো দ্বিতীয় ব্যক্তি।

কার নামাযের মধ্যে রূহানিয়াত বেশি?

এরপর হযরত বলেন, বলো! এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কার নামাযে রূহানিয়াত অধিকতর? বাহ্যিকভাবে তো মনে হয় যে, প্রথম ব্যক্তির নামাযের মধ্যে রূহানিয়াত অধিক। কারণ সে আযানের সময় ঘর থেকে বের হয়েছে। মসজিদে এসে এতমিনানের সাথে ওযু করেছে। তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়েছে। সুন্নাত নামায পড়েছে। এতমিনান ও খুশু-খুযুর সাথে নামায আদায় করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নামায রূহানিয়াতের অধিক নিকটে। যদিও সে উর্ধ্বশ্বাসে এসে নামায আদায় করেছে। কারণ প্রথম ব্যক্তির উপর কোনো দায়-দায়িত্ব ছিলো না এবং তার কোনো চিন্তা ও পেরেশানী নেই। সে নিজেকে সমস্ত জিম্মাদারী থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। এর ফলে তার নামাযের মধ্যে বড়ো স্বাদ লাগছে, উপভোগ হচ্ছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ঠেলাগাড়ি ঠেলে আসছে। সেই ঠেলার উপরে তার জীবিকা এবং পরিবারের লোকজনের জীবিকা নির্ভরশীল। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজিরার সময় হয়েছে তখন সেই ঠেলাগাড়ি আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়া থেকে তাকে গাফেল করতে পারেনি। সে ঠেলাগাড়িটি রেখে জামাতের শেষ কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে এবং নামায আদায় করেছে। তার নামায অধিক কষ্টকর। তার নামায অধিক কবুলিয়াত ও ছওয়াবের কারণ হবে। যদিও তার কোনো ভাবের সৃষ্টি হয়নি এবং তার কোনো স্বাদ লাগেনি। কিন্তু এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তার ছওয়াব কম করবেন না, ইনশাআল্লাহ।

নিরাশ হবেন না

আজকাল মানুষ সাধারণত অনিচ্ছাকৃত বিষয়ের পিছনে লেগে থাকে। এর কারণে পেরেশান হয় এবং নিরাশ হয়। নিরাশার ফলে অবশেষে শয়তান তার থেকে সেই আমল ছুটিয়ে দেয়। শয়তান তাকে শেখায় যে, তোমার নামায যখন কোনো উপযুক্ত না তো এই নামায পড়ে লাভ কি? শয়তান এই গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত করিয়ে দেয়। এজন্য অনিচ্ছাকৃত জিনিসের পিছনে পড়া উচিত নয়। নামায পড়ার যেই পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন সেই পদ্ধতি মতো নামায পড়ার ফিকির করুন। নিজের পক্ষ থেকে মনযোগ দেয়ার চেষ্টা করুন। এর পরে ভাবের উদয় হোক বা না হোক, নামাযের মধ্যে স্বাদ লাগুক চাই না লাগুক, এতে কোনো তারতম্য হবে না। আল্লাহ তা'আলার এখানে সে নামায কবুল হবে।

ওয়াসওয়াসার কারণে খুশি হওয়া উচিত

যাইহোক, এই হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়াসওয়াসা হলো ঈমানের আলামত। অন্তরে ওয়াসওয়াসা জাগাকে আল্লাহ তা'আলা গোনাহের কাজ সাব্যস্ত করেননি। হযরত থানভী রহ. এই হাদীসের যেই ব্যাখ্যা করেছেন তা এই যে, 'এই দুই হাদীসে অনিচ্ছাকৃত বিষয়ে পাকড়াও না হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। বরং এর চেয়ে বড়ো কথা হলো, এই হাদীসের মধ্যে ওয়াসওয়াসার কারণে আনন্দিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।' অর্থাৎ, অন্তরে যদি ওয়াসওয়াসা আসে আর সে অনুপাতে আমল করা না হয় তাহলে এর কারণে আনন্দিত হওয়া উচিত। কারণ, এই ওয়াসওয়াসা আপনার ঈমানের আলামত। কোনো কাফেরের অন্তরে এসব ওয়াসওয়াসা আসে না। ঈমানদারের অন্তরেই এসব ওয়াসওয়াসা আসে। এজন্য আপনি খুশি হোন। এরপর বলেন, এসব ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি লাভের উপায় হলো, এগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। বরং এগুলোর কারণে খুশি হবে। এক বুযুর্গ বলেন, 'শয়তান মুমিনের আনন্দকে সহ্য করতে পারে না। যখন শয়তান মুমিনকে ওয়াসওয়াসার কারণে খুশি হতে দেখবে, তখন ওয়াসওয়াসা দেওয়া ছেড়ে দিবে।'

ওয়াসওয়াসার সংজ্ঞা

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ওয়াসওয়াসা ঐটা, যা নিজে নিজে অন্তরে উদিত হয়। নিজের পক্ষ থেকে চিন্তা করে ওয়াসওয়াসা আনা বা

গোনাহের কথা চিন্তা করা বা গোনাহের ইচ্ছা অন্তরে আনা ওয়াসওয়াসা নয়। এগুলো স্বতন্ত্র আমল। আর এসব কাজ অনেক ক্ষেত্রেই গোনাহের কাজ হয়ে থাকে। এজন্য নিজের পক্ষ থেকে ইচ্ছা করে, সংকল্প করে এবং চিন্তা করে করে ওয়াসওয়াসার কথা চিন্তায় আনবে না। আর যে ওয়াসওয়াসা নিজে থেকে আসে তার পরোয়া করবে না।

অনাহূত চিন্তা থেকে বাঁচার দ্বিতীয় চিকিৎসা

যেসব চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা মানুষ চিন্তা করে এবং ইচ্ছা করে অন্তরে আনে তার থেকে বাঁচার দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, যখনই এ ধরনের কোনো চিন্তা অন্তরে জাগবে, তখনই নিজেকে নিজে অন্য কোনো কাজে মগ্ন করবে। কারণ, লাঠি নিয়ে পিছু ধাওয়া করে এসব ওয়াসওয়াসা দূর করা যায় না। বরং নিজেকে নিজে অন্য কোনো কাজে মগ্ন করাই এর পদ্ধতি। এর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন অধিক পরিমাণে সেই দু'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা আপন রহমতে আমাদের সকলের ব্যাপারে এই দু'আকে কবুল করুন, আমীন। সেই দু'আটি এই,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِىْ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هِمَّتِىْ وَهَوَاىَ فِيْمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

কি বিস্ময়কর দু'আ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। এই দু'আর অর্থ হলো,

'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে যেসব চিন্তা জাগছে সেগুলোকে আপনার ভয় এবং আপনার যিকিরে পরিণত করে দিন।'

মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, তার মন-মগজ কখনই চিন্তা মুক্ত থাকে না। কোনো না কোনো চিন্তা তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যেমন হাত দিয়ে কোনো কাজ করছে কিন্তু মন-মগজ অন্য চিন্তায় মগ্ন এবং অবিরাম বিভিন্ন চিন্তা চলছে। কোনো মুহূর্ত চিন্তামুক্ত থাকে না। এজন্য এই দু'আ করবে যে, অহেতুক যে সব চিন্তা আসছে, যেগুলোর কোনো ফায়দা নেই, হে আল্লাহ! এসব চিন্তাকে বদলিয়ে আপনার যিকির এবং আপনার ভয়ে পরিণত করে দিন। যে চিন্তাই আসবে, তা যেন আপনার হয় বা আপনার ভয়ের হয়, আপনার স্মরণের হয়, আপনার সামনের উপস্থিতির হয়, আপনার জান্নাতের নেয়ামতের হয়, দোযখের আযাবের হয় এবং আপনার দ্বীনের বিধি-বিধানের

চিন্তা হয়। হে আল্লাহ! আমার আত্মার চিন্তাসমূহ, আমার খাহেশাত এবং কামনা বাসনার মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে করে দিন, যেগুলো আপনার কাছে পছন্দনীয়। আমার আত্মাকে শুধুমাত্র সেদিকে ধাবিত করুন, যা আপনার কাছে পছন্দনীয়। এই দু'আ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এই দু'আকে আমাদের সকলের জন্য কবুল করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত
আরও কয়েকটি কিতাব
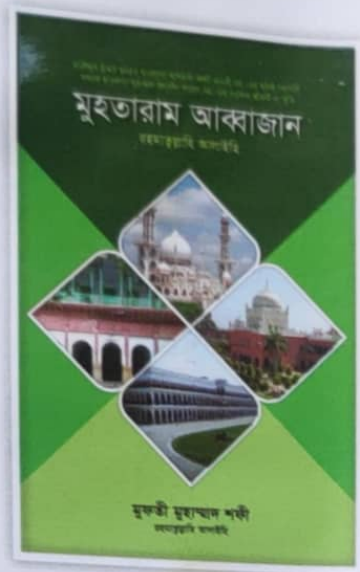
মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি কিতাব

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.com
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com